বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুক্তির মহানায়ক

৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (৩৮তম বিসিএস)
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: মুক্তির মহানায়ক

৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (৩৮তম বিসিএস)-এর
প্রশিক্ষণার্থীদের একটি প্রকাশনা

বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা | ১৬ ডিসেম্বর ২০২১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানঃ মুক্তির মহানায়ক

৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (৩৮তম বিসিএস)-এর
প্রশিক্ষণার্থীদের একটি প্রকাশনা

বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা | ১৬ ডিসেম্বর ২০২১

উপদেষ্টা পর্ষদ

মোঃ আনিছুর রহমান
উপপরিচালক, বিপিএটিসি ও কোর্স সমন্বয়ক, ৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

শামীম হোসেন
সহকারী পরিচালক, বিপিএটিসি ও কোর্স সমন্বয়ক, ৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

মোঃ মনিরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক, বিপিএটিসি ও কোর্স সমন্বয়ক, ৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

স্যুভেনির কমিটি

সভাপতি
এম. জে. সোহেল

সদস্য সচিব
পলাশ চন্দ্র সরকার

সদস্য

মোহাম্মদ মোজাহেরুল হক
মারজানা আক্তার
আবু মুহাম্মদ ফয়সাল
মিঠুন মৈত্র
শারমিন আক্তার রিমা
মুহাঃ জাহিদ হাসান
রিফাত রেজা
মনীষ দাশ
শাহানাজ পারভীন
খালিদ বিন মনসুর
খান মাহমুদুল হাসান
ফাইরুজ তাসনীম
মোঃ এরফানুর রহমান
এ. মঈন খন্দকার
মোঃ সানাউল মোর্শেদ
মোঃ নূর-ই-শাহান রাজ

মুখবন্ধ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পালিত হচ্ছে মুজিববর্ষ। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, বিজয় দিবসের এই মহিমান্বিত দিনে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর গৌরবান্বিত জীবন ও কর্ম নিয়ে একটি বিশেষ প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রতি তাঁর কর্মপরিকল্পনা ঢেলে সাজিয়েছেন। ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে নিয়ে যাওয়া, ২০৭১ সালে সমৃদ্ধির এক বিস্ময়কর অবস্থানে উন্নীতকরণ এবং ২১০০ সালের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিরাপদ ও উন্নত দেশ গড়ার যে মহাপরিকল্পনা বর্তমান সরকার নিয়েছে, তা বাস্তবায়নে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখবে বর্তমান তরুণ প্রজন্মের নবীন কর্মকর্তাগণ। এই নবীন কর্মকর্তারাই তাদের মেধা, মননশীলতা ও নতুনত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এ প্রকাশনায় ৩৮তম বিসিএস ব্যাচের একঝাঁক মেধাবী কর্মকর্তার চিন্তাধারা প্রস্ফুটিত হয়েছে তাদের চমৎকার লেখনীর মাধ্যমে। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের অত্যন্ত ব্যস্ত সূচির মধ্যেও বইটি যথাসময়ে প্রকাশ করার অনবদ্য প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এজন্য স্যুভেনির ও পাবলিকেশন কমিটির সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আরও ধন্যবাদ জানাই কোর্স ম্যানেজমেন্ট টিমকে বইটি প্রকাশনায় সার্বিকভাবে দিক নির্দেশনা প্রদান করার জন্য। আমার বিশ্বাস এ প্রকাশনাটি ৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য একটি অনন্য স্মৃতি হয়ে থাকবে এবং বঙ্গবন্ধুর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের জনগণের সেবায় একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে। আমি সকল প্রশিক্ষণার্থীর সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল, সুস্বাস্থ্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মনজুর হোসেন
রেক্টর
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

সূচিপত্র

ভূমিকা ০৭
সেলিনা হোসেন

দীনু ০৯
মনীষ দাশ

বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ১২
আহাম্মেদ মোফাচ্ছের

যুদ্ধোত্তর দেশ গঠনে রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু ১৮
শিবরাজ চৌধুরী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানঃ বাংলাদেশের কৃষি বিপ্লবের জনক ২৩
খান আসিফ তপু

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন ও বাংলাদেশ ২৭
খান মাহমুদুল হাসান

মহাকালের সারথি ৩৩
মোঃ গোলাম মোস্তফা

বহির্বিশ্বের দর্পণে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ৩৭
রায়হান মাহমুদ হাননান

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা ৪৪
সোনিয়া হক

ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর বাংলাদেশ ৪৯
নাভিদ সারওয়ার

শেখ মুজিবঃ শত সংগ্রামের প্রবাদ পুরুষ ৫৫
কামরুন্নাহার তামান্না

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ৬০
মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা

একসূত্রে গাঁথা বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ ৭০
সাদিয়া বিনতে সোলায়মান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহান স্বাধীনতা ৭৫
আবদুল্লাহ আল আমিন

অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ ও একজন রাজনীতির কবি ৮১
খালিদ বিন মনসুর

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশঃ সমার্থক দুটো শব্দ ৮৬
মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ

স্বাধীনতা ও পুনর্গঠনঃ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ ৯২
মোহাম্মদ তৌফিকুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর আরেক নাম বাংলাদেশ ৯৬
মোঃ ইউসুফ আলী

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, মুক্তিযুদ্ধ ও একটি জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ১০১
শিবু দাশ

কারাগারে মহানায়ক ১০৮
ফাইরুজ তাসনিম

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানঃ রাজনীতির এক মহান কবি ১১৩
স্বরূপ মুহুরী

ঐ আসে মহামানব ১১৭
মোঃ রাশিদুল হাসান জন

শিকল পায়ে পথচলা ১২২
সব্যসাচী মজুমদার

ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু ১২৭
আতিক মাহমুদ

ধর্মনিরপেক্ষতার বাংলাদেশ: বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা এবং আমাদের করণীয় **১৩৪**
মোঃ নূর-ই-শাহান রাজ

পিতার আশ্রয় **১৩৯**
এ. আর. এম জাহিদ হাসান

কৃষি ও কৃষকের বঙ্গবন্ধু **১৪৩**
সুনন্দা সরকার প্রমা

দেয়ালের ওপার থেকে **১৪৯**
রিফাত আনজুম পিয়া

পিতা তুমি, বন্ধু তুমি **১৫৩**
এস এম খায়রুল বাশার

মুজিব: চির উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম **১৫৪**
মোঃ সানাউল মোর্শেদ

Oh Killer, what have you done **১৫৬**
Md. Iftekharul Islam Shamim

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: Architect of Economic Development in Bangladesh **১৫৭**
Mohammad Mozaherul Hoque

বাচিক শিল্পের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ **১৬৩**
ডক্টর মোহাম্মদ রেজাউল করিম

ভূমিকা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি প্রবন্ধগ্রন্থ সংকলনের জন্য লিখেছেন ৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ। তাঁদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তাঁরা ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটটি চমৎকারভাবে বিভিন্ন পরিসরে তুলে ধরেছেন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সমান্তরাল সত্ত্বা। বাংলাদেশের নাম উচ্চারণ করার সময় বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারিত হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। তাঁকে আড়ালে রেখে আমাদের স্বাধীনতার আনন্দ ধ্বনি উচ্চারিত হবে না।

এই সংকলনে ২৯টি প্রবন্ধ ও ৩টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রতিটি লেখায় বঙ্গবন্ধুকে উপস্থাপন করা হয়েছে চমৎকার শিরোনামে, একই সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে। বিভিন্ন লেখায় সমৃদ্ধ এই সংকলন পাঠকের তৃষ্ণা মেটাবে।

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সৃজনশীল চিন্তায় যেমন রচনা করেছেন তাঁর রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞ, তেমনি ইতিহাসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের সামগ্রিক অগ্রগতির প্রবাহমান ধারাবাহিকতার প্রেক্ষাপটে। এটি নিজেদের ঐতিহ্যকে ধারণ করে রচনাকে সমৃদ্ধ করার বড় দিক, পরবর্তী প্রজন্মের মনন আলোকিত করার দুঃসাহসী পদক্ষেপ।

ইংরেজি-বাংলায় রচিত তিনটি কবিতাও সংকলিত হয়েছে এই বইয়ে। কবিতার সংযোজন বইয়ের মাত্রা বাড়িয়েছে। পাঠক প্রবন্ধের পাশাপাশি কবিতা পড়েও অনুপ্রাণিত হবে।

প্রবন্ধের লেখকবৃন্দ দুই ধারায় প্রবন্ধের শিরোনাম রেখেছেন। একটি ধারা রচনার কাব্যিক ব্যঞ্জনা, অন্য ধারা ইতিহাসের সরাসরি যোগসূত্র। যেমন মোঃ গোলাম মোস্তফার প্রবন্ধের শিরোনাম 'মহাকালের সারথি'; রিফাত আনজুম পিয়ার প্রবন্ধের শিরোনাম 'দেয়ালের ওপার থেকে'; মনীষ দাশ লিখেছেন 'দীনু'; কামরুন্নাহার তামান্না লিখেছেন 'শেখ মুজিব শত সংগ্রামের প্রবাদ পুরুষ'; মোহাম্মদ রশিদুল হাসান জন লিখেছেন 'ঐ আসে মহামানব' ইত্যাদি।

ইতিহাসের প্রেক্ষিতে লেখা হয়েছে বেশ অনেকগুলো প্রবন্ধ। মোঃ নূর-ই-শাহান রাজ লিখেছেন 'ধর্মনিরপেক্ষতার বাংলাদেশ: বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা এবং আমাদের করণীয়'; মোঃ ইউসুফ আলী লিখেছেন 'বঙ্গবন্ধুর আরেক নাম বাংলাদেশ'; মোহাম্মদ তৌফিকুর রহমান

লিখেছেন ‘স্বাধীনতা ও পুনর্গঠন: বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’; খালিদ বিন মনসুর লিখেছেন ‘অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ ও একজন রাজনীতির কবি’; শিবরাজ চৌধুরী লিখেছেন ‘যুদ্ধোত্তর দেশ গঠনে রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু’; রায়হান মাহমুদ হাননান লিখেছেন ‘বহির্বিশ্বের দর্পণে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ’; মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ লিখেছেন ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ: সমার্থক দুটো শব্দ’; আবদুল্লাহ আল আমিন লিখেছেন ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহান স্বাধীনতা’; আরেকজন লিখেছেন ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: বাংলাদেশের কৃষি বিপ্লবের জনক’; মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা লিখেছেন ‘বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়’; আরেকজন লিখেছেন ‘বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, মুক্তিযুদ্ধ ও একটি জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব’; আতিক মাহমুদ লিখেছেন ‘ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু’; আরেকজন লিখেছেন ‘বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম’; নাভিদ সারওয়ার লিখেছেন ‘ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর বাংলাদেশ’; এ. আর. এম জাহিদ হাসান লিখেছেন ‘পিতার আশ্রয়’; সোনিয়া হক লিখেছেন ‘বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা’; ফাইরুজ তাসনিম লিখেছেন ‘কারাগারে মহানায়ক’; ইংরেজি ভাষায় লিখেছেন মোহাম্মদ মোজাহেরুল হক ‘Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: Architect of Economic Development of Bangladesh’ এবং ডক্টর মোহাম্মদ রেজাউল করিম লিখেছেন, ‘বাচিক শিল্পের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ’।

প্রতিটি প্রবন্ধ লেখকদের নিজস্ব রচনা শৈলীতে উদ্ভাসিত। প্রত্যেকের ভাষা স্বকীয়তায় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। বিষয়ের তাৎপর্য চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন লেখকবৃন্দ।

তিনটি কবিতা খুব সুন্দরভাবে রচিত হয়েছে। এস এম খায়রুল বাশার লিখেছেন ‘পিতা তুমি, বন্ধু তুমি’। সানাউল মোর্শেদ লিখেছেন ‘মুজিব: চির উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম’। মোহাম্মদ ইফতেখারুল ইসলাম শামীম লিখেছেন ‘Oh killer, What have you done’।

প্রবন্ধ ও কবিতা দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সংকলিত এই বই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত অনেক বইয়ের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বইটি সব ধরনের পাঠকের কাছে পৌঁছাবে এই প্রত্যাশা করি। বিশেষ করে পরবর্তী প্রজন্মের তরুণ ছেলেমেয়েরা এই বই থেকে তাদের চিন্তা-চেতনাকে নানা মাত্রায় ধারণ করতে পারবে।
সব লেখককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সেলিনা হোসেন
কথা সাহিত্যিক
বঙ্গবন্ধু চেয়ার, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

দীনু

মনীষ দাশ
সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা

হারান জেলের বউ যখন পোয়াতি হলো, তখন থেকে দেশে সংগ্রাম শুরু হলো। টাউনের মাঠে খান সেনাদের ক্যাম্প বসলো। তারা এদিক সেদিক ঠুসঠাস গুলি ফোটায়, কাউকে মুক্তি বলে সন্দেহ হলে খালের ধারে নিয়ে মেরে ফেলে, এলাকার মেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করে। এত বিপদের মাঝেও হারান পালায় না, পোয়াতি বউ নিয়ে বেশিদূর পালাতেও পারবে না। জেলেপাড়ার বাকিরা সুযোগ বুঝে এদিক সেদিক সটকে পড়েছে, বাকি আছে শুধু দীনবন্ধুর বুড়ি মা। দীনবন্ধু তরুণ বয়সে ঘরছাড়া হয়ে কোথায় চলে গেছে কেউ বলতে পারে না। বুড়ির বাকি তিন ছেলেমেয়ে বিয়ে করে আশেপাশের গ্রামেই সংসার বসালেও স্বামীর ভিটা ছেড়ে সে কারো কাছেই যেতে চায় না। কেন যায় না জিজ্ঞাসা করলে বলে, তার বড় ছেলে দীনু যেকোন দিন বাড়ি ফিরে খোঁজ করতে পারে।

হারানের মাছ ধরা এখন বলতে গেলে বন্ধ, কেউ মাছ না খেলে ধরে কী লাভ! বাজারে মাছ কেনার মানুষ নেই। মিলিটারি ক্যাম্প করার পর থেকেই এলাকায় কেউ মাছ খায় না। সবার মনে চাপা আশঙ্কা, মাছ খেলে যদি সেনারা ধরে বলে, "ইয়ে মছলি খোর, বিলকুল ভি সাচ্চা পাকিস্তানি নেহি"। লোকজনের বাড়িতে ভাত রান্না হচ্ছে কম, খেতে কষ্ট হলেও সবার বাড়িতে এখন তিনবেলা রুটি চলছে। সাথে থাকে ডাল সবজি, মাংস কখনো সখনো। যুদ্ধের বাজারে সবকিছুর দাম চড়া, আটা-ময়দা-মাংস রোজ কেনার সামর্থ্য বেশি মানুষের নেই। মাছ খেতে চাইলে লোকেরা গোপনে হারানকে খবর দেয়। রাতের আঁধারে লুকিয়ে মাছ ধরে সে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়। আর দিনের বেলা এদিক-সেদিক ঝুটা কাজের আশায় ঘুরে বেড়ায়। কাজ পায় তো করে, নইলে দুপুরতক বাড়ি ফিরে বউয়ের সাথে গল্প করে।

বউয়ের সাথে হারানের ভাব ভালোই, তবে কিছু বিষয়ে অমিলও আছে। এই যেমন একটা বিষয় হলো সন্তানের নাম ঠিক করা। লেখাপড়া সে কিছুই করেনি, এদিকে তার বউ দুইক্লাস পাশ। রামসুন্দর বসাকের আদি বাল্যশিক্ষা গড়গড় করে পড়ে যেতে পারে। হারান যখন তার ঠাকুরদা নীলকান্তের নামে ছেলের নাম রাখার প্রস্তাব করে, বউ তখন বেঁকে বসে। বলে, "এত আদ্যিকালের নাম আমার ছেলের রাকবো না ও আমি ঠিক করে রেকেচি অনেক আগেই। তোমাকে তা আর ভাবতে হবে না"। শিক্ষিত বউ বিয়ে করেছিল বলে হারানের মনে বেশ একটু বড়াই ছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে বউয়ের সাথে কথায় সে পেরে উঠে না।

বউটাকে মাঝে মাঝে তার খুব অদ্ভুত লাগে, মনে হয় অচেনা কেউ। সেদিন গভীর রাতে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে বলে, "ও বাড়ির দীনু ঘরে এসেচে। বুড়ির হাড়িতে খাবার নেইকো।

যাও কিছু খাবার দিয়ে এসো"। শুনে সে অবাক হয় ভীষণ। দীনু আর সে প্রায় সমবয়সী। ছোটবেলায় একসাথে ডাংগুলি খেলে বেড়াতো দুজনে। কৈশোরে তার কী জানি হলো, বিবাগী হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল একদিন। তাও প্রায় এক যুগ আগের কথা। এখন এই সংগ্রামের মধ্যে দীনু কেন ফিরে আসবে, আর আসলেও তার বউ ঘুমের মধ্যে কী করে সে খবর জানবে- হারান ভেবে কুল পায় না। কিন্তু বারবার পীড়াপীড়িতে সে বুড়ির বাড়িতে কড়া নাড়ে। দীনু আসলেই বাড়িতে এসেছে। আবার সে নিজের ঘরে আসে বেচে যাওয়া ভাত তরকারি নিয়ে যেতে। এসে দেখে বউ গভীর ঘুমে অচেতন।

দীনু হারানকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলে, সে যে ফিরে এসেছে তা যাতে কাকপক্ষীও টের না পায়। মিলিটারি ক্যাম্পে হামলা করতে হবে, সে এসেছে খোঁজখবর নিতে। দীনু যুদ্ধ করছে জেনে হারানের গর্ব হয় খুব, তার ছেলেবেলার খেলার সাথী অস্ত্র চালিয়ে খানসেনা মারছে- ভাবা যায়! বউয়ের সাথে এই বড়াইটুকু সে করে, বউ শুধু মুখ টিপে হাসে। বলে, "ও বেলা একটা বড় মাছ ধরে হাসু ব্যাপারীর বাড়ি যেও। ওদের বিটা ক'দিন ধরে চাইচে"। কথা শুনে হারান ক্ষেপে যায়, কেন হাসু ব্যাপারীকে মাছ দিতে হবে? ওই ব্যাটা মিলিটারির ন্যাজ ধরে গ্রামে গ্রামে তাণ্ডব শুরু করেছে। ওর ঘরে মাছ দিলে তার পয়সাও দিবে না। আর বউ বলছে তার কাছে মাছ নিয়ে যেতে। বউ রাগের কারণ বুঝতে পেরে বলে, "যা বলছি করো দেকিনি। তোমার বন্ধুর কাজ হবে এতে। মিলিটারির খবরাখবর কিচু জানতে পারবে"।

বউয়ের কথা হারান বুঝে পায় না কিছুই। কিন্তু তার কথামতো পরদিন একটা কাতলা মাছ ধরে ব্যাপারী বাড়ি যায়। মাছ দেখে ব্যাপারীর চোখ চকচক করে উঠে, খুশি হয় সে। কিন্তু মাছের দাম না দিয়ে বলে, "কী রে ব্যাটা হারু, তোর বউ এখন ক'মাসের হলো? ওবেলা ক্যাম্পে ভালো মাছ দিতে পারবি? মিলিটারি স্যারদের মাছ খাওয়ালি পরে খুশি হয়ে তোকে কিছু কবে না। তা নাহলে হিন্দু বলে তোকে গুলি টুলি করে দিতে পারে। তোদের উপরে উনারা বেজায় ক্ষ্যাপা"। হারান ভয় পেয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে মাছ দিতে পারবে।

বাড়ি ফিরে সে বউয়ের সাথে পরামর্শ করে, বউ তাঁকে বলে দীনুকে সাথে নিয়ে ক্যাম্পে যেতে। পরিচয় দিতে যে তার শ্বশুরবাড়ির লোক, ছেলে হবে দেখে নাইওর নিতে এসেছে। কিন্তু ব্যাপারী যদি চিনে ফেলে? বউ তারও উপায় বাতলে দেয়, দশ বছরে মানুষের চেহারা পাল্টে যায় কত! একটু কালিঝুলি আর সং মেখে নিলে দীনুকে আর কেউ চিনতে পারবে না।

রাতভর খালে মাছ ধরে হারান, দুটো পাকা রুই আর কষ্টা কাতাল-কালিবাউশ ধরা পড়ে। সকালে ব্যাপারীকে দেখালে সে বলে বিকালে এগুলোকে ক্যাম্পে নিয়ে কেটেকুটে তন্দুরি বানাতে হবে। কিন্তু সেতো অনেক কাজ, হারান একা কি এতো কাজ করতে পারবে? শ্বশুরবাড়ি থেকে আসা সম্বন্ধীর কথাটা সে বলে, ব্যাপারী রাজি হয়।

কলাপাতায় মোড়ানো মাছগুলি নিয়ে বিকালে ক্যাম্পে হাজির হয় হারান আর দীনু। মাংসখোর মরুচরেরা মাছ দেখে আহ্লাদিত হয়। আঁশ ছাড়িয়ে, ধুয়ে মাছের গায়ে মাখানো হয় মরিচমশলা। মাঠের মাঝখানে কাঠের উনুন বসিয়ে মাছগুলো ঝলসানো হয়। সন্ধ্যার আবছায়াতে আগুনের শিখা জ্বলে লকলক করে, মাছ ভাজার সুঘ্রাণ ছড়ায় চারদিকে। তীক্ষ্ণ চোখে দীনু চারদিক পর্যবেক্ষণ করে, হিসাব কষে মনে মনে। খানসেনা কতজন, বন্দুক কতগুলো, পাহারা বসে কোথায়, কোনপাশটা ফাঁকা - সব কিছুর ছবি মনে গেঁথে নেয়। মাছ খেয়ে সেনারা উল্লসিত হয়ে বলে, “বহুত আচ্ছা। ফিরসে খিলানা মছলি। নেহিতো গুল্লি মার দেঙ্গে”। হারান কাঁচুমাচু হয়ে বলে, জ্বী হুজুর ।

পরদিন বউকে নিয়ে হারান সত্যি সত্যি শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। বউয়ের প্রসবের সময় হয়ে এসেছে, এ গ্রামে তো কোন দাই নেই। শ্বশুরবাড়ি নৌকায় তিনক্রোশ পথ, টাউনের খবরাখবর সবই পাওয়া যায়। খানসেনাদের ক্যাম্পে রাতের বেলা মুক্তি হামলা করেছে। কিছু সেনা মরেছে, আর বাকিগুলো পালিয়েছে ক্যাম্প ছেড়ে। আরও খবর পাওয়া যায় বুড়ির ছেলে দীনু যুদ্ধে মারা গেছে। সব খবর বউকে দেয় হারান, দীনুর কথা মনে করে কাঁদে। তার ছোটবেলার বন্ধু যে! বউ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, আমার ছেলে হলে নাম রাখবো দীনু।

বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম

আহাম্মেদ মোফাচ্ছের
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মেহেরপুর

"একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এ নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।"

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (অসমাপ্ত আত্মজীবনী)

যে মহামানবের জন্ম না হলে এ দেশ স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যটা আপন করে পেত না, কোটি প্রাণে মুক্তির আনন্দে হিল্লোল বয়ে যেত না, সবুজ শ্যামল বাংলার বুক চিরে বয়ে চলা শান্ত নদীর বাঁকে শান্তির নীড়ে লাখো বাঙালি ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্নের জাল বুনতে পারত না, পরম আরাধ্য লাল সবুজের পতাকাটা আপন করে পাওয়া হত না, লাখো প্রাণের স্পন্দন প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য যিনি সমগ্র জীবন সংগ্রাম করেছেন, তিনি জাতির পিতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পরাধীন এ জাতির ললাটে স্বাধীনতার রাজটিকা এঁকে দেওয়াই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। নিজের জীবনের সবটুকু দিয়ে চেয়েছেন পৃথিবীর বুকে সোনার বাংলা গড়তে, তর্জনীর দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এ জাতিকে দেখিয়েছিলেন রঙিন দিনের স্বপ্ন। তিনি জন্মেছিলেন কোটি মানুষের প্রাণের স্পন্দন হয়ে, মানবিকতার অগ্রদূত হয়ে। সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর পক্ষে ছিল তাঁর অবস্থান। তিনি অবগাহন করেছেন কষ্টে থাকা হাজারো মানুষের দুঃখ সমুদ্রে। তাঁদের কষ্টকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে মুক্তির স্বাদ দেবার আকাঙ্ক্ষাকেই জীবনের একমাত্র অভীষ্ট করেছিলেন।

জাতির পিতার জীবনবোধ, আদর্শ ও নেতৃত্ব বাঙালির সংগ্রামকে দিয়েছে সুস্পষ্ট পথরেখা দেখিয়েছে মুক্তির আকাঙ্খিত সকাল। তাঁর চিত্ত ছিল অকুতোভয়, মানবতার মহান আদর্শে উজ্জীবিত। তাঁর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আমরা খুঁজে পাই নীতি আর নৈতিকতায় চালিত একজন সুকুমার বৃত্তির মানুষের আদর্শ। এ দেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি পদে তাঁর বিচরণ। টুঙ্গিপাড়ার ছোট এক বালক 'খোকা' কালক্রমে ক্যারিশম্যাটিক নেতা ও জাতির মুক্তির অগ্রদূত হয়ে উঠেন। তিনি তাঁর জীবনে ও মননে সেই মহান

গুণগুলো ধারন করতেন, যা তাঁকে সর্বকালের সবশ্রেষ্ঠ বাঙালিতে পরিণত করেছে। জাতির পিতার জীবন দর্শন, তাঁর অসীম আত্মত্যাগের পরিক্রমা, তাঁর রাজনৈতিক দর্শন বিশ্লেষণে আমরা বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনে অপরিসীম অবদানের দিকটি দেখতে পাই।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন ভাগ্যবিড়ম্বিত এ জাতির পরম কাঙ্খিত স্বাধীনতার ইতিহাসের ধ্রুবতারা। 'রাজনীতির মহাকবি' (জেনকিনস, ১৯৭১) হিসেবে আখ্যায়িত সময়ের এ সাহসী সন্তান আপামর জনসাধারণের প্রাণের দাবি বোঝার এক বিস্ময়কর ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। নিপীড়িত মানুষের জীবনে শান্তির বারতা আনয়ন ও সমগ্র পৃথিবীর আত্মনিয়ন্ত্রণকামী ও শান্তিকামী মানুষদের সংগ্রামের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল (রহমান, ২০১৭)। একজন মানুষ সমাজের চোখে যত তুচ্ছ হোক না কেন, তিনি সেই মানুষের কাছ থেকে শেখার মানসিকতা পোষণ করতেন। তাঁদের দুঃখকে অনুধাবন করতে চাইতেন। কারাগারের দিনগুলোতে একজন চোরের জীবনকাহিনী লেখা (রহমান, ২০১৭) ও তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার যে আগ্রহ তিনি প্রকাশ করেছেন তা তাঁর মানবিক দিকটি তুলে আনে।

বঙ্গবন্ধুর দ্যোতনায় ছিল এ দেশের স্বাধীনতা, তাঁর দ্রোহ ছিল সকল অন্যায় আর অসাম্যের বিরুদ্ধে (সাদি, ২০১৪), তাঁর সমগ্র রাজনীতির জীবন যেন সুনিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা এক অনন্য শিল্প, পটে আঁকা শ্যামল বাংলার স্নেহধন্য পুরুষের সংগ্রাম ছিল এ দেশকে মুক্ত করার (শিকদার, ২০১২)। জাতির পিতা অসাম্প্রদায়িক চেতনার পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মহান সৃষ্টিকর্তা কোন বিশেষ দল বা সম্প্রদায়ের জন্য নন, তিনি সকল সময়ে সকল মানুষের প্রতি দয়াশীল। স্বাধীনতার পর সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার শর্ত হিসেবে বাংলাদেশের নামকরণ ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ করার শর্ত দিলে তিনি তা মেনে নেন নি; বরং সৌদি আরবের নাম যে ইসলামিক রিপাবলিক না হয়ে কিংডম অব সৌদি আরব ধারন করেছে এবং বাংলাদেশে মুসলমান ছাড়াও অনান্য ধর্মের মানুষ সম্প্রীতিসহ সহাবস্থান করছে সে দিকটি তিনি সাহসিকতার সাথে তুলে এনেছিলেন। তিনি সৌদি বাদশাহর হীন শর্তে স্বীকৃতি নিতে রাজি হন নি। স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার পরও তিনি আদর্শকে মনে প্রাণে ধারণ করেছেন, যে স্বাধীনতা আর স্বীকৃতির জন্য তিনি জীবনের মহা গুরুত্বপুর্ণ সময় কারাগারে কাটিয়েছেন, শুধু সে স্বীকৃতির জন্য তিনি তাঁর অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শকে বিসর্জন দেননি (মুকুল, ২০১৪)। মানবতাই তাঁর কাছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছে।

জাতির ইতিহাসের পালাবদলকারী মোহনীয় ব্যাক্তিত্বের অধিকারী, অন্তঃদৃষ্টি ও দুরদৃষ্টি সম্পন্ন এ নেতার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল পিতার হাত ধরে। ছেলেবেলায় তাঁর পিতা তাঁকে বলেছিলেন, উদ্দেশ্যের প্রতি সততা ও নিষ্ঠার কথা। তাঁর বাবার আদর্শের এ দিকটিও তাঁর জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ এটি বঙ্গবন্ধু নিজেই লিখেছেন (রহমান, ২০১২)। ছোটবেলা

থেকে তাঁর রাজনীতি সচেতনতার পেছনে তাঁর পিতার প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল (জয়েনউদদীন, ২০১৯)। কৈশোরে তাঁর মধ্যে বহুদর্শী চেতনার বীজ বপন করেছিলেন তাঁর শিক্ষকেরা (রহমান, ২০২০)। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অত্যাচারী শাসন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাঁকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। তাঁর রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আদর্শ তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব রেখেছিল (রহমান, ২০১২)।

জাতির পিতা বাঙালির স্বভাবকে বুঝতে পেরেছিলেন। এত চমৎকার করে বাঙালির মনস্তত্ব ও পরাধীনতার কারণ সম্ভবত আর কেউ ব্যাখ্যা করতে পারেনি। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তিনি বাঙালির পরশ্রীকাতরতার একটি চমৎকার ব্যাখা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন "আমাদের বাঙালির মধ্যে দুইটা দিক আছে। একটা হলো আমরা মুসলমান, আর একটা হলো আমরা বাঙালি। পরশ্রীকাতরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে। বোধ হয় দুনিয়ার কোনো ভাষাতেই এই কথাটা পাওয়া যাবে না, 'পরশ্রীকাতরতা'। পরের শ্রী দেখে যে কাতর হয়, তাঁকে 'পরশ্রীকাতর' বলে। ঈর্ষা, দ্বেষ সকল ভাষাতেই পাবেন, সকল জাতির মধ্যেই কিছু কিছু আছে, কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে আছে পরশ্রীকাতরতা। ভাই ভাইয়ের উন্নতি দেখলে খুশি হয় না। এই জন্যই বাঙালি জাতির সকল রকম গুণ থাকা সত্ত্বেও জীবনভর অন্যের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। ...যুগ যুগ ধরে এরা শোষিত হয়েছে নিজের দোষে। নিজেকে এরা চেনে না, আর যত দিন চিনবে না এবং বুঝবে না, ততদিন এদের মুক্তি আসবে না।" (রহমান, ২০১২, পৃ.৪৭)।

জাতির পিতা চাটুকারিতা ও দ্বিচারিতা পছন্দ করতেন না বরং মানুষের জন্য কিছু করার মাঝে ছিল তাঁর আনন্দ। নিজেকে আপন সাধনায় উজ্জীবিত রাখার জন্য নিজের চিন্তা চেতনায় তিনি স্বচ্ছতা রাখতেন। জাতির পিতা উষ্মা প্রকাশ করতেন রাজনীতিবিদদের আদর্শের নড়বড়ে ভিত্তি দেখে। কতিপয় রাজনীতিবিদ যেভাবে রাজনীতির আদর্শ অনুসরণ ও তার প্রচার করতেন তা তিনি মেনে নিতে পারেন নি (রহমান, ২০১৭)। এ দেশের কিছু লোক যেভাবে স্বাধীনতাকামীদের দমিয়ে রাখছিল সে প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলছেন, "সামান্য পদের বা অর্থের লোভে পূর্ব বাংলাকে যেভাবে শোষণ করার সুযোগ দিতেছে দুনিয়ার অন্য কোথাও এটা দেখা যায় না" (রহমান, ২০১৭, পৃ. ২১৫)। জাতির পিতার জ্ঞানের প্রতি অসীম অনুরাগ ছিল। তিনি ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের ভক্ত। এমনকি তাঁর ছোট ছেলে শেখ রাসেলের নামকরণ বার্ট্রান্ড রাসেলের নামে করেছিলেন (যুগান্তর, ২০২০)। তাঁর বাসায় ব্যাক্তিগত লাইব্রেরি ছিল (রহমান, ২০১০)। এছাড়াও তাঁর স্ত্রী তাঁকে কারাগারে বই দিয়ে আসতেন যা আমরা তাঁর স্বহস্তে লিখিত জীবনী সংশ্লিষ্ট

তিনটি বইয়ে পাই। জাতির পিতা ভাবতেন তিনি গ্রেপ্তার হলে মানুষের উপর অত্যাচার কম হবে (সাদিক, ২০০০)। সে কারণে আন্দোলনের ডাক দিয়ে পালিয়ে যেতেন না।

জাতির পিতা এ দেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি ধাপে তাঁর সম্পৃক্ততা রেখেছেন আপন মহিমায়। মাতৃভাষার মর্যাদা অর্জন ছিল বাঙ্গালির স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রথম দৃপ্ত শপথ। এটি ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির প্রথম ঐতিহাসিক বিজয়। আন্দোলনের শুরুর দিকেই তিনি গ্রেপ্তার হলেও জেলে বসেই অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন (রহমান, ২০২০)। মাতৃভাষাকেন্দ্রিক সেই বিজয়ই আমাদের মুক্তির পথ দেখিয়েছিল (দিল এবং দিল, ১৯৯৯)। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে তরুণ নেতা মুজিবের উত্থান ঘটে, সামরিক শাসনের দিনগুলোতে গণতান্ত্রিক স্বাদ বঞ্চিত, পরাধীন দেশে শেখ মুজিবের আক্ষেপ তাঁকে আলাদা দেশের কথা ভাবতে বাধ্য করেছিল। মুজিবের ছয় দফা দাবি ছিল পৃথক দেশের জন্য দূর্বার সংগ্রামের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা। তিনি তাঁর জীবন নিয়ে কখনো চিন্তা করেননি। নিজের জীবন দিয়ে হলেও দেশের স্বাধীনতা চেয়েছেন। বঙ্গবন্ধু জানতেন যে, ছয় দফা প্রদান করলে দেশে অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়বে, তাঁর জীবন নাশ হতে পারে। তবুও তিনি পিছপা হননি, তিনি বিশ্বাস করতেন এ দেশকে মুক্ত করার জন্যই তাঁর জন্ম হয়েছে (সাদিক, ২০০০)।

স্বাধীনতা অর্জনের পরিক্রমায় ১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা , ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু এ দেশের অবিসংবাদী নেতা ও কান্ডারী হয়ে উঠেন। '৭০ এর নির্বাচন জাতিকে 'মুজিব মানেই বাংলাদেশ' এ ধারণার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় (রহমান, ২০২০)। স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে তখন কবি যেন তাঁর অমর রচনাটি প্রকাশ করলেন। তা হলো- ৭ মার্চ ১৯৭১ এর ভাষণ। বঙ্গবন্ধু জানতেন যে, ঐ সময় স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে, তা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য তাৎক্ষণিক বিপদ বয়ে আনতে পারে। আবার এও জানতেন স্বাধীনতার ঘোষণা ব্যতীত এ মুহূর্তে আর কোন উপায় নেই। এ সময় তিনি এমন এক ভাষণ প্রদান করলেন যা বাংলার প্রতি মানুষকে জানিয়ে দিল প্রস্তুত হবার বারতা, আর শাসকদের শ্যেন দৃষ্টি উপেক্ষা করে তাদের তাৎক্ষণিক আক্রমণকে নিবৃত্ত করলেন প্রজ্ঞাময় এ ভাষণের মাধ্যমে। এ ভাষণ তাঁকে স্বাধীনতার মহানায়ক হিসেবে পৃথিবীর বুকে অমর আসন দিয়েছে।

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে থাকাকালীন মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত বিচারিক প্রক্রিয়াকে মেনে নেন নি। বন্দী থাকা অবস্থায় তিনি তাঁর বিচার করার বৈধতা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তুলেছেন (সরকার এবং আলম, ২০১১)। কেননা তিনি জানতেন তিনি বৈধ নির্বাচিত প্রার্থী আর তাঁকে অন্যায়ভাবে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো

হয়েছে। তাঁর নৈতিক শক্তি পাকিস্তানী শাসক ও বিচারকদের বিস্মিত করে। তিনি বিশ্বাস করতেন এ দেশের মানুষের ভালবাসাই তাঁকে বাচিয়ে রেখেছে (পাইন, ১৯৯১)।

গবেষক ও লেখকদের লেখনীতে উঠে এসেছে মুজিব বাংলাদেশের অস্তিত্বের সমার্থক। বাঙালি জাতি, বাংলাদেশ ও মুজিব একসূত্রে গাঁথা (সাঈদ, ১৯৮৭)। বিদেশীদের চোখেও তিনি এ দেশের প্রতিবিম্ব। লেখকরা তাঁকে নিয়ে, তাঁর জাতির পিতা হওয়া নিয়ে বলেছেন ইতিহাসের বাঁকে একজন ব্যক্তি কখনো এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন যে, মানুষ মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়ে 'জাতির পিতা' মুকুট পরিয়ে দেয় (চৌধুরি, ২০১০)। জাতির পিতা হওয়ার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু এমনকি কামাল আতাতুর্ক ও মহাত্মা গান্ধীর চেয়েও অধিক যোগ্য (চৌধুরি, ২০১৭) । এর আগে যত স্বাধীনতা সংগ্রাম যত দেশে হয়েছে অন্য কোন নেতা এত বিচক্ষণতা ও দুরদর্শিতার সাথে একটি জাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে পারেননি (লেলিন, ২০০৭) । বাংলাদেশ ও মুজিব এক সূত্রে গাঁথা, একটিকে বাদে আরেকটি কল্পনা করা যায় না (চৌধুরি, ২০১০)।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস একজন মানুষের উপস্থিতিতে আলোকিত। লাখো মানুষের প্রচেষ্টাকে তিনি একটি বৃত্তে গেঁথেছিলেন, স্বমহিমায় নেতৃত্ব দিয়ে এ জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙেছিলেন। বাংলাদেশ নামক কাব্যগ্রন্থটি বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, যার প্রতিটি অধ্যায় তাঁর উপস্থিতিতে পূর্ণতা পেয়েছে। তাঁর আদর্শ আর দর্শনেই ধরণীর বুকে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব।

তথ্যসূত্র

চৌধুরি, আব্দুল গাফফার (২০১৭)। *জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, আব্দুস সোবহান গোলাপ সম্পাদিত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু বইয়ে প্রকাশিত, ঢাকা, জনতা প্রকাশ।

চৌধুরি, কবীর (২০১০)। *মুজিব মানে মুক্তি*, শিরোনামে কবীর চৌধুরি সম্পাদিত বঙ্গবন্ধু: জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক বইয়ে প্রকাশিত, ঢাকা, অন্বেষা প্রকাশন ।

জেনকিনস, লরেন্স (১৯৭১)। *সাভিল ওয়্যার ইন পাকিস্তান*, নিউজউইক, ৫ এপ্রিল ১৯৭১ সংখ্যা।

জয়েনউদদীন, খালেক বিন (২০১৯)। *বঙ্গবন্ধুর বাবা শেখ লুৎফর রহমান*, ঢাকা, জিনিয়াস পাবলিকেশন্স।

দিল, আনোয়ার এবং দিল, আফিয়া (১৯৯৯)। *বাংলা ল্যাংগুয়েজ মুভমেন্ট এন্ড ক্রিয়েশন অফ বাংলাদেশ*, ঢাকা, এডোর্ন পাবলিকেশন।

পাইন, রবার্ট (১৯৯১)। *পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু*, ভাষান্তর, ওবায়দুল কাদের ঢাকা, চারুলিপি প্রকাশনী।

মুকুল, এম আর আখতার (২০১৪)। *মুজিবের রক্ত লাল*, ঢাকা, অনন্যা প্রকাশনী।

যুগান্তর (২০২০)। *শেখ রাসেলের নাম কার নামানুসারে রাখা হয় জানালেন প্রধানমন্ত্রী* ‖ ১৮ অক্টোবর , ২০২০। পাওয়া যাবেঃ
https://www.jugantor.com/national/government/356196/শেখ-রাসেলের-নাম-কার-নামানুসারে-রাখা-হয়-জানালেন-প্রধানমন্ত্রী তথ্য নেওয়া হয়েছে ১৫ অক্টোবর ২০২১]

রহমান, আনিছুর (২০২০)। *দ্যোতনায়-দ্রোহে-শিল্পে-সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ*, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ প্রকাশনী, ঢাকা।

রহমান, আতিউর (২০১০)। *বঙ্গবন্ধুর নান্দনিক ভাবনা শিরোনামে*, কবীর চৌধুরি সম্পাদিত বঙ্গবন্ধুঃ জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক বইয়ে প্রকাশিত, ডাকা, অন্বেষা প্রকাশন ।

রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২)। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১৭)। *কারাগারের রোজনামচা*, ঢাকা , বাংলা একাডেমি।

লেলিন, নূহ উল আলম (২০০৭)। *বঙ্গবন্ধু ও বাংলার স্বপ্ন*, ঢাকা, ঝিনুক প্রকাশনী ।

শিকাদার, এ. কে. এম. এ. (২০১২)। *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ*, ঢাকা, বিজয় প্রকাশ ।

সাঈদ, আবু (১৯৮৭)। *ছোটদের বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী ।

সরকার, মোনায়েম এবং আলম, আশফাক উল (২০১১)। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী।

সাদি, শেখ (২০১৪)। *বঙ্গবন্ধু ভাষা ও মন*, ঢাকা, কথা প্রকাশ।

সাদিক, মুসা (২০০০)। *এমারজেন্স অফ বাংলাদেশ* শিরোনামে বাংলাদেশ উইনস ফ্রিডম বইয়ে প্রকাশিত, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী।

যুদ্ধোত্তর দেশ গঠনে রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু

শিবরাজ চৌধুরী
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজবাড়ী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের দীর্ঘ চব্বিশ বছরের শোষণের শৃঙ্খল লোপাট করে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে বিশ্বমঞ্চে আবির্ভূত হয় বাংলাদেশ। এই মাটির আলো হাওয়ায় জন্ম নেয়া যে মানুষটি বিশালতায় হয়ে উঠেছিলেন আকাশের সমান, সেই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এ যাবৎ বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি অগণিত কালজয়ী লেখা লিখেছেন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ছয় দফার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠা, অতঃপর তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা- আমাদের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল পর্বটি বহুভাবে চর্চিত হয়েছে। এ লেখায় যুদ্ধোত্তর দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। আমাদের ইতিহাসের এ অংশটি নিয়ে রয়েছে নানাবিধ তথ্যভ্রান্তি, যে ভ্রান্তি দূর করে আলোতে নিয়ে আসার এখন উপযুক্ত সময়।

বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ জনতার বিপুল সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে স্বাধীন দেশের মুক্ত হাওয়ায় প্রথম শ্বাস নেন। পাকিস্তান নামক যে রাষ্ট্রটি ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বারবার সামরিক আইন এবং নানান কূটকৌশলের মধ্য দিয়ে বাঙালিকে বঞ্চিত করার জন্যে কখনোই একটি স্থিতিশীল সাংবিধানিক রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তুলতে পারে নি। বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার সাথে সাথেই ১১ জানুয়ারি অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে ১১ এপ্রিল থেকে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি কাজ করতে শুরু করে, যার ফলশ্রুতিতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ বাংলাদেশ তার সংবিধান পায়। এ সংবিধানটি বিশ্বের আধুনিকতম সংবিধানগুলোর একটি- যাতে বাকস্বাধীনতা, লিঙ্গসমতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি প্রভৃতি মহৎ নীতির বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। সংবিধান প্রণয়ন করতে পাকিস্তানের কেটে গেছিল ৯ বছর এবং তা বারবার লঙ্ঘিত হয়েছে, অথচ স্বাধীন বাংলাদেশ তার অভ্যুদয়ের এক বছরের মধ্যেই এই আপাত অসাধ্য সাধন করে। এই অসাধ্য সাধনের কুশীলব ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

আমরা জানি মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সামরিক সহায়তা দিয়ে, শরণার্থীদের সাহায্য দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে যে রাষ্ট্রটি, তার নাম ভারত। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাদেরও আত্মত্যাগ ছিল এবং যার স্বীকৃতি দিতে বাংলাদেশ কার্পণ্য করে নি। তবে স্বাধীন দেশে একটি বিদেশী রাষ্ট্রের সেনাদের উপস্থিতি যে শোভন নয়, তা বঙ্গবন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে বুঝাতে সক্ষম হন এবং ১৫ মার্চ, ১৯৭২ এ ভারতীয় সেনাদের সর্বশেষ দলটি বাংলাদেশ ত্যাগ করে। এই ঘটনা থেকে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব এবং কূটনৈতিক প্রজ্ঞা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা ছিল, "সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গেই শত্রু"তা নয়।" আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়টি বিশ্ব ইতিহাসের এক ক্রান্তিকাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক অংশের মধ্যে যে স্নায়ুযুদ্ধ, সে সোভিয়েত-মার্কিন দ্বন্দ্বের ডামাডোলের মাঝেই বাংলাদেশের অভ্যুদয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে সমাজতান্ত্রিক অংশের রয়েছিল বিশেষ সমর্থণ। তাই অবধারিতভাবেই বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক ব্লকে ঢুকে পড়বার কথা। কিন্তু একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে বিশ্বের যেকোন বন্ধুরাষ্ট্রের প্রয়োজন আমাদের ছিল। তাই বঙ্গবন্ধু তাঁর অপার দূরদৃষ্টি দিয়ে একটি জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি বেছে নেন। এর ফলে তার সাকুল্যে সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানসহ বিশ্বের ১২৬ টি রাষ্ট্র, জাতিসংঘ, আই এম এফ, আই এল ও, গ্যাট, ওআইসি এবং বিভিন্ন সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। একটি নবীন রাষ্ট্র তার অভ্যুদয়ের এত অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বমঞ্চে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে ফেলার পেছনে যে বঙ্গবন্ধুর ক্যারিশমাই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য।

১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু বিশ্ব শান্তি পরিষদ থেকে লাভ করেন জুলিও কুরি পুরস্কার। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলেই স্বাক্ষরিত হয় বিখ্যাত মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি, যে চুক্তি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের পটভূমি রচনা করে। এ চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই ২০১৫ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যার সদিচ্ছায় ছিটমহলের মানুষেরা নিজের একটি দেশ খুঁজে পায় এবং বাংলাদেশের সীমানায় যুক্ত হয় ১৭,১৬০ একর ভূমি। বঙ্গবন্ধু যখন ওআইসি'র সম্মেলনে যোগ দিতে পাকিস্তানের লাহোরে অবতরণ করেন, উপস্থিত জনতা তাঁর নামে স্লোগানে স্লোগানে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তোলে। ১৯৭৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বিশ্বমঞ্চের নবীনতম ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের জয়ধ্বনি যেন ধ্বনিত হয় বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে- তিনি বক্তৃতা করেন আমাদের প্রাণের বাংলা ভাষায়। যে ভাষার জন্যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সেই ১৯৪৭ সালে, সে ভাষা তাঁর দুই যুগের সংগ্রাম শেষে জাতিসংঘের অধিবেশনে যখন অনুরণিত হয়, এ জাতির অংশ হিসেবে আমরা গর্বিত না হয়ে পারি না।

পৃথিবীর সর্বত্র নিপীড়িত মানুষের জন্যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আলোকবর্তিকা স্বরূপ। যুদ্ধবিদ্ধস্ত একটি দেশ তিনি পেয়েছিলেন, পাকিস্তানি হানাদারেরা যে দেশকে করে গিয়েছিল শ্মশ্মান, ধ্বংস করে গিয়েছিল অবকাঠামো, হত্যা করেছিল সব আলোকিত মানুষকে। বাংলাদেশ ধনী দেশ ছিল না, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের হৃদয় ছিল সুবিশাল। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলের আক্রমণের নিন্দা জানিয়ে সিরিয়া- মিসরে এক লাখ পাউন্ড চা এবং চিকিৎসক দল পাঠানো হয়। এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, যে সুমহান আদর্শ নিয়ে এই দেশের প্রতিষ্ঠা, সে আদর্শ সমুন্নত রাখতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন বদ্ধপরিকর।

বঙ্গবন্ধু তাঁর শাসনামলে জাপান সফরকালে যমুনা সেতু নির্মাণে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন। বর্তমানের বঙ্গবন্ধু যমুনা বহুমুখী সেতু তারই ফলাফল। ১৯৭৩ সালের ৩১

জানুয়ারি গণভবনে বৈঠক শেষে বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বে জি ন্যাপ মনে করেন, স্বাধীনতার পর খুব কম সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধন করেছে। বাংলাদেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতি যতদূর পুনর্গঠিত হয়েছে, গত তিন বছরের যুদ্ধ- অনাবৃষ্টি ও ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি চরম প্রতিকূল অবস্থার কথা ধরলে, সত্যিই প্রশংসনীয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুগোস্লাভিয়া, কিউবা প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা বঙ্গবন্ধুকে নিপীড়িত মানুষের মুক্তির মহানায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেন। স্নায়ুযুদ্ধের সেই দ্বন্দ্বমুখর সময়ে কেবল নিজের ব্যক্তিত্ব, সংগ্রামী জীবন, প্রজ্ঞা এবং সাহস নিয়ে বঙ্গবন্ধু বিবদমান সকল পক্ষের শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসেই বিরল।

উল্লেখ্য যে, তাঁর নির্দেশেই ১৯৭২ সালে কুমিল্লা সেনানিবাসে গড়ে তোলা হয় বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি। উন্নত ও পেশাদার সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে একটি প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর সুদূরপ্রসারী এই প্রতিরক্ষা নির্দেশনার আলোকেই সাংগঠনিক কাঠামোর বিন্যাস ও পরিবর্তনের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান রয়েছে। ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি পর্যায়ে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক যুদ্ধবিমান পরিচালনা করত। সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের আধুনিক মডেলের মিগ-২১ বিমান প্রদান করে, যেটি তখনও অন্য কোন দেশ পায় নি। চট্টগ্রাম ও যশোর ঘাঁটি চালু হয়ে যায় ততদিনে। তাঁর শাসনামলে স্বাধীন বাংলাদেশের তিনটি নৌ ঘাঁটি স্থাপন করা হয় এবং বানৌজা পদ্মা, বিশখালী, নোয়াখালী, পাবনা, এম আর আমিন, সুরমা, পটুয়াখালী, কর্ণফুলী ও তিস্তা নামে যুদ্ধজাহাজ নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হয়। পাকিস্তানি শাসকদের ষড়যন্ত্র ও বৈষম্যমূলক শাসনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে দেশরক্ষার ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল, অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে মাত্র সাড়ে তিন বছরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার যে ভিত্তি রচনা করে যান, সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে দেশ স্বাধীন করেছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশ যেন আরেকটি শোষণ ক্ষেত্র না হয়ে ওঠে, সে জন্যে সংবিধানে গ্রহণ করেন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পন্থা। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রদত্ত ভাষণে তিনি পাট, বস্ত্র, চিনিকল ও ব্যাংক বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের জাতীয়করণের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। একটি নবীন দেশের অর্থনীতি যদি শুরুতেই মুক্তবাজার প্রতিযোগীতার মাঝে পড়ে, তাতে করে দেশটির অর্থনৈতিক কাঠামো এবং স্থানীয় শিল্পকে ধুঁকতে হয়। তা প্রতিরোধে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতিকে দিকনির্দেশনা দেবার জন্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনায় এই নীতি প্রণয়ন করেন। তাঁর সরকার কৃষক সমাজের দুর্দশা দূর করে চাষিদের স্বল্পমেয়াদি সাহায্য দানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। লবণের উপর থেকে কর উঠিয়ে দেয়া হয়, ২৫

বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হয়। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বগুড়ায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থনৈতিক গতিশীলতা আনয়নে বাংলাদেশ শিল্পব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন ব্যাংকের বহু শাখা দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয়। সে সময় নতুন শিল্প ও কারখানা চালু এবং পুরানো শিল্প কারখানা চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। কূন্য হাত নিয়ে শুরু করা একটি দেশ চালানোর যে সুকঠিন দায়িত্ব তাঁর ওপর বাংলার মানুষ অর্পণ করেছিল, নিজের দিন রাত এক করে তিনি তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত নিয়োজিত করেন বাংলার মেহনতি মানুষের সেবায়।

যুদ্ধে প্রায় নিঃস্ব হয়ে যাওয়া যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে বঙ্গবন্ধু হাত দেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ৯৭টি সড়ক সেতু নির্মিত হয়। রেলওয়ের বিভিন্ন ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্রিজ পুনর্নির্মাণ করার মাধ্যমে রেল ব্যবস্থাকে সচল করে তোলেন। তেজগাঁও ও যশোর বিমানবন্দর চালু করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিমান যোগাযোগ ১৯৭২ সাল থেকেই চালু হয়। তাঁর শাসনামলেই বর্তমান হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (তৎকালীন কুর্মিটোলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর) এর কাজ শুরু হয়।

বঙ্গবন্ধু সরকার যুদ্ধকালীন ৯ মাসের (মার্চ-ডিসেম্বর) সব শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন মওকুফ করেন। শিক্ষকদের ৯ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের চেয়ে শিক্ষা খাতে ৩ কোটি ৭২ লাখ টাকা বেশি বরাদ্দ দেয়া হয়। তাঁর নির্দেশনায় গঠিত কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের পরামর্শ মোতাবেক দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয়। ৭৩-এর অধ্যাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে মুক্তবুদ্ধি চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধু পালন করেন মুল ভূমিকা। এছাড়াও ত্রাণ কার্যক্রম, মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন, খাদ্য ঘাটতি নিরসন, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ, সামাজিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহকে পৃষ্ঠপোষকতা করার মাধ্যমে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু গতি সঞ্চার করেন।

আজ যখন বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে, বঙ্গবন্ধুকন্যার হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হবার লক্ষ্যে, সেই আর্থিকভাবে সচ্ছল বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর শাসনামলকে তখনকার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ের প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। যে মানুষটি বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পর সোনার বাংলার ভিত্তি রচনা করে যাচ্ছিলেন বহুবিধ ভেতর বাইরের ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে, তাঁকে ১৫ আগস্টে হত্যা করার মাধ্যমে স্বাধীনতা ও প্রগতি বিরোধী শক্তি বাংলাদেশকে কক্ষচ্যুত করে। বাংলাদেশকে আবার বিশ্বের বুকে সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছে বহু বছর। কেবল বঙ্গবন্ধুর না-থাকা সময়টাতে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির আস্ফালনে দেশের পিছিয়ে যাবার ইতিহাস আমাদের স্মরণ করায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শে পরিচালিত হলে আমাদের দেশ আসলে কতটা এগিয়ে যেত। যুদ্ধোত্তর যুগে বঙ্গবন্ধুর মূল্যায়নে বিবেচনায় রাখতে হবে তিনি কী নিয়ে শুরু করেছিলেন, স্নায়ুযুদ্ধের সেই সময়ে বিশ্ব পরিস্থিতি কেমন ছিল, দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্র, দেশে দেশি-বিদেশি মদদপুষ্ট সামরিক অভ্যুত্থানের সেই টালমাটাল সময়ে একটি নবীন দেশকে কেমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। বিশ্বের নবীনতম

একটি দেশ- বিপুল জনসংখ্যা, দুইশো বছরের ব্রিটিশ আর চব্বিশ বছরের পাকিস্তানি উপনিবেশিক উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত চরম বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর শাসনকালকে মুল্যায়ন করবে ইতিহাস, আর তাতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, আমাদের জাতির পিতা, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রনেতা হিসেবে সুউচ্চ আসনে থাকবেন- সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র

ইসলাম, মযহারুল (২০০২)। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী।

আসিফ কবীর (২০২০)। বঙ্গবন্ধুর দেশ গঠন ও উন্নয়ন ভাবনা, সমকাল।

ইশফাক ইলাহী চৌধুরী (২০২১)। যুদ্ধোত্তর সশস্ত্র বাহিনী পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা, ইত্তেফাক।

উদিসা ইসলাম (২০২১)। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশের পুনর্গঠন কাজের প্রশংসা বিশ্বব্যাংকের, বাংলা ট্রিবিউন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ওয়েবসাইট; www.albd.org

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানঃ বাংলাদেশের কৃষি বিপ্লবের জনক

খান আসিফ তপু
সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা

অবশেষে সকল উদ্বেগ উৎকণ্ঠাকে দূরে ঠেলে স্বাধীনতার মহানায়ক দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারির সেই দিনটিতে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে কান্নাজড়িত কণ্ঠে সেই ঐতিহাসিক ভাষণের শুরুতেই স্মরণ করেন দেশের ছাত্র, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী এবং কৃষকদের। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি অঙ্গীকার করেন, "নতুন করে গড়ে উঠবে এই বাংলা, বাংলার মানুষ হাসবে, বাংলার মানুষ খেলবে, বাংলার মানুষ মুক্ত হয়ে বাস করবে, বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে- এই আমার সাধনা, এই আমার জীবনের কাম্য। কিন্তু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে তখন যুদ্ধবিদ্ধস্ত সুযোগসন্ধানীদের অপতৎপরতা। চারদিকে খাদ্য সংকট, দুর্ভিক্ষের আভাস পেয়ে হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে বললেন "তলাবিহীন ঝুড়ি"। স্বাধীনতার মহানায়ক দমে যাওয়ার পাত্র নন। তিনি ছিলেন দূরদর্শী, ছিলেন কৃষক দরদী নেতা। বিখ্যাত দার্শনিক রুশো বলেছিলেন, "পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও গৌরবমণ্ডিত শিল্প হচ্ছে কৃষি"। বঙ্গবন্ধু ছিলেন রুশোর এই মন্ত্রে দীক্ষিত। স্বাধীন দেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে তিনি বলেন, "আমাদের চাষী হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হব।" আঁকতে থাকেন নানান পরিকল্পনা। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিলেন, বসলেন মন্ত্রীদের নিয়ে। বিদ্ধস্ত দেশকে পুনর্জ্জীবিত করতে ১৯৭৩ সালেই তৈরি করলেন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। যার লক্ষ্য ছিল, বিধ্বস্ত অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, ভগ্নশিল্প উন্নয়ন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল খাদ্যশস্য উৎপাদনে আত্মনির্ভরতা অর্জন, কৃষিক্ষেত্রে কর্মের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং শহরমুখী শ্রমিকদের ঠেকানোর উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরিভিত্তিক কৃষিভিত্তি গড়ে তোলা (আলম, ২০২০)।

ষাটের দশকে নরম্যান বোরলগ এর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী আধুনিক চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 'সবুজ বিপ্লব' শুরু হলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তার সুফল বাংলাদেশের মাটিতে লাগতে দেয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সবুজ বিপ্লবের ডাক দিলেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে যথাক্রমে ১৪ এবং ১৬ অনুচ্ছেদে যুক্ত করলেন 'কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি' এবং

'গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব। কৃষিতে স্নাতক শেষ করে চাকরিতে যোগদানের সময় কৃষিবিদদের দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন করা হতো, পেত না চিকিৎসক এবং প্রকৌশলীদের মতো প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার মর্যাদা। ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দিলেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন, "কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে কৃষিবিদদের মর্যাদা হবে সবচেয়ে বেশি... আমার মান রাখিস"। তাঁর এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ফলে মেধাবীরা কৃষিশিক্ষায় এসেছে এবং গবেষণা ও সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন সেক্টরে প্রবেশ করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা মোতাবেক দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। প্রতিবছর ১৩ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে কৃষিবিদ দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে, এদিন কৃষিতে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদান ও কৃষিবিদদের মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়টি স্মরণ করা হয় শ্রদ্ধাভরে।

কৃষির উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু একের পর এক যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলঃ

ক. কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনাঃ কৃষিতে গবেষণার বিকল্প নেই, এ কথা উপলব্ধি করে ১৯৭৩ সালে কৃষি গবেষণা সমন্বয়ের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেন। একই বছর বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট পুনর্গঠন করেন। ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার প্রতিষ্ঠা করেন। জুট এগ্রিকালচার রিসার্চ ল্যাবরেটরিকে 'বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট' নামে পুনর্গঠন করেন। প্রতিষ্ঠা করেন পাট মন্ত্রণালয় । তুলার চাষ সম্প্রসারণ করার জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন। হর্টিকালচার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, সিড সার্টিফিকেশন এজেন্সি ও রাবার উন্নয়ন কার্যক্রম পুনর্গঠন করেন। এছাড়া ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন, বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন প্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠন করেন (আলম, ২০২০)।

খ. কৃষকদের প্রণোদনাঃ স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করেন। পাকিস্তান শাসনামলে ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের মুক্তি প্রদান ও সুদসহ ঋণ মওকুফ করেন। জমির পূর্ববর্তী সব ভূমিকর মওকুফ করেন। দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের রেশন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণ করে প্রায় ১৮ লাখ একর কৃষিজমি রক্ষার ব্যবস্থা নেন। উচ্চফলনশীল ধান, পাট ও গম বীজ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেন। স্বাধীনতার পর সল্পসময়ের মধ্যে ২২ লাখ কৃষি পরিবারকে পুনর্বাসন ও হ্রাসকৃত মূল্যে লো লিফট পাম্প, গভীর নলকূপ ও শ্যালো টিউবওয়েল বিতরণের ব্যবস্থা করেন কৃষি ও কৃষকের অকৃত্রিম বন্ধু বঙ্গবন্ধু (রাজ্জাক, ২০২০)।

গ. কৃষি সমবায়ঃ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন বিদ্যমান সমবায় সমিতির পাশাপাশি দ্বিস্তরের সমবায় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য দেশের প্রথম মাইক্রোক্রেডিট কর্মসূচি প্রণয়ন ছিল আরেকটি মাইলফলক (আলম, ২০২০)।

ঘ. কৃষি উপকরণ সরবরাহঃ মানসম্মত বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ, সুষ্ঠু সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা, কৃষিতে ভর্তুকি, বালাই ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা, খামারভিত্তিক ফসল ব্যবস্থাপনা, সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ, ভেঙে যাওয়া অর্থনীতি পুনর্গঠন, মিল্কভিটা পুনর্গঠন, সার, সেচ, বীজ বিষয়ক কার্যক্রম এসবের ওপর সর্বাত্মক জোর দিয়েছিলেন। কেননা তিনি জানতেন, এগুলো যথাযথভাবে না করতে পারলে দেশ অনেক পিছিয়ে যাবে। রাসায়নিক সার উৎপাদনের বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, “আমাদের যে সার কারখানাগুলো আছে এগুলোকে নিশ্চিত উৎপাদনমুখী করতে হবে বেশি করে। প্রয়োজনে আরও নতুন নতুন সারের কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে কৃষি বিপ্লব বাস্তবায়নের জন্য” (আলম, ২০২০)।

১৯৭১ সালে জনসংখ্যা ছিল ৭.৫০ কোটি যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৮ কোটিতে, অপরদিকে স্বাধীনতার ৫০ বছরে প্রায় ৩০ শতাংশ আবাদি জমি হ্রাস পেয়েছে (বাংলানিউজ২৪, ২০২০)। এত কিছু সত্ত্বেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে বাংলাদেশ এখন খাদ্য রফতানি করছে। বঙ্গবন্ধুর কৃষিনীতির ফলে অগ্রগতির যে ধারা রচিত হয়েছিল, তার ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে, অর্জিত হয়েছে অভূতপূর্ব সাফল্য। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে বাংলাদেশ আজ ধান উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ। সারা বিশ্বে উৎপাদিত মোট ইলিশের ৮৬ শতাংশই বাংলাদেশে হচ্ছে, সবজি উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়, আলু উৎপাদনে বিশ্বে ষষ্ঠ, কাঁঠালে দ্বিতীয়, আম ও পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম, একসময়ের ‘সোনালি আঁশ’ খ্যাত পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয়, মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে তৃতীয়, ছাগল উৎপাদনে অবস্থান বিশ্বে চতুর্থ (প্রথম আলো, ২০২১)। এছাড়া ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের সফলতাও বাড়ছে। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) বেশ কয়েকটি জাত ছাড়াও এরই মধ্যে পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) বিজ্ঞানীরা মোট ১৩টি প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। দেশের সার্বিক অর্থনীতি অনেকাংশে কৃষির উপর নির্ভরশীল। ১৯৭২ সালে প্রথম বাজেট ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা, যেখানে কৃষি খাতে বরাদ্দ ছিল ১০৩ কোটি টাকা। অপরদিকে ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেট ৬ লাখ ৩ হাজার কোটি টাকা যেখানে

কৃষি খাতে বরাদ্দ প্রায় ৩২ হাজার কোটি টাকা (প্রথম আলো, ২০২১)! অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২১ বলছে, ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষির অবদান ১৩.৪৭ শতাংশ, দেশের মোট জনশক্তির প্রায় ৪১ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত। সবই সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী কৃষি ভাবনা ও উপযুক্ত পদক্ষেপগুলোর কারণে। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বরে ওয়াশিংটনে বসে হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' আখ্যা দিয়েছিলেন, ২০১০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রভাবশালী ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বাংলাদেশ সম্পর্কে বলছে, "বাংলাদেশ, 'বাস্কেট কেস' নো মোর" (হোসেন, ২০২১)! ইতোমধ্যে, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা (এলডিসি) থেকে উত্তরণে জাতিসংঘের সুপারিশ পেয়েছে বাংলাদেশ। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৬ সাল থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘের তালিকায় আর স্বল্পোন্নত দেশ থাকবে না। বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। যতদিন লাল-সবুজের পতাকা উড্ডীন থাকবে ততদিন এই শ্যামল বাংলায় উচ্চারিত হবে বঙ্গবন্ধুর নাম। এই নাম কৃষক এবং কৃষির যেকোন সংগ্রাম-সফলতায় প্রেরণা হয়ে থাকবে চিরকাল।

তথ্যসূত্র

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২১। অর্থনীতি বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ সরকার।

আলম, শামসুল (২০২০)। *কৃষি ও কৃষকের বঙ্গবন্ধু*, পার্ল পাবলিকেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রথম আলো (২০২১)। *১৩ খাতে বিশ্বের শীর্ষ দশের তালিকায় বাংলাদেশ*, অনলাইন ভার্সন। (Accessed on 12.10.2021, 9:30PM: https://www.prothomalo.com/business/economics/১৩-খাতে-বিশ্বের-শীর্ষ- দশের-তালিকায়-বাংলাদেশ)

প্রথম আলো (২০২১)। *৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকার বাজেট উপস্থাপন সংসদে*। অনলাইন ভার্সন। (Accessed on 12.10.2021, 11:00PM: https://www.prothomalo.com/business/economics/ ৬-লাখ-৩-হাজার-৬৮১- কোটি-টাকার-বাজেট উপস্থাপন-সংসদে)

বাংলানিউজ২৪ (২০২০)। *"কৃষিতে বঙ্গবন্ধুর অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে"* কৃষিমন্ত্রী। অনলাইন পত্রিকা। (Accessed on 12.10.2021, 10:30PM: https://www.banglanews24.com/national/news/bd/776785.details)

রাজ্জাক, আ. (২০২০)। *বঙ্গবন্ধুর কৃষি উন্নয়ন ভাবনা*। বণিক বার্তা-অনলাইন পত্রিকা। (Accessed on 10.0.2021, 8:30PM: https://bonikbarta.net/home/news_description/238282/বঙ্গবন্ধুর-কৃষি- উন্নয়ন-ভাবনা-)

হোসেন শওকত (২০২১)। *তলাবিহীন ঝুড়ি কথাটি যেভাবে বাংলাদেশের হয়েছিল*। প্রথম আলো-অনলাইন ভার্সন। (Accessed on 12.10.2021, 10:00PM: https://www.prothomalo.com/business/analysis/তলাবিহীন-ঝুড়ি-কথাটি-যেভাবে-বাংলাদেশের-হয়েছিল)

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন ও বাংলাদেশ

খান মাহমুদুল হাসান
সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা

"সু-সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না।"

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শিক্ষা মানব সভ্যতার অগ্রগতির জন্য এবং জীবনমানকে উন্নত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জ্ঞান হল শক্তি, জ্ঞান হল আলো, আর শিক্ষা একটি জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার আরেকটি নাম হল আত্মবিশ্বাস এবং উন্নয়নের উপায়। শিক্ষিত জাতি মানে উন্নত জাতি। অন্যদিকে, একটি নিরক্ষর জাতি অনুন্নত এবং পশ্চাদপদ। কিছু অনুন্নত দেশের অনগ্রসরতার কারণগুলির দিকে মনোনিবেশ করলে উন্নয়নের পিছনে শিক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করলেও শিক্ষা মুক্তির আন্দোলন বাঙ্গালিদের অনেক পুরনো। উপনিবেশিক আমলের প্রথম দিকে হাতেগোনা কয়েকটিই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ছাড়া ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। পরবর্তিতে ১৮৩৫ সালে কম মাইনের ভারতীয় ইংরেজি জানা কেরানি তৈরির লক্ষে 'ম্যাকাউলে' দ্বারা ইংরেজি নির্ভর শিক্ষা নীতির প্রবর্তন করা হলেও বাঙ্গালি তথা ভারতীয়দের শিক্ষা ও চেতনা মুক্তির জন্য কোন কাজ করে নাই।

জনমানুষের মুক্তির জন্য শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, আর সেই শিক্ষা ও তার লক্ষ্য কী হবে, শিক্ষার পরিকাঠামো কী হবে, শিক্ষার বিষয়বস্তু বা কী হবে, ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ ও উদ্দেশ্য কেমন হওয়া উচিত এবং সমাজের চাহিদা ও জাতির প্রয়োজনীয়তা কী অথবা শিক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সাথে যুক্ত হবে - এই সমস্ত একটি দেশের শিক্ষা দর্শন। প্রথাগত শিক্ষানীতির পাশাপাশি, আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক পটভূমি বিবেচনা করে এবং বিশাল নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে ফ্রন্টলাইনে রেখে শিক্ষার দর্শন হবে জনগণের জন্য অপরিহার্য শিক্ষা। সামগ্রিকভাবে, শিক্ষা দেশের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা, জনগণের কল্যাণ, উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি পূরণ করতে পারে। সুতরাং একজন ব্যক্তির সমাজের প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদা এবং জাতীয়তাবোধ উপেক্ষা করে শিক্ষা দর্শন

পরিচালিত হতে পারে না। ১৮৫৪ সালের উড'স ডেসপ্যাচ অন এডুকেশন' এর মাধ্যেম 'ম্যাকাউল' এর সম্পূর্ণ ইংরেজি নির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে প্রাথমিকে দেশীয় ভাষার ব্যবহার দেখা গেলেও শিক্ষা দর্শনে বাঙালি বা ভারতীয়বোধ একবারেই ছিল না। পাকিস্তানে ১৯৬২ সালের শরীফ কমিশনের মাধ্যমে বাঙালিদের শিক্ষা থেকে বাইরে রাখার জন্য শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ করা হয় এবং বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম থেকে বাদ দেয়া হয়। সেই শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে বাঙালি প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে তার শিক্ষার অধিকার আন্দোলনের সূচনা করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেবল জাতীয় স্বাধীনতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়াই ছিল না, এর উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি জাতির সামগ্রিক মুক্তি অর্জন করা। এর অর্থ জনগণের অবস্থান হবে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশে এবং এর সমস্ত নীতি বা কাজ জনগণের কল্যাণের জন্য পরিচালিত হবে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সেই প্রত্যাশা গণচেতনায় রূপান্তরিত হয়। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ -এই চারটি মুলনীতি নিয়ে যে দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যে দেশের শিক্ষানীতি হতে হবে জনমুখী, সকলের জন্য সহজলভ্য, কর্মমুখী শিক্ষার দর্শনে উদ্বুদ্ধ। আর বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শনে আমরা এই চারটি মুলনীতির সন্নিবেশে কর্মমুখী এক গুণগত শিক্ষার দর্শনকেই দেখতে পাই।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন এর ব্যাপারে জানতে হলে পাকিস্তান আমলের শিক্ষা আন্দোলন ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হল ১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় ও মুক্তিযুদ্ধের পরে শিক্ষা বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রদান করা বক্তব্য, বাংলাদেশের সংবিধান, বঙ্গবন্ধুরে নির্দেশে তৈরি ১৯৭৪ সালের কুদরতে-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন এর শিক্ষানীতি এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশের শিক্ষায় পুঁজির বিনিয়োগের বিষয়।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় রেডিও এবং টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ বঙ্গবন্ধু প্রদান করেন তার শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করলে আমরা বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শনের এক অলিখিত ইশতেহারের সন্ধান পাই। সেই ভাষণে উল্লেখযোগ্য শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা গুলো হল-

১. মুলধন বিনিয়োগ ছাড়া শিক্ষা খাতে সুষ্ঠু সামাজিক ব্যবস্থা গঠনের জন্য অন্য কোনও বিকল্প নেই।
২. জিডিপির ন্যুনতম ০৪ শতাংশ শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ করা উচিত বলে তিনি অভিমত প্রদান করেন।
৩. কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকদের, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো উচিত।
৪. নিরক্ষরতা মুছে দিতে সকলকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

৫. ০৫ বছর বয়স থেকে শিশুদের বাধ্যতামূলক বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি 'ক্র্যাশ প্রোগ্রাম' নেওয়ার কথা তিনি ব্যক্ত করেন । (কারণ, তখন বাঙালিদের মাঝে শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গিয়ে ছিল।)
৬. সকলের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
৭. নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ১২টি মেডিকেল ও প্রযুক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার কথা তিনি বলেন।
৮. দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য আলাদাভাবে মনোযোগ দিতে হবে হবে।

(তথ্যসূত্রঃ অনু মাহমুদ (সম্পাদনা): বঙ্গবন্ধুর ভাষণঃ জাতীয় প্রকাশনা (সংশোধিত সংস্করণ), ২০১৫, পৃষ্ঠা-৪৫)

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো ১৯৭২ সালের প্রণীত বাংলাদেশে প্রথম সংবিধান। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনার ও দর্শনের আলোকে প্রণীত ১৯৭২ এর সংবিধান বাধ্যতামূলক শিক্ষা ও শিক্ষা বিস্তারের আইনগত ভিত্তি নির্ণয়ে প্রণিধানযোগ্য। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে শিক্ষার কথা বলা আছে। এ অনুচ্ছেদ রাষ্ট্র পরিচালনার মুলনীতি ভাগে অন্তর্ভূক্ত। এ অনুচ্ছেদে মূলত তিনটি বিষয় উল্লেখ আছে। প্রথমত, এখানে আইনানুযায়ী সর্বজনীন, গণমুখী, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলা আছে। সংবিধান বলছে, রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবে। দ্বিতীয়ত, সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য এবং সে প্রয়োজন পূরণের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির ব্যবস্থাও করবে। তৃতীয় বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা হচ্ছে, দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা হবে। এ সবই বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শনের অংশ হিসেবে পরিগণিত।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা ও দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ তার দুটি বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। ১৯৭২ সালের মার্চে চট্টগ্রামে এবং ১৯৭৩ সালের মার্চে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) তিনি দুইটি বক্তব্য প্রদান করেন। সেই বক্তব্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর পাকিস্তান থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে হতাশ ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭২ সালের ৩০ মার্চ, চট্টগ্রামে শিক্ষক ও লেখকদের এক সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় অনুশোচনা প্রকাশ করে তিনি বলেন," এই শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিকশিত মানুষ সৃষ্টির পরিবর্তে এটি শুধু আমলা তৈরি করছে।" তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে, সমাজ থেকে দারিদ্র্য এবং বৈষম্য দূর করা যাবে না এবং সমাজতন্ত্র বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। গ্রামীণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রত্যেক শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের

কিছু দিন করে গ্রামাঞ্চলে কাটানোর পরামর্শ দেন তিনি। পূর্বের সকল শিক্ষা কমিশন বাঙালিদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

১৯৭৩ সালের ২০ মার্চ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় শিক্ষা সম্পর্কে তার চিন্তাধারা আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন বঙ্গবন্ধু। সেদিনের অনুষ্ঠানে নতুন স্নাতক সনদধারী এবং শিক্ষকদের সামনে বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের দুইশত বছরে ও পাকিস্তানের ২৫ বছরে গড়ে ওঠা শিক্ষাব্যবস্থাকে কেরানি তৈরির শিক্ষা ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেনা এজন্য তিনি এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দেন, যার মাধ্যমে আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলা যাবে এবং যার মাধ্যমে "স্বপ্নের সোনার বাংলা" নির্মাণে সহায়তা করবে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন বঙ্গবন্ধু। বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ওপর জোর দেন। তিনি কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন শিক্ষা নিয়ে কাজ করছে বলে উল্লেখ করেন এবং এই কমিশন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন জমা দেবে- যা জাতিকে সমৃদ্ধি ও মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে।

এই দুই বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাভাবনা ও দর্শনের মূল বিষয় উঠে আসে। দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্গবন্ধু এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে মানুষকে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। একটি যথাযথ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের সুষম ও টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর মূল উদ্দেশ্য।

বঙ্গবন্ধুরে শিক্ষা দর্শনের প্রতিফলন যে কুদরত-ই-খোদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট তা আমরা রিপোর্টটির ভূমিকা পড়লে জানতে পারি। এর ভূমিকায় লিখা আছে-
"প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের ইচ্ছা, আগ্রহ ও সহায়তা ছাড়া এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।" (ভূমিকা: কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪)।

শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের জন্য স্বাধীনতার পরেই কুদরত-ই-খুদা কমিশন গঠন করেন বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন শিরোনামে ৩০৯ পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়, যা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার বিষয়ে সর্বাধিক বিস্তৃত কাজ। এর ভূমিকায় কমিশনের উদ্দেশ্য হিসেবে বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটি এবং ঘাটতি দূর ও মানব সম্পদকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে সক্ষমতা অর্জনের কথা বলা

হয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য মানবসম্পদের উন্নয়ন করা। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত না করে কোনো অর্থবহ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা যায় না বলেও উল্লেখ করা হয়েছে এতে। মূলত বঙ্গবন্ধুর দর্শনই প্রতিফলিত হয়েছে এই শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালায়। কমিশনের প্রধান পর্যবেক্ষণে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশার পর্যায়ে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ, ইংরেজি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ভাষা শেখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া, শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের সহায়ক হিসেবে উচ্চ-শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রতিবছর জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা এবং ক্রমান্বয়ে তা ৭ শতাংশে বৃদ্ধির প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এই প্রতিবেদনের সুপারিশগুলো আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে তাঁকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করার ফলে এগুলো আর বাস্তবায়নের সুযোগ তিনি পাননি।

তবে, কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার পূর্বেই বঙ্গবন্ধু তার শিক্ষা দর্শন বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়া শুরু করেন। এর ফলশ্রুতিতে আমার ১৯৭২ এর সংবিধানের বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা সন্নিবেশ দেখতে পাই। এছাড়া প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ দেখতে পাই যা কিনা শিক্ষায় বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও দূরদর্শিতার প্রমাণ।

বাঙালি জাতির জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয়, ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করার মাধ্যমে শিক্ষার বঙ্গবন্ধুর দর্শন বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হয়। পরবর্তিতে জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন বাস্তবায়নে কাজ করছেন। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর পরে বঙ্গবন্ধুকন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রায় ২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন। এছাড়াও শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পেশাগত মান উন্নয়ন ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। জাতির পিতার শিক্ষার্থীদের গুনগত শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার ব্যাপারে জোর দেন। ১৯৭৪ সালে মহিলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেন, "... ক খ শিখলেই শিক্ষিত হয় না, সত্যিকার আলোকপাপ্ত হইতে হবে।"

লিখিতভাবে না হলেও নেতাদের প্রদত্ত বক্তৃতা-বিবৃতি থেকে মূল ধারণা নিয়ে বিভিন্ন লিটারেচার বা দর্শন নির্নীত হয়। দুঃখের ব্যাপার হলো বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লিখিত লিটারেচার একবারেই কম, সেহেতু শিক্ষাবিষয়ক তাঁর নিজ মতামত সুশৃঙ্খল ও সম্পূর্ণভাবে একত্রে কোথাও পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাগুলো গবেষণা করলে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু সে রকমের গবেষণারও অভাব। বঙ্গবন্ধুর অভিপ্রায় ও প্রত্যক্ষ অনুমোদনে বাংলাদেশে প্রথম যে শিক্ষানীতি প্রণীত হয় তার আলোকেই জাতির জনকের শিক্ষাচিন্তা অনেকটাই বিচার্য। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষার চিন্তার আলোকেই আমাদের বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

মহাকালের সারথি

মোঃ গোলাম মোস্তফা
সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা

আজ চারদিন হলো অঝোরে কেঁদে যাচ্ছেন মিস টি. নিয়েলসেন। আগস্টের উষ্ণতা ডেনমার্কের প্রকৃতিকে ততটা উত্তপ্ত করতে পারেনা। কিন্তু টি. নিয়েলসেনের দেহ-মনে দক্ষিণ এশিয়ার সাগর তীরের দেশ বাংলাদেশের রক্ত বহমান। তিনি জন্মেছিলেন বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায়। নাম ছিল 'তারা'। তবে গায়ের রং কালো হওয়ায় ধর্মভীরু দাদী তাকে ডাকতেন 'কালী' বলে। জৈষ্ঠ্যের তপ্ত রোদে স্তব্ধ দীঘিতে ঝাঁপ দিয়ে ও পাড়ার আমিনুলদের গাছ থেকে বরই চুরি করে পরম আনন্দে তা খেয়ে, ভাইয়ের সাথে স্কুলে যাওয়া-আসা করে আনন্দেই কেটে যাচ্ছিল কালীদের জীবন। কিন্তু সে আনন্দ কপালে সইলো না কালীর। ১৯৭১ এর এপ্রিলেই তিনি আটক হয়ে নিবেদিতা হলেন ভিনদেশী নরপশুদের ভোগের উপাদান হিসেবে। পরের ইতিহাস আমাদের সকলের জানা। ১৯৭১ -এর ডিসেম্বরে যখন স্বাধীন বাংলাদেশে 'সভ্য' বাঙালি- এমনকি তার নিজের বাবা-মা-ভাই-বোন তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করল, তখন তাকে 'মা' ডেকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র'-এ ঠাঁই হয়েছিল তারা ওরফে কালীর। পিতার ভালোবাসায় সিক্ত হলেও বাঙালীর আতিথেয়তায় 'মুগ্ধ' কালী বুঝে গিয়েছিল সমাজে তার অবস্থান। তাই অনেক কষ্টে তিনি ডেনমার্কে পাড়ি জমান। নিয়েলসেন আর তার মাকে নিয়ে সুখেই দিন কাটছিল তারা নিয়েলসেন -এর। এখানেও সুখ মুহুর্তের জন্য দূরে সরে গেল। তারা নিয়েলসেন জানতে পারলেন তার আপন জাত ভাইয়েরা পিতৃহন্তারকের তকমা কপালে জুটিয়ে নিয়েছে। তারা হত্যা করেছে নিজ জাতির পিতাকে; যিনি বাঙালিকে দিয়েছেন একটি দেশ, একটি স্বতন্ত্র পরিচয়, দিয়েছেন মানবাধিকার।

জাতির পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ডে সেদিন অশ্রুকাতর হয়েছিলেন অনেকেই। কারণ তিনি এমন এক মহান মানুষ, যাকে পাওয়ার জন্য বাঙালি জাতিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে শত বছর ধরে। মানুষের মুক্তির জন্য নিবেদিত প্রাণ এই মানুষটি কৈশোর থেকে আমৃত্যু মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করে গেছেন। ন্যায়ের পথে অবিচল থেকেছেন তিনি সারাটি জীবন। কেবল মানুষ নয়, সকল জীবের প্রতিই তাঁর ছিল অসীম দরদ। ১৯৬০ -এর দশকে একদিন একজন মার্কিন কূটনীতিবিদ জাতির পিতাকে তার বাসভবনে আমন্ত্রণ জানান। জাতির পিতার সাথে আলাপকালে কূটনীতিক সাহেবের কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করতে থাকলে তিনি কুকুরটিকে পাশের কক্ষে বন্দী করে রাখেন। জাতির পিতা বিষয়টি বুঝতে পেরে বলেন– "তুমি কুকুরটিকে ছেড়ে না দিলে আমি তোমার সাথে কথা বলতে পারব না। আমি বন্দী ছিলাম অনেক দিন। বন্দী জীবনের কষ্ট আমি বুঝি।"

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তিনি রচনা করেন পৃথিবীর ইতিহাসের এক অমর কাব্য। ১৯ মিনিটের সেই উপস্থিত বক্তব্যে তিনি বাংলার মানুষের ২৩ বছরের বঞ্চনার ইতিহাস বলে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর সে ভাষণ পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর একটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে তিনি ন্যায়ের পথের সবাইকে সম্মান করেছেন। তিনি বলেছিলেন, "কেউ যদি ন্যায্য কথা বলে, সে একজন হলেও তার কথা আমরা মেনে নেব।" জাতির পিতার এ অনিন্দ্য সুন্দর ভাষণটিকে কবি নির্মলেন্দু গুণ চিত্রিত করেছেন–

অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন,
তখন পুলকে দারুণ ঝলকে ত্বরিতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা,
জনসমুদ্রে লাগিল জোয়ার, দখিন দুয়ার খোলা।
কে রোধে তাঁহার বজ্র কণ্ঠ খানি?
জনসমুদ্রের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর
অমর কবিতাখানি।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা ছিলেন সবার মধ্যমণি, কেন্দ্রীয় চরিত্র। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেক পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী মুক্তিযোদ্ধা/ যৌথ বাহিনীর হাতে থাকলেও কোন বিদেশি সৈনিকের উপর অত্যাচার চালানো হয়নি; বরং তাদের আটক রাখা হয়েছে, যেন জাতির পিতাকে জীবিত ও সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ঐ সব যুদ্ধবন্দীকে দর-কষাকষির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বঙ্গবন্ধু বাঙালির প্রাণে এতটাই আপন, যেন তিনি কোথাও না থেকেই সর্বত্রই আছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি স্বশরীরে উপস্থিত না থাকলেও তিনিই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে জাতির পিতা মাত্র ১৯ মাসে আমাদের উপহার দিয়েছেন একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান, যা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সে সময়টিতে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মিশেলে এমন সংবিধান তৈরি মোটেও সহজ ছিল না। তিনিই সর্বজনীন শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে চল্লিশ হাজারের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেন। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদ থেকে তিনি পাটকলসহ অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করেন। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এ মহান নেতা সংবিধান কার্যকরের পরপরই ১৯৭৩ সালে জাতীয় নির্বাচনের ডাক দেন। বর্তমানে বাংলাদেশে পরিচালিত 'ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন' তাঁর হাত ধরেই যাত্রা আরম্ভ করে ১৯৫০ এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে।

স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পূর্বে জাতির পিতার জীবনকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি– ১. জীবন গঠন পর্ব, ২. আদর্শ বাস্তবায়ন পর্ব।

জাতির পিতা জন্ম থেকে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গঠন পর্যন্ত অংশকে আমরা বলতে পারি জীবন গঠন পর্ব। এ সময়ই তিনি শিখেছেন পরোপকারিতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, আপন স্বার্থ ত্যাগের মানসিকতা। জাতির পিতার লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে জানা যায়,

একদিন ছোট বেলায় জাতির পিতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন গরীব ছাত্রকে নিজ বই এবং কাপড় দান করে দিয়েছিলেন। আর একবার তিনি নিজ ঘর থেকে কাউকে না বলে চাল নিয়ে দিন মজুরদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর এমন মহান মানসিকতাই পরবর্তী জীবনে তাঁকে মানুষের জন্য দরদী হতে উৎসাহিত করেছিল। তাই আমরা দেখতে পাই, যৌবনে যখন জাতির পিতা দেখলেন, দাওয়াল (চুক্তিভিত্তিক ধান মাড়াইকারী) সম্প্রদায় সরকারি বিধি-নিষেধের কারণে নিজেদের সংগ্রহ করা ধান নিজ এলাকায় নিতে পারছে না, তখন তিনি চুপ থাকতে পারেননি; প্রতিবাদে ফেটে পড়েছেন। অথবা, যখন তিনি দেখলেন মুসলিম লীগের একজন নেতার আগমনকে উপলক্ষ করে ধনী-দরিদ্র সকলের নিকট থেকে চাঁদা তোলা হচ্ছে, যা গরিবের জন্য কষ্টের কারণ; তিনি উপর মহলে বিষয়টি অবহিত করেন এবং এর ফলে ঐ টাকা নিজ এলাকার শিক্ষার উন্নয়নে ব্যয় হয় এবং পরবর্তীতে এমন কর্ম বন্ধ হয়। তাঁর শৈশবের জীবন গঠন পর্যায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সত্যের পথে অবিচল থাকা। সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী থাকাকালীন সময়ে তিনি প্রথম সাম্প্রদায়িকতার উগ্র রূপ দেখতে পান। সে সময় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে এসে ইতঃস্ততবোধ করলেও তিনি ছিলেন সাহসী, সত্যের পথে অবিচল। সত্য ও ন্যায়ের এ মহান শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন পিতা শেখ লুৎফর রহমানের নিকট থেকে। জাতির পিতার পরবর্তী জীবনে এর তীব্র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তিনি মিথ্যা অভিযোগে কারাগারে আটক থেকেছেন। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের সাথে চলতে কোন আপোস তিনি করেননি।

অন্য দশজন কিশোরের ন্যায় জাতির পিতার কৈশোরও ছিল উচ্ছ্বল। তিনি ভালো ফুটবল খেলতেন। একবার তিনি এবং তাঁর পিতা দলীয় ক্যাপ্টেন হিসেবে দু'টো ভিন্ন দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন, যারা পরস্পরের বিপরীতে খেলায় অংশ নেয়। সুস্থ প্রতিযোগিতা তিনি শৈশব এবং কৈশোরেই শিখে নিয়েছিলেন। গোপালগঞ্জে শিক্ষা গ্রহণকালেই তিনি রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। প্রথমে তিনি রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হাত ধরে রাজনীতিতে হাতেখড়ি নেন। পরবর্তী জীবনে নানা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালির অবিসংবাদিত ও প্রাণের নেতা। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে পড়াকালীন তিনি প্রথম নির্বাচিত হন ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে। সে সময়ই তিনি অবিভক্ত ভারত বর্ষের এক কুৎসিত সামাজিক রোগ দেখতে পান। ধর্মান্ধতার বিষবাষ্প সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে উপস্থিত হয় সকলের সামনে। তিনি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহায়তায় 'লঙ্গরখানা' খুলে বাস্তুচ্যুত অনাহারী মানুষদের খাবার ও অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। মূলত তখন থেকেই তিনি শোষিত-নির্যাতিত মানুষের পক্ষে দাঁড়ানোর পূর্ণ সুযোগ পেতে থাকেন। তিনি তাঁর একজন বন্ধুকে নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিভীষিকার কিছু ছবি তুলে তা নেতাজী মহাত্মা গান্ধীকে উপহার দেন, যা মহাত্মা গান্ধীর জীবনে আলোড়ন তৈরি করে।

তিনি এক সময় পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে নেমে পড়েন। তিনি মানব কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। তাই তিনি বলেছিলেন, "পাকিস্তান যদি আনতে না পারি, তবে পড়ালেখা করে কী লাভ?" জাতির পিতা তখন কেবল সাধারণ মানুষের স্বার্থ

নিয়ে চিন্তা করেছিলেন, উপর মহলের নেতাদের শঠতা আর ধূর্ততা তখনও তিনি ধরতে পারেননি। তবে মানুষকে অনির্দিষ্ট কাল যাবৎ বোকা বানিয়ে রাখা যায় না। জাতির পিতা অচিরেই বুঝে গিয়েছিলেন পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতাদের শঠতা। তাই চির তরুণ এ নেতা আবার নেমে পড়লেন বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য। স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার পথে **১৯৪৭** থেকে **১৯৭১** পর্যন্ত চব্বিশ বছর ছিল একটি অন্তবর্তীকালীন সময়। পাকিস্তানী শাসক মহলের চক্রান্ত বুঝতে পেরে অন্যান্য দেশপ্রেমিক নেতার ন্যায় বঙ্গবন্ধুও বিকল্প রাজনৈতিক মঞ্চের কথা চিন্তা করতে থাকেন। পাকিস্তান গঠনের মাত্র পাঁচ মাসের মাথায় তিনি গঠন করেন ছাত্রলীগ। পরবর্তীতে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হলে কারান্তরীন জাতির পিতা দলটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁর হাতেই আওয়ামী লীগ শৈশব পেরিয়ে যৌবনে উত্তীর্ণ হয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আপামর জনসাধারণের নিকট পৌঁছানো প্রয়োজন ছিল। আর সে প্রয়োজন সিদ্ধ করতে রাজনৈতিক দল গঠন অপরিহার্য ছিল।

জাতির পিতা জীবনের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করেন। সে সময় জাতির পিতা এবং তাঁর সহকর্মীগণ বাঙালির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্ত্বার বিষয়ে মানুষকে বোঝাতে এতটাই সক্ষম হয়েছিলেন যে, নির্বাচনে মুসলিম লীগ ৩০০ টি আসনের মাঝে মাত্র ৯টি আসনে জয়ী হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে তিনি সংসদ সদস্য (প্রাদেশিক সংসদ) থাকাকালীন সময় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য আইন উত্থাপন করেন। সেই আইন অনুসারেই বর্তমান 'বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন' পরিচালিত হচ্ছে।

তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি আইয়ুব খানের সামরিক শাসন মেনে নিতে পারেননি। তিনি বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতিকে ভালোবাসতেন। তাই তিনি '৫২-র ভাষা আন্দোলনে কারাগারে থেকেও গোপনে সহায়তা করেছেন; একজন বিদেশি সাংবাদিকের কথার প্রতিবাদ করে বলেছেন, "বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি রাষ্ট্র"। জাতির পিতা তাঁর জীবনের আদর্শ বাস্তবায়ন পর্বে এসে আমাদের সামনে তুলে ধরেন ৬ দফা বা 'বাঙালির বাঁচার দাবী', এই ৬ দফা দাবীকে বাংলার ম্যাগনাকার্টা বলে অভিহিত করেন অনেকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশ সমার্থক শব্দ। তিনি আমাদের একটি স্বাধীন সত্ত্বা দিয়ে সম্মানিত করেছেন। তাইতো কবি সুফিয়া কামাল বলেন–

হে সংগ্রামী! সাহসী, নির্ভীক
তব জয়ধ্বনি দিক দিক প্লাবিয়া উঠিছে ঊর্ধ্বাকাশে,
পীড়ক শাসক তাই শঙ্কিত হৃদয়ে কাঁপে ত্রাসে।

তথ্যসূত্র

ইব্রাহীম, নিলীমা। আমি বীরাঙ্গনা বলছি ('তারা/কালী' সংক্রান্ত ঘটনা)

চৌধুরী, আবু সাঈদ। প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি (একজন মার্কিন কূটনীতিকের জবানীতে বঙ্গবন্ধুর মানব ও প্রাণী প্রেমের বর্ণনা)

বহির্বিশ্বের দর্পণে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

রায়হান মাহমুদ হাননান
সহকারী সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক উভয় দিক মিলিয়েই ইতিহাসের একটি পরিপূরক ঘটনা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সমগ্র জীবনে বাংলা ও বাঙালিকেন্দ্রিক স্বপ্নের বাস্তবায়ন করেছিলেন বাঙালি জাতির জন্য স্বাধীন ভূমি, স্বাধীন পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত অর্জনের মাধ্যমে। আর বাঙালি জাতির কাল পরিক্রমায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবর্ষ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তী, এই দুই উৎসব যুগলবন্দী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

বাঙালি জাতির সবশ্রেষ্ঠ গৌরব অর্জনের সংগ্রাম যখন তুঙ্গে, সেই ১৯৭১ সালে পুরো বিশ্বই যেন বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহ পক্ষাবলম্বন করে পাকিস্তান ও তার সামরিক জান্তার; অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত ও কিউবা বাঙালিদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে সমর্থন দেয়। এর মধ্যেই প্রবাসী বাঙালি ও বাঙালি কুটনীতিকদের তৎপরতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গড়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি নাগরিক সংহতি। বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী, ও মানবাধিকার কর্মীদের লেখনি ও সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ, বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও এর নেপথ্যের প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে ওঠে। শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষ, উভয়ের আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রম পরিচালনার গতিবিধিও তৈরি হয় এই আন্তর্জাতিক পরিচিতির ওপর ভিত্তি করে। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বোঝার জন্য এই সকল দালিলিক প্রমাণের আলোচনা ও বিশ্লেষণের স্বতন্ত্র গুরুত্ব রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে বিভিন্ন দেশের যে সকল সাংবাদিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকার কর্মীদের কাজসমূহ বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে রয়েছেন ডেভিড ফ্রস্ট, এ্যান্থনি মাসকারেনহাস, আর্চার ব্লাড, সাইমন ড্রিং, রবার্ট পেইন, রিচার্ড কে. টেইলর, লেয়ার লেভিন, সিডনি শনবার্গ, এ এল খতিব, জিম ম্যাকিনলে প্রমুখ। স্বল্প কলেবরে সকলের লেখার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর না হলেও, গুরুত্বপূর্ণ কিছু উক্তি ও পর্যবেক্ষণ সন্নিবেশনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনাকে সামগ্রিকভাবে বিচারের অবকাশ রয়েছে।

১৯৭২ সালের ১৮ই জানুয়ারি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিউ ইয়র্কের ডব্লিউ এন ই ডব্লিউ টিভির সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে একটি সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার দেন। 'দি ডেভিড ফ্রস্ট শো' অনুষ্ঠানে এই সাক্ষাৎকার প্রচার হবার পরবর্তীতে বহির্বিশ্বে একটি আলোড়নের সূত্রপাত হয়। এই সাক্ষাৎকারে বঙবন্ধুর অসাধারণ বাগ্মিতার পাশাপাশি তীক্ষ্ম তেজস্বীয়তা, দূরদর্শিতা ও সহজাত নেতৃত্বগুণও প্রদর্শিত হয় সমগ্র পৃথিবীর জন্য। সাক্ষাৎকারের শুরুতে ডেভিড ফ্রস্ট পুরোনো ঢাকার শাখারিপট্টিতে চালানো ধ্বংসযজ্ঞ তুলে ধরেন বিশ্ববাসীর সামনে। এরপর ফ্রস্ট-মুজিব কথোপকথনে উঠে আসে ২৬শে মার্চের কালরাতের বিভীষিকা, এবং কারাবন্দি শেখ মুজিবুর রহমানের যাপিত জীবনের নানা প্রশ্ন। সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশের রিজার্ভ যখন শুন্য, সেই অবস্থায় দেশ গঠনের নিবিড় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর মুখ থেকে বিশ্ববাসী জানতে পারে, বাংলাদেশ ও বাঙালির প্রতি তাঁর নিখাদ মমতার কথা-

"আমি কীভাবে আমার জনগণকে ত্যাগ করি? আমি একটি জাতির নেতা। আমি লড়াই করে মরে যেতে পারি, কিন্তু তাদের ত্যাগ করতে পারি না"

(ফ্রস্ট, ১৯৭২)

বঙ্গবন্ধু যে প্রকৃতই তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত ছিলেন এর প্রমাণ পাওয়া যায় আরেক প্রখ্যাত সাংবাদিক সাইমন ড্রিং-এর ভাষ্যতেও। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ৬ তারিখ ঢাকায় আসেন সাইমন ড্রিং, বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী হতে। ২৫ মার্চ কালরাতের ভয়াল ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে তিনিই প্রথম বিশ্ববাসীকে অবহিত করেন 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকার মাধ্যমে যখন পাকিস্তানি সৈন্যরা ঢাকায় অভিযান চালানোর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, সেই খবরটি ড্রিং পৌছে দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ও তাঁকে অনুরোধ করেন নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার জন্য। সাইমন ড্রিং-এর ভাষ্য অনুযায়ী-

"রাত ৯টার দিকে হোটেলের লবিতে একজন গাড়িচালক আমাকে বললেন, আমি দেখে এসেছি ক্যান্টনমেন্ট থেকে সৈন্যরা গাড়ি বোঝাই করে বেরোচ্ছে।" তখন শেখ মুজিবের কাছে টেলিফোন করলাম। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "আমি পালিয়ে যাব না, আমি পালিয়ে গেলে পাকিস্তানি সৈন্যরা ঢাকার সব লোককে মেরে ফেলবে। আমাকে খুঁজতে জ্বালিয়ে দেবে ঢাকার সব বাড়িঘর।" তাঁর এই কথাটিতে যুক্তি ছিল।"

(ড্রিং, ১৯৯৬)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে প্রথম পরিচয়েই সাইমন ড্রিং অনুভব করতে পেরেছিলেন তাঁর সহজাত নেতৃত্বগুণ। ১৯৭১ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সাইমন ড্রিং ছিলেন ভিয়েতনামের সম্মুখ সমরের একজন সাহসী সাংবাদিক। বাঙালির

স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরবার জন্য ৬ই মার্চ ঢাকায় পৌঁছান তিনি। পরদিনই তিনি ছুটে যান রেসকোর্স ময়দানে, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনবার জন্য-

"শেখ মুজিব ছিলেন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণার উৎস। তিনি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন। ৭ মার্চের জনসভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। শেখ মুজিব-এর বক্তৃতার ভাষা না বুঝলেও তীব্র কণ্ঠ ও আবেগ আমাকে স্পর্শ করেছিল। আমি অন্তর দিয়ে তা উপলব্ধি করেছি।"

(ড্রিং, ১৯৯৬)

বাংলাদেশ গঠনের প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মনিবেদন এতটাই গভীর ছিলো যে, ভাষার ব্যবধান সমস্যা হয়ে ওঠেনি কখনোই। ১৯৭১ সালে ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলেট জেনারেলের মিশন প্রধান ছিলেন মি. আর্চার ব্লাড। বাঙালিদের ওপর চালানো নির্যাতন, গণহত্যা, ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা সংক্রান্ত সকল রিপোর্ট যিনি নিরলসভাবে পাঠিয়েছিলেন ওয়াশিংটন ডিসিতে। পরবর্তীতে পাঠানো এ রিপোর্টসমূহ পরবর্তীতে বিখ্যাত হয় 'দি ব্লাড টেলিগ্রামস' নামে। অথচ, পাকিস্তানে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড তখন সুদূর করাচিতে বসে বসে ঠিক তার বিপরীত রিপোর্ট পাঠাচ্ছিলেন। পরবর্তীতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন সেক্রেটারি অব দি স্টেট হেনরি কিসিঞ্জার, ছায়া কুটনীতির কৌশলে ইয়াহিয়া খানকে মাধ্যম করে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন চীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে। যার ফলশ্রুতিতে, আর্চার ব্লাডের পাঠানো রিপোর্টগুলো হয়ে উঠলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান নীতির সাথে সাংঘর্ষিক। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে ফেরত ডেকে পাঠানো হয় ওয়াশিংটন ডিসি থেকে। কিন্তু, বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ার আগেই আর্চার ব্লাড বুঝে ফেলেছিলেন যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই-
"পরে (মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রধান কর্মকর্তাগণ) আমার মতামত জানতে চাইলে আমি বলেছিলাম, মানুষের চোখমুখে যে দৃঢ়তা দেখছি তাতে আমি নিশ্চিত, পাকিস্তানের ভাঙনের পালা শুরু হয়ে গেছে।"

(ব্লাড, ২০০২)

স্বাধীনতার জন্য বাঙালির এই দৃঢ়তা ও স্পৃহার কথা ছড়িয়ে গিয়েছিলো সমগ্র বিশ্বে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লেখক, সাংবাদিক, ইতিহাসবিদ ও মানবাধিকার কর্মীগণ তাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে মুক্তিযুদ্ধে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতেন। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রবার্ট পেইন তাঁর 'ম্যাসাকার' (১৯৭৩) গ্রন্থে তুলে ধরেন ১৯৭১ সালের সেই ঘটনাবলী। আর বাংলাদেশ নিয়ে বিশ্ববাসীর সহজাত আগ্রহ থাকার এই বইটি পায় 'বেস্ট সেলার' মর্যাদা (হাননান, ২০২১)। রবার্ট পেইন তাঁর লেখায় তুলে এনেছেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে

জানানো 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল' আহ্বানে সাড়া দিয়ে, বাংলার গ্রামগুলো কী দুর্বেদ্য দুর্গে পরিণত হয়েছিলো। পেইনের লেখা থেকে বিশ্ববাসী জানতে পারেঃ

"গ্রামবাসী অত্যন্ত সুকৌশলে এবং নিশ্চিতভাবে পাকসেনাদের ওপর আক্রমণ চালাত। টহল দেওয়া দলগুলোকে তারা কায়দা করে আলাদা করে ফেলতো, তারপর গ্রামের কায়দায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরে ফেলা। তাছাড়া অনেক সৈন্যবাহী জিপের কনভয় তারা স্রেফ বড় বড় গর্ত খুঁড়েই ধ্বংস করে ফেলেছিল। হত্যাযজ্ঞের শুরুর দিকে গ্রামের সাধারণ মানুষ এভাবেই একটি প্রধান শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। হত্যাকান্ড আর একতরফা থাকলো না; এভাবে প্রতিরোধে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আগামী দিনের বাংলাদেশ।"

(পেইন, ১৯৭৩)

রবার্ট পেইনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সময় ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে এক এক জনসাধারণ মানুষ হয়ে ওঠেন অস্তিত্বের সৈনিক। পশ্চিমা সামরিক বাহিনীর ধারণা ছিলো, কেবল ৪৮ ঘণ্টার অভিযান চালিয়েই বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে বিলীন করে দেয়া যাবে। বেনুচিস্তানে পূর্বে চালানো এ ধরনের সাময়িকী অভিযান- বেই অভিযান টিক্কা খানকে দান করেছিল 'বেলুচিস্তানের কসাই' উপাধি; ১৯৬৫ সালের সেই পরিকল্পনা পুনরায় ১৯৭১ সালে ব্যবহার করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন ইয়াহিয়া ও তার অনুসারীরা।

বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করে রবার্ট পেইন তখন প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, পাকিস্তানি সামরিক জান্তার এই ধারণাটি ছিল কত অসার। বাঙালি বীরের জাতি, যা ইতিহাস ও এঁতিহ্যের মাধ্যমে লালিত হয়ে এসেছে চিরকাল। এই এঁতিহ্যের কথা তাঁর বইয়ে তুলে এনেছিলেন রবার্ট পেইন-

"মোগলদের কাছে এই বাংলা ছিলো বিদ্রোহভূমি। মোগল সম্রাটরা বছরের পর বছর অভিযান চালিয়েছে সেই সুদুর দিল্লি কিংবা আগ্রা থেকে। বিদ্রোহ দমনের ঘোষণাও তারা দিয়েছে। বছর দু'বছর যেতে না যেতেই বাংলা আবার শাসনের বন্ধনযুক্তি ঘটিয়েছে, হয়েছে স্বাধীন।"

(পেইন, ১৯৭৩)

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও পাকিস্তান আমলে ভাষা-কৃষ্টি-সাংস্কৃতির লড়াইয়ে বারংবার বাঙালির স্বাধীনতার স্পৃহা মৃত হয়ে উঠেছে, যা রবার্ট পেইন লক্ষ্য করেছেন-

"তারপর এলো ব্রিটিশরা। কিন্তু চিরশত্রুরা বাংলার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি তারাও ।"

(পেইন, ১৯৭৩)

বাঙালির স্বাধীনতাকামী চেতনাকে খাটো করে দেখবার জন্য পাকিস্তানি শাসকদের তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি করেন তিনি-

“৭১-এ পাকিস্তানিরা কত সহজে ভেবেছে যে, এদেরকে দমন করা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। স্থুল ছিল তাদের ধারণা, স্থুল ছিল তাদের মনন, নতুন ঘটনা, ঘটনার পরম্পরতা, এ সম্বন্ধে পাকিস্তানি সামরিক নেতৃত্ব বলা যায় অজ্ঞই ছিল। ইতিহাসই বলে দেয়, স্বদেশ ভূমির জন্য যুদ্ধ বাঙালিদের ঐতিহ্য।”

(পেইন, ১৯৭৩)

বাঙালির স্বদেশ ভূমির জন্য এই সংগ্রাম অনুরণিত হয়েছিল পৃথিবীর তাবৎ স্বাধীনতাপ্রেমী মানুষের হৃদয়ে! জনে জনে নাগরিক সংহতি তুলে তারা প্রতিবাদ করেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। এমনই এক উজ্জ্বল উদাহরণ হলেন রিচার্ড কে. টেইলর। ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করলেও, তিনি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন কমিটি’ গঠন করে জনমত গড়ে তুলেছিলেন। উক্ত কমিটির মাধ্যমে তাঁরা খোদ হোয়াইট হাউজের সামনে ‘ইস্ট পাকিস্তান রিফিউজি ক্যাম্প’ স্থাপন করেছিলেন। ক্যাপিটল পুলিশের চোখ রাঙানিকে তোয়াক্কা না করে, যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ জনগণ শামিল হয়েছিলেন মার্কিন সরকারের পাকিস্তান তোষণ নীতির বিরোধিতায় ১ কোটি শরণার্থীর প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন তারা, স্যুয়ারেজ পাইপ দিয়ে বানানো সেই রিফিউজি ক্যাম্পের ভেতর রাত কাটিয়ে, প্রবল বর্ষণে শরণার্থীদের মতো আশ্রয়হীন সময় কাটিয়ে, এবং শুধু ভাত, ডাল ও পানি খেয়ে দিন কাটিয়ে শরণার্থীদের কষ্ট অনুধাবন করার প্রয়াসে।

বিভিন্ন প্রতীকী কর্মসূচি, পাকিস্তান দূতাবাস অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল প্রভৃতির মাধ্যমে আন্দোলনটি গতিশীল করেছিলো সিনেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিলকে। চার্ল স্যাক্সবি বিল নামে পরিচিত এই বিলটি ছিলো বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত, যার মাধ্যমে পাকিস্তানে মার্কিন সরকার কর্তৃক অস্ত্র, গোলাবরুদ ও খাদ্যসামগ্রী রপ্তানি বন্ধ করা যায়। ৮ নভেম্বর ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট যখন পাকিস্তানে অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, তখন থেকেই পাকিস্তানি সামরিক শক্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন ও ফিলাডেলফিয়াতে বন্দর অবরোধ করে, পাকিস্তানমুখী জাহাজগুলোকে কূন্য ভান্ডার নিয়ে যাত্রা করতে বাধ্য করে ডাইরেক্ট অ্যাকশন কমিটি। রিচার্ড কে. টেইলর তাঁর স্মৃতিচারণে তুলে ধরেন-

“কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশে পরিণত হয় এবং সেই দল দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে, যারা আপাতদৃষ্টিতে বহু আগে (যদিও সময়টা মাত্র এক বছর) পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল। ১৯৭২ সালের মার্চের মধ্যে প্রায় সব শরণার্থী ফিরে আসেন নিজেদের মাতৃভুমিতে।”

(টেইলর, ১৯৯৭)

সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির 'রিফিউজি সাব-কমিটি'-র স্টাফ পরিচালক ডেল. এস. ডি. হান, 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন কমিটি'-র অবদানকে মূল্যায়িত করেছেন এভাবে-
"এই দেশে বাংলাদেশের কোন স্বাভাবিক গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। সাধারণত রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য গ্রহণযোগ্যতার প্রয়োজন হয়। অহিংস কার্যক্রম সেই গ্রহণযোগ্যতা তৈরীতে সাহায্য করেছিল।"

(হাননান, ২০২১)

প্রকৃতপক্ষে, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের জনগণের আত্মত্যাগ সমগ্র পৃথিবীতে বাংলাদেশের পরিচিতি তুলে ধরতে সাহায্য করেছিল। বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতার আরেকটি বিশেষ উদাহরণ হয়ে আছে, জাতিসংঘে প্রথমবারের মতো লাল-সবুজ পতাকার উড্ডয়নের পটভূমিতে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, কমনওয়েলথ ও ইসলামিক ঐক্য সংস্থা ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেও ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে পরপর দুইবার চীনের ভেটোর কারণে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ অর্জনে ব্যর্থ হয়। অবশেষে, ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ, জাতিসংঘে ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে ১৩৬ নম্বর সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯শে সেপ্টেম্বর, বিশ্বের বাকি সব দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকাটিও উড়তে শুরু করে নিউইয়র্কে, জাতিসংঘের সদর দপ্তরে।

অতঃপর ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের অধিবেশনে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দান করেন। ঐতিহাসিক এই বক্তব্যে তিনি পুনরায় তুলে ধরেন বাঙালির স্বাধীন, সার্বভৌম, অবিনশ্বর চেতনার কথাটিই-
"বাংলাদেশের মতো যেসব দেশ দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে, কেবল তাদেরই এই দৃঢ়তা ও মনোবল আছে। মনে রাখবেন সভাপতি, আমরা বাঙালি জাতি চরম দুঃখ ভোগ করতে পারি, কিন্তু মরব না।"

(রেহমান, ১৯৭৪)

পৃথিবীর সকল নেতারাই বিমুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকেন এই মহানায়কের বক্তব্য। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস কালাহান পরবর্তীতে এই ভাষণ নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "খুব শক্তিশালী ভাষণ ছিলো এটি।" (হাননান, ২০২১)

প্রকৃতপক্ষে, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ তথা বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এতটাই ব্যাপক ছিলো যে সমগ্র বিশ্বে তা তুলেছিলো আলোড়ন। শেখ মুজিবুর রহমানের বিশালাকার হৃদয়ে যেমন প্রতিধ্বনিত হয়েছিলো সমগ্র বিশ্বের সংগ্রামী মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াই, তেমনি বিশ্বনেতারাও তাদের সমর্থনে, অভিবাদনে বঙ্গবন্ধুর প্রতি

তাদের আত্মিক নিবেদন প্রকাশ করেছিলেন। বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়েও বঙ্গবন্ধু জানিয়েছিলেন আলজেরিয়া, ভিয়েতনাম, গিনি বিসাউ, প্যালেস্টাইন, জাম্বিয়া, নামিবিয়ার জনগণের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি তার একাত্মতা।

এভাবেই, সকল স্থানিক বা কালিক পরিচয়কে ছাপিয়ে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন সমগ্র বিশ্বের, সকল সম্প্রদায়ের। মানবযুক্তির প্রদীপশিখা তাঁর স্পর্শে হয়েছিল জলন্ত মশাল। তৎকালীন লেখক-বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের লেখনীতে, কর্মে, ভাষ্যে সে কথাই বারংবার ঘুরে ফিরে এসেছে - বাঙালি বীরের জাতি, আর এ জাতির শ্রেষ্ঠতম সন্তান ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তথ্যসূত্র

Blood, A. K. (2002). *The Cruel Birth of Bangladesh: Memoirs of an American Diplomat*, Dhaka: The University Press Limited.

ড্রিং, সা. (১৯৯৬)। *স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীতে সাইমন ড্রিং-এর স্মৃতিচারণা*, দৈনিক সংবাদ (বিশেষ ক্রোড়পত্র), ২৬ মার্চ।

Frost, D. (1972). *David Frost's interview with Sheikh Mujibur Rahman in Dacca: Transcript of Interview telecast in The David Frost Show*, WNEW-TV, New York. January 18, 1972' in Singh S. K. et al (eds.) Bangla Desh Documents (Volume II). Madras: South Asia Books. p. 614-27.

হাননান, মো. (২০২১)। *বঙ্গবন্ধু-মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

পেইন, র. (১৯৭৩)। *ম্যাসাকার*, ইংরেজি থেকে গোলাম হিলালী কর্তৃক ভাষান্তরিত, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

টেইলর, আর. কে. (১৯৯৭)। *অবরোধ*, ইংরেজি থেকে মেসবাহউদ্দিন মুনতাসীর কর্তৃক ভাষান্তরিত। ঢাকা: অনন্যা প্রকাশন।

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা

সোনিয়া হক
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম

সেই যে ভাস্কো-দা-গামা সমুদ্রপথ আবিষ্কার করলেন, তারপর হতে ইউরোপ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে এল পর্তুগীজ, ডাচ, ফরাসি সর্বশেষে ইংরেজ। পলাশীর প্রান্তরে স্বাধীনতার সূর্য অস্ত গেল, পরবর্তী ২০০ বছর চলল শোষণ নীতির যাঁতাকল। ১৯৪৭-এ ভারত উপমহাদেশ ভেঙ্গে হল পাকিস্তান ও ভারত। তাতে কি! পাকিস্তানের দুই অংশ; পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান, ১২০০ মাইল দূরবর্তী দুই প্রদেশ, মধ্য ভারত এর বিশাল ভূখন্ড। সেই পশ্চিম পাকিস্তানও শুরু করল ইংরেজের শোষণনীতি। ২৩ বছরের (১৯৪৭-৭১) দাসত্বের কৃঙ্খল ভেঙ্গে নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান, বাংলাদেশ নামে আবির্ভূত হল। এই নয়া অস্তিত্বের যে কারিগর তাকে 'বাতিঘর' বললে কি অত্যুক্তি হবে? যে ব্যক্তি প্রাণ সংশয়ের চরম মুহুর্তে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন, "ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা", তিনি তো বাতিঘর; অজর, অবিনাশী এক সত্ত্বা।

২৫ মার্চ, ১৯৭১ সালে রাত ৯ টায় নরাধম ইয়াহিয়া খান রেডিওতে বলেছিল, "মুজিব ইজ এ ট্রেইটর টু দ্য নেশন। দিস টাইম হি উইল নট গো আনপানিশড।" হেনরি কিসিঞ্জার যথার্থই বলেছিলেন, "আওয়ামীলীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মত এমন তেজস্বী ও গতিশীল নেতা আগামী বিশ বছরে এশিয়া মহাদেশে আর পাওয়া যাবে না।" তাঁর ক্ষণজন্মা জীবনের (১৯২০-৭৫) ৪৬৮২ দিন কাটিয়েছেন জেলে, পরিবার পরিজনদের দিকে চোখ মেলে তাকানোর অবসর তাঁর হয়নি। বৃটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট ১৯৭২ সালের এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনার শক্তি কোথায়?" বঙ্গবন্ধু সে প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "আমি আমার জনগণকে ভালবাসি।" "আর আপনার দুর্বল দিকটা কী?" বঙ্গবন্ধুর উত্তর, "আমি আমার জনগণকে খুব বেশি ভালবাসি।" এটা ১৯৪৭-৭১ পরিক্রমা দেখলেই বুঝা যাবে।

রাজনীতির মহাকবি (পোয়েট অব পলিটিক্স) বঙ্গবন্ধু আমাদের প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন একটি শব্দ 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'। পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই প্রথম যে মাতাল হাওয়া উঠে তাতে শোনা যায় জিন্নাহ এর কণ্ঠে, "উর্দু এন্ড উর্দু শ্যাল বি দি অনলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্তান।" নৃতাত্ত্বিক ভাষাভিত্তিক পরিচয়ের ওপর এই আঘাতের মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়।

বঙ্গবন্ধু সব ধর্মের মানুষকে একটি তত্ত্ব অর্থাৎ বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে এক পতাকাতলে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে শাসিত ও শোষিত বাঙালিকে মুক্ত করার একমাত্র ও প্রধান হাতিয়ার হলো সব ধর্মের মানুষকে একটা জায়গায় নিয়ে আসা। তাঁর জীবন ও কর্মের ক্রমিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি বিশেষ সময় খন্ডের কথা জানতে পারি। এ কারণেই বোধ করি কবি মনীষী অন্নদাশঙ্কর রায় বাংলাদেশের আরেক নাম রেখেছেন ‘Mujibland’। সে কথাই যেন ব্যক্ত হয়েছে জসীম উদ্‌দীনের কবিতায়-

এই বাঙলায় শুনেছি আমরা সকল করিয়া ত্যাগ,
সন্ন্যাসী বেশে দেশ বন্ধুর শান্ত মধুর ডাক।
শুনেছি আমরা গান্ধীর বাণী– জীবন করিয়া দান,
মিলাতে পারেনি প্রেম-বন্ধনে হিন্দু-মুসলমান।
তারা যা পারেনি তুমি তা করেছ, ধর্মে ধর্মে-আর,
জাতিতে জাতিতে ভুলিয়াছে ভেদ সন্তান বাঙলার।

১৯৪৭ সালে সবাই যখন জিন্নাহ এর দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ নিয়ে ব্যস্ত, সে সময় মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দীর আদর্শে উদ্দীপিত তরুণ নেতা ২৭ বছর বয়সী শেখ মুজিব দুই বাংলার বাঙালিদের নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন।

১৯৪৮ সালে ছাত্রসমাজ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন ‘ছাত্রলীগ’। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন জন্ম নেয় আওয়ামী লীগ। ভাষা আন্দোলনের সময় জেলে থেকেও রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবিতে কাজ করেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেরুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের মিছিলে গুলি চালানোর ঘটনায় রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন ঢাকা থেকে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ভাষা আন্দোলন এবং যুক্তফ্রন্ট বিপুল সমর্থন পেয়ে ক্ষমতায় আসে। ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে এক বছর সফলতার সাথে জনগণের সাথে কাজ করেন।

১৯৬৬ সালের ৫ ফেরুয়ারি লাহোরে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে মুসলীগের সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ আফজালের সভাপতিত্বে বিরোধী দলের সম্মেলন শুরু হয়। সাবজেক্ট কমিটির এই সভায় বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবি পেশ করেন। প্রস্তাবিত ছয় দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। এ সময় ছয় দফা আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার নিমিত্ত পূর্ব বাংলা সফরে বঙ্গবন্ধু মোট ৮ বার গ্রেফতার হন। (শেখ হাসিনা, ২০২০)

১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে ১ নম্বর আসামি করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ততদিনে ছয় দফার প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন তৈরি হয়েছিল। ১৯৬৮ এর শেষ দিকে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে নতুন আন্দোলন শুরু করে। ছয় দফাকে অন্তর্ভুক্ত করে ছাত্রসমাজের এগার দফার দাবিতে ১৯৬৯ সালে গণ অভ্যুত্থান ঘটে। ফলে ১৯৬৯ এর ২২ ফেরুয়ারি জনগণের আন্দোলনের তোপের মুখে পড়ে আইয়ুব সরকার শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

গণঅভ্যুত্থানের জোয়ারে টিকতে না পেরে ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং সারাদেশে জারি হয় সামরিক শাসন। তবে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন এবং দেশে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা চালুর ব্যাপারে দাবি স্বীকৃত হয়। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে এডাল্ট ফ্রেঞ্চাইজির ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের একক প্রতিনিধি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য যে, জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল মাত্র আশিটি (৮০) ভোট পায়। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি শুরু করে। (মামুন, ২০১৩)

১৯৭১ সালের ১ মার্চ হঠাৎ এক হঠকারী সিদ্ধান্তে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টি এবং জনাব কাইয়ুম খানের দলের কারণে পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক প্রশাসক ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন। সামরিক আইন পরিচালক লে. জে. সাহেবজাদা এম ইয়াকুব খান ১ মার্চ গভীর রাতে ১১০ নং সামরিক আইন আদেশ জারি করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাকিস্তানের সংহতি বা সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী খবর, মতামত বা চিত্র প্রকাশের ব্যাপারে সংবাদপত্রসমূহের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। আইন ভঙ্গ করলে ২৫ নং সামরিক আইনবিধি মোতাবেক সর্বোচ্চ ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হবে। (২ মার্চ, ১৯৭১, দৈনিক ইত্তেফাক)

৩ মার্চ হতে ৬ মার্চ প্রতিদিন সকাল ৬টা হতে দুপুর ২ টা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে বাংলার আপামর জনতা নগর-বন্দর, দোকান-পাট, যানবাহন অচল করে রাস্তায় নেমে সংহতি জানায়। পূর্ব পাকিস্তান হতে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা ট্রান্সফার বন্ধ করে দিলে কার্যত পশ্চিম পাকিস্তান পুরো অচল হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর এক আওয়াজে জনগণ গ্রানাইট পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর থেকে কী করতে হবে তার নির্দেশনা আসতে থাকে প্রতিনিয়ত। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে ১-২% সরকারি কর্মচারী অংশগ্রহণ করলেও বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে ১০০% সরকারি কর্মচারি অংশগ্রহণ করে। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের হাইকোর্টের বিচারপতি এ.বি. সিদ্দীকীও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানের শপথ পাঠে অস্বীকৃতি জানান। এসব দেখে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ অধিবেশন আহ্বান

করলেও গোপনে অস্ত্র গোলাবারুদ পাঠিয়ে বাঙালি হত্যাযজ্ঞের নীল নকশা রচনা করেন। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির তিনজন গবেষক পাপালেক, স্টিফেন মারগ্লীন ও লী এস্পেটজ ৭ এপ্রিল ১৯৭১ তাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধে "Pakistani Background to a Crisis: A Ripon Society Position Paper" উল্লেখ করেন, "পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও তার দোসরদের সাথে উস্কানিমূলক আচরণ সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান চান।"

একাত্তরের ৭ মার্চ টান টান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) কৌশলে বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফার দাবিতে মুক্তি ও স্বাধীনতার অমর, অজর ও অবিনাশী ঘোষণা প্রদান করেন-

"প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা। জয় বাংলা।"

২৩ মার্চ ভোরে পাকিস্তান দিবসে বঙ্গবন্ধু নিজ হাতে তাঁর বাসভবনে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত লাল-সবুজের পতাকা উড়িয়ে দেন। ২৫ মার্চ, ১৯৭১ দিবাগত মধ্যরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বাঙালিদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানোর ও পূর্ব বাংলাকে নেতৃত্বকূন্য করতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনা হামলা শুরুর সাথে সাথেই স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা করেন। (পাইন, ১৯৭৩)

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১২:২০ ঘটিকায় তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন-

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh, wherever you may be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved. Joy Bangla."

হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো বঙ্গবন্ধু সমগ্র জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। রাজনীতিতে তিনি সৃষ্টিশীল চেতনা দেয়ার মাধ্যমে রাজনীতির কবি হয়েছেন। 'জয় বাংলা' আসলে একটি মন্ত্র। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' বা দাদা ভাই নওরোজীর 'স্বরাজ' বা গান্ধীজীর 'কুইট ইন্ডিয়া' বা নেতাজি সুভাষের 'দিল্লি চলো'। "একটি শব্দের বা শব্দের

সমষ্টির মধ্যে অসীম শক্তি নিহিত, সে শক্তি অসাধ্য সাধন পটিয়সী।" – অন্নদাশংকর রায়।

সেই ৭ মার্চের বজ্রকন্ঠের ভাষণে উদ্দীপিত হয়ে বাঙালি যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তান আর্মিতে থাকা বাঙালি সেনারা যুদ্ধে আনুগত্য প্রকাশ করেন। সমগ্র বাংলাকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। অবশেষে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, ত্রিশ লক্ষ শহীদ আর দুই লক্ষ মা-বোনদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজী ৯৩ হাজার পাকিস্তানী সৈন্যসহ বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আত্মসমর্পন করেন। বিশ্বের বুকে জন্ম নেয় লাল-সবুজের একটি দেশ।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি যোদ্ধারা কেবল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করেনি বরং তাদের প্রাণের নেতা, বাংলাদেশ নামকরণের দাবিদার, যাঁর নেতৃত্বে নয় মাস ব্যাপী বাঙালির সংগ্রামের শুরু, যাঁর নির্দেশে জীবনকে তুচ্ছ করে দেশ মাতৃকাকে মুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়া, তাকে পাকিস্তান কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্ত করে স্বাধীন দেশে আনার ব্যবস্থাও করেছিল। এই হলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ দুটো আলাদা নাম হলেও তারা সমার্থক, এক ও অভিন্ন। জনগণের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর অপার আস্থা-বিশ্বাস মানুষের প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসা, মমত্ববোধ, সহমর্মিতার বিরল দৃষ্টান্ত সম্পন্ন সমৃদ্ধ মানুষ।

তথ্যসূত্র

হাসিনা, শেখ (২০২০)। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনক আমার নেতা আমার*। প্রথম সংস্করণ। ঢাকা: চারুলিপি প্রকাশনী।

পাইন, র. (১৯৭৩)। *ম্যাসাকার*। ১ম সংস্করণ, নিউইয়র্ক: ম্যাকমিলান কোম্পানি

মামুন, ম. (২০১৩)। *বঙ্গবন্ধু কিভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন।* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর বাংলাদেশ

নাভিদ সারওয়ার
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হবিগঞ্জ

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' বাংলাদেশের জন্য কেবল একটি নাম নয়, এটি বাংলাদেশের মূল সত্ত্বার একটি রূপ। যেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে আমরা বাস করছি সেই দেশের রূপকার আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। লাল সবুজের বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অনন্য। তাঁর বৈচিত্র্যময় এবং সময় উপযোগী দিক নির্দেশনার সফলতায় বাংলাদেশ কেবল স্বাধীনতাই লাভ করেনি বরং স্বাধীনতা পরবর্তী দেশগঠনেও তাঁর নেতৃত্ব বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়। এজন্যই 'নিউজ উইক' পত্রিকা তাঁকে অভিহিত করেছে 'রাজনীতির কবি' হিসেবে। তাঁর ৬ দফা দাবী হোক, রেসকোর্স ময়দানের ভাষণ হোক, স্বাধীনতার ঘোষণাই হোক, লাখো বাঙালির মনে এখনো দাগ কাটে তার মুখ নিঃসৃত প্রতিটি কথা। তাইতো এখনো আমরা তাঁর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ছেলেবেলায় বঙ্গবন্ধু

১৯২০ সালের **১৭ই** মার্চ বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর পিতা লুৎফর রহমান এবং মাতা সায়েরা খাতুন। দুই ভাই চার বোনের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তৃতীয়। ছোট বেলা থেকেই তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সত্যের প্রতি অটল থাকার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বিষয়গুলো সবিস্তারে উঠে এসেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'- তে।

সেখানে জাতির পিতা অকপটে স্বীকার করেছেন ফুটবল খেলা নিয়ে তাঁর মারামারি করার কথা, তাঁর ছোটবেলার কথা, তাঁর কৈশোর, প্রথম স্কুল জীবন এবং বাল্যকালে রাজনীতির পথে আসার বিষয়ে তাঁর আকাঙ্ক্ষার কথা। তাইতো 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'কে সকলের জন্য একটি অবশ্য পাঠ বলে গণ্য করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের স্কুল জীবনের সূচনা হয় গোপালগঞ্জের গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। অন্যান্য শিশু কিশোরের মত তাঁর জীবনও ছিল বৈচিত্র্যে ভরপুর। দুরন্তপনা ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। স্কুলের বন্ধুবান্ধব আর পরিবারের মাঝেই বেড়ে উঠেছেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর বাবা শেখ লুৎফর রহমান ছোট বেলা থেকেই ছেলেকে নৈতিকতা ও আদর্শের শিক্ষা দেন। বলা চলে, সদাচার, মানবিকতা ও জনসাধারণকে ভালোবাসার যে গুণ জাতির পিতার মাঝে প্রতিফলিত হয় তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর বাবার মাধ্যমেই। এজন্যই তাঁর আত্মজীবনীতে বারবার ফিরে এসেছে তাঁর বাবার আদর্শের কথা।

ফিরে আসি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শের দিকে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিবেচনায় তিনি আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করতেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। তিনি তাঁকে ডাকতেন 'শহীদ সাহেব' বলে। শহীদ সাহেবের সাথে বঙ্গবন্ধুর প্রথম সাক্ষাতের ঘটনাটি এক্ষেত্রে না বললেই নয়। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন শেখ মুজিবুর রহমানের স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। স্কুলের সমস্যার কথা আসলে এগিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু। তিনি অকপটে 'শহীদ সাহেব' কে বলেন তাঁর স্কুলের ছাদের চাল নষ্ট থাকার বিষয়টি। শেখ মুজিবের কণ্ঠের দৃঢ়তা সেদিন অবাক করেছিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। 'শহীদ সাহেব' হয়তো সেদিনও অনুধাবন করতে পারেন নি এই ছোট 'খোকা' ভবিষ্যতে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি পাবে; মুক্ত করবে কোটি বাঙালিকে পরাধীনতার কৃঙ্খল থেকে।

স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে শেখ মুজিব ভর্তি হন কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজে। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হন। এ কারণে তার পড়ালেখায় বাঁধা পড়ে। চার বছর পরে তিনি আবার পড়ালেখা শুরু করেন। এ কারণে সহপাঠীদের চেয়ে বয়সের ব্যবধানের ফলে তাঁর মধ্যে অধিকার সচেতনতা বা দাবীর ন্যায্যতার বিষয়টিও আগে পরিলক্ষিত হয়। কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় তার মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলী ফুটে ওঠে। এরপর তিনি ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে। কিন্তু সেখানে তাঁর অধ্যয়ন সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার হন। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা তাদের বেতন বৃদ্ধিসহ বেশ কিছু বিষয়ে সুযোগের প্রাপ্যতার জন্য আন্দোলন করছিল। এই আন্দোলনের ফলে বেশ কয়জন কর্মচারীকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার করে। বহিষ্কারকৃত কর্মচারীদের পক্ষে আন্দোলনে নামেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এজন্য তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। এর মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করে নেয়।

রাজনৈতিক জীবনে পদার্পণ

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে সেই সাক্ষাতের পর ঘটনার পরিক্রমায় শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক গুরুর আসন দখল করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তিনি বঙ্গবন্ধুকে পত্রযোগে কোলকাতা ভ্রমণ এবং 'শহীদ সাহেব' এর সাথে সাক্ষাতের নিমন্ত্রণ জানান। পরবর্তীতে তিনি কোলকাতা ভ্রমণ করেন এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে কথা দেন যে, গোপালগঞ্জে মুসলিম ছাত্রলীগ এবং মুসলিম লীগ দুই দলই গঠন করা হবে। এরপর গোপালগঞ্জে ফিরে তিনি তাঁর বক্তব্য বাস্তবায়নের জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। এর মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক জীবনে তার পদার্পন ঘটে। একটি 'জাতির পিতা' হওয়ার সূত্রপাত হয়েছিল সেই সাক্ষাতের মাধ্যমেই। তবে জাতির পিতার জীবনী বিশ্লেষণে জানা যায় যে, দুইজন বৃটিশ উপনিবেশবাদ বিরোধী স্বাধীনতা কর্মীর কাছে তিনি প্রাইভেট পড়তেন। তারাও তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ছাত্র জীবনেই রাজনীতি ও সংস্কৃতির যেই মেলবন্ধন ঘটান তা আজীবন রক্ষা করেছিলেন। এজন্য তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল সর্বত্র। স্বাধীনতা উত্তর বিভিন্ন সমাবেশে তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে রাজনীতির পাশাপাশি অধ্যয়ন ও আত্মউন্নতির বিষয়গুলো।

ছাত্রলীগ ও বঙ্গবন্ধু

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সব সময়ই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। বৃটিশরা ভারত ত্যাগের পরপরই তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের উত্তম সময় ছিল। কিন্তু কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ এর সাম্প্রদায়িক যোগ সাজশে ১৯৪৭ সালে যুবক শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে যায়। সেই মহান স্বপ্ন শেখ মুজিবুর রহমান পূরণ করেছিলেন ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে।

স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘ রাজনৈতিক আন্দোলনে তরুণ বাঙালি সমাজের কোন বিকল্প ছিল না। এজন্য ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয় ছাত্রলীগ নামের এক অপরাজেয় ছাত্র সংগঠন। এই ছাত্র সংগঠন পরবর্তীতে বিশাল এক কর্মী বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। দেশের বিভিন্ন ক্রান্তিকালে সবার আগে এগিয়ে আসে ছাত্রলীগ। ১৯৭১ এর পূর্ববর্তী সকল সংগ্রামে এক তৎপর সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় প্রতিষ্ঠানটি। এর বিপুল গ্রহণযোগ্যতার পিছনে অনবদ্য অবদান ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের।

রাজনৈতিক অঙ্গন যখন পাকিস্তান

একথা বললে ভুল হবে না যে, ১৯৪৭-৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান তথা তৎকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থান এক রকম ভঙ্গুর ছিল। ১৯৫৬ সালে নির্বাচনে জিতেও মুখ থুবড়ে পড়ে প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। রাজনৈতিক মেরুকরণের ফাঁদে পড়েন অনেক রাজনৈতিক কর্মী ও নেতারা। মতপার্থক্য সৃষ্টি ও দল বদলের বিষয়টি অনেকটাই নিয়মে পরিণত হয়। এমনকি এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে নীতিগত মতবিরোধ তৈরি হয় তাঁরই রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর।

১৯৪৯ সালের ২৩ শে জুন জন্ম নেয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। পরবর্তীতে সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রশ্নের উদ্ভব হলে দলের মূল নাম থেকে 'মুসলিম' কথাটি বাদ দেয়া হয়। দল গঠনের পরপরই শেখ মুজিবুর রহমানকে দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। এরপর যত সময় গেছে, তিঁনি হয়ে উঠেছেন আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কান্ডারী। এমনকি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কঠিনতম সময়েও জেলে বন্দী থাকাকালে তিনি ছিলেন সকলের প্রাণ পুরুষ। ১৯৫৬ সালের কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন শেখ মুজিব। কিন্তু বাঙালি জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এবং আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করেন তিনি।

৬ দফা

১৯৬৬ সালের ৫ ফেরুয়ারী লাহোরে বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু উপস্থাপন করেন ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি। এই ৬-দফাকে বলা হয় বাঙালীর মুক্তির সনদ। সম্মেলনে উপস্থিত দলগুলো দৃঢ় চিত্তে গ্রহণ করে ৬ দফাকে। পরবর্তীতে দেশে ফিরে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতেও উক্ত ৬ দফা উপস্থাপন করেন। বাঙালি জাতির জন্য জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় দাবিটি। বলা হয়ে থাকে যে, পাকিস্তান সরকার যদি সেদিন ৬ দফাকে গ্রহণ করতো তাহলে হয়তো পাকিস্তান ভাগ হতো না। কারণ ৬-দফার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন বাঙালির বিরুদ্ধে চলমান সকল গঞ্জনাকে, সকল অন্যায্যতাকে। তাইতো ৬ দফা প্রচারিত হওয়ার পর সমগ্র বাঙালি জাতি একই পতাকাতলে সমবেত হয়।

১৯৬৯: জাগো বাঙালি জাগো

প্রকৃতপক্ষে ৬ দফা দাবি প্রচারিত হওয়া শুরু করলে এর জনপ্রিয়তা দেখে দমে যায় পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনী। তারা বুঝতে পারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির ন্যায্য দাবি আদায়ে বদ্ধপরিকর। তাই তারা রাজনৈতিক কূটচালের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে দমিয়ে রাখার নীল নকশা করতে থাকে। এরই অংশ হিসেবে তারা শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরো ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মিথ্যা মামলা দায়ের করে তাদের বন্দী করে রাখে। গোপনে প্রহসনমূলক এক বিচারের মাধ্যমে বন্দীদের সাজা দেয়া ছিল এ মামলার মূল লক্ষ্য। কিন্তু এ মামলা দায়ের করার পর পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। আইয়ুব খানের লেলিয়ে দেয়া পেটুয়া বাহিনী এই বিক্ষোভ দমনে ব্যর্থ হয়। আইয়ুব সরকার বুঝতে পারে, কেবল পেশীশক্তির মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে দমিয়ে রাখা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এই আন্দোলনকে আরো বেগবান করে ১৯৬৯ এর ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান এর মৃত্যু এবং ১৫ ফেরুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হকের ক্যান্টনমেন্টে মৃত্যু। উক্ত ঘটনাগুলো বাঙালি জাতির মধ্যে তাদের অধিকার আদায়ের মনোবল আরো দৃঢ় হতে সাহায্য করে।

দেশের এরূপ বিকৃঙ্খল রাজনৈতিক অবস্থায় দেশবাসীর দরকার ছিল একটি যোগ্য নেতৃত্বের। তাদের দরকার ছিল একজন মানুষ যার দিক নির্দেশনায় জাতি তাদের অধিকার ফিরে পাবে। এজন্য তারা বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত সকল আসামীর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করে এবং অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করে। ফলে এক পর্যায়ে আইয়ুব সরকার ১৯৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। এর কিছুদিন পরেই আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন এবং ক্ষমতায় আরোহন করেন বর্বর ইয়াহিয়া খান। এ প্রসঙ্গে Rawnak Jahan বলেন, "Aiyub's Resignation was looked upon as the first step towards the achievement of Bengali Objectives."

’৭০ এর নির্বাচন ও ’৭১

১৯৭০ সালের নির্বাচন পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য এক গ্লানিকর অধ্যায় বললেও হয়তো ভুল হবে না। তারা কখনো কল্পনা করেনি যে, নির্বাচনে তাদের পরাজয় হবে। তাই নির্বাচনে পরাজয় বরণ করবার পরও তারা ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। উক্ত নির্বাচনে মোট ২৪টি দল অংশগ্রহণ করে। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে আওয়ামী লীগ ১৬২টি আসনে এবং প্রাদেশিক নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে জয়লাভ করে। বিপুল ব্যবধানে এই জয়লাভের পিছনে মূল প্রেরণা জুগিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৬ দফা ও ’৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানের পর শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির একমাত্র রাষ্ট্র নায়কে পরিণত হন। তার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ছিল আকাশচুম্বী। তারা বুঝতে পারে যে, জাতির পিতার ছায়াতলেই মিলবে বহুল কাঙ্খিত স্বাধীনতা।

কিন্তু কাল হয়ে দাঁড়ায় পশ্চিম পাকিস্তানী কুচক্রী মহল। তারা ক্ষমতা হস্তান্তরের বিভিন্ন অজুহাত দেখাতে শুরু করে। অ্যাসেম্বলির তারিখ বদলাতে থাকে প্রতিনিয়ত। প্রকৃতপক্ষে এ সময় পাকিস্তান সরকার সময় ক্ষেপন করছিল তাদের সামরিক শক্তিকে সুসংহত করার লক্ষ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তারা এ সময় অস্ত্র ও সামরিক সদস্যদের বাংলাদেশে আনতে থাকে। এরই মাঝে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ দেন।

৭ মার্চের ভাষণে প্রকৃতপক্ষে বাঙালি জাতিকে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়। ৭ মার্চের ভাষণ পৃথিবীর ১০০টি শ্রেষ্ঠ ভাষণের তালিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। কিন্তু বাঙালি জাতিকে যুদ্ধের জন্য সামগ্রিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি পরবর্তীতে বলেন, তিনি চাননি তার ঘোষণার কারণে পাকিস্তানী বাহিনী কোন অজুহাত পেয়ে নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুক। তিনি শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষেই ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস এত কিছুর পরও পাকিস্তানী বাহিনী শান্তির পথে পা বাড়ায়নি। তারা বেছে নেয় ইতিহাসের নৃশংসতম পথ।

২৫ শে মার্চ বাঙালির ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়। এ দিন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালীর উপর আক্রমন চালায় মানব হত্যার মাদকতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে এককালে নিয়মতান্ত্রিক সুনাম সম্পন্ন এই বাহিনীটি। পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন জায়গা রক্তে রঞ্জিত হতে থাকে। আঘাত আসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতেও। তাঁকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়াই ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লক্ষ্য। কিন্তু চতুর শেখ মুজিব ঘটনার সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরে আগেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ প্রথম প্রহরে ভেসে আসে শেখ মুজিবের কণ্ঠ।

"This may be my last message from today
Bangladesh is independent........"

তাঁর এই ঘোষণার মাধ্যমেই লাখো বাঙালী রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং নয় মাসের স্বাধীনতার যুদ্ধের পর ছিনিয়ে আনে লাল সবুজের বাংলাদেশ।

শেখ মুজিব কোন নাম নয়। শেখ মুজিব একটি চেতনা। এই চেতনাকে বুকে ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। অর্জন করতে হবে জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা'। একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা চলে যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাষ্ট্র নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই জাতির কল্যাণের জন্য কাজ করে গেছেন। তাঁর কতটুকু প্রতিদান আমরা দিতে পেরেছি? একইভাবে এই প্রশ্নও নিতান্তই অবান্তর হবে না যে, যেই শেখ মুজিব ছাড়া বাঙালীর স্বাধীনতা অসম্ভব ছিল তার আদর্শকেই বা আমরা কতটুকু ধারণ করতে পেরেছি? তাইতো কিউবার রাষ্ট্রপ্রধান ফ্রিদেল কাস্ত্রো বলেছেন, "আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি, ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় যিনি হিমালয়ের মত।"

শেখ মুজিবঃ শত সংগ্রামের প্রবাদ পুরুষ

কামরুন্নাহার তামান্না
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর

বাংলাদেশের ইতিহাস চার সহস্রাব্দেরও বেশি সময়ের ইতিহাস। দেশটির প্রারম্ভিক ইতিহাস হচ্ছে, আঞ্চলিক আধিপত্যের এবং সাম্রাজ্যসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার ইতিহাস। পাল রাজবংশ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এই পূর্ববঙ্গ নির্যাতন ও নিপীড়নের সাক্ষী হয়েছে। ১৯৪৭ এ পূর্ববঙ্গ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়ে যা আরো তীব্র রূপ ধারণ করেছিল। বাংলায় দীর্ঘ দিন ধরে চলমান এই নিপীড়নের সমাপ্তি তথা বাংলার বহুল প্রতীক্ষিত মুক্তি এসেছিল একজন মহাপুরুষের হাত ধরে। যার নাম শেখ মুজিবুর রহমান। যার বেড়ে ওঠার প্রতিটি দিন লিপির সাথে লেখা আছে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। বলা যায়, বাংলাদেশের ইতিহাস মানেই শেখ মুজিবের জীবনের ধারাপাত। গীতিকার লক্ষীকান্ত রায় যেমন বলেছেন-

স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশের পরিত্রাতা কে?
সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর আজ ভাগ্য বিধাতা কে?
একটি সুরেতে কে দিয়েছে বেঁধে বাঙালীর অন্তর?
সেতো শেখ মুজিবুর! ধন্য হে মুজিবুর।

এভাবে নেতা আর জনতার আশ্চর্যযোগে, আন্দোলনের পর আন্দোলন পেরিয়ে মুক্তিযুদ্ধের হাত ধরে ঘটল বাংলাদেশের অভ্যুদয়। এরই ধারাবাহিকতায় ইতিহাস এখন প্রত্যক্ষ করছে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ আর মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তীর সন্ধিক্ষণ।

বাংলার রাজনীতিতে শেখ মুজিব

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান নেতা, 'রাজনীতির কবি' শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সহজাত নেতৃত্বগুণের অধিকারী। এই মহান নেতা ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব থেকেই তিনি রাজনৈতিক চিন্তা ধারাকে লালন করতেন। তিনি ছিলেন দূরদর্শী। যেন নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর স্মৃতিচারণ মূলক গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' তে আমরা তার রাজনৈতিক মতাদর্শ, বাংলাদেশ গড়ার জন্য তার সংগ্রাম এবং জাতি গঠনের স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ করেছি।

১৯৪৮ সাল, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা, এক বিস্ময়কর তরুণ ও প্রগতিশীল উচ্চাকাঙ্খী রাজনীতিবিদ হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান খুব দ্রুততার সঙ্গে প্রতিটি পদে উন্নতি করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা ভাসানী 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' গঠন করলে শেখ মুজিব মুসলিম লীগ ছেড়ে দিয়ে এই নতুন দলে যোগ দেন। তাঁকে দলের পূর্ব পাকিস্তান অংশের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা

হয়। ১৯৫৩ সালের ৯ জুলাই তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের শেষ দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন (১৯৫৩-৬৬)। অতঃপর তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত।

বাঙালি জাতির উন্নতির জন্য তিনি তাঁর জীবদ্দশায় প্রায় ৪৬৮২ দিন জেল খেটেছিলেন। শেখ মুজিবের জীবন ছিল জনগনের জন্য উৎসর্গকৃত। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর বাঙালীদের উপর দীর্ঘ ২৩ বছরের শোষণের চিত্র তাঁকে স্বাধীনতার জন্য তৃষ্ণার্ত করে তুলেছিল। পাকিস্তানের জন্ম থেকে প্রতিটি আন্দোলনে তিনি অবদান রেখেছিলেন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬ দফা দাবি, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তিনি ছিলেন স্থপতি। এমনকি 'বাংলাদেশ' নামটিও দিয়েছিলেন বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করা সেই মানুষটি। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, "জনগণের পক্ষ হইতে ঘোষণা করিতেছি যে, এই প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তানের নাম হইবে বাংলাদেশ।" তরুণরা এরপর থেকে আর 'পূর্ব পাকিস্তান' বলেনি, 'বাংলাদেশ' বলেছে। '৬৯ এ রাজপথে তরুণরা স্লোগান দিয়েছিল, 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।' এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক নেতৃত্বে জন্ম নেয় 'বাংলাদেশ' নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের।

বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন

পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাভিত্তিক পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলন একই সাথে সুষম অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ এর দশকে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ছয় দফার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের দাবির মাধ্যমে গোটা জাতিকে এক করেছিলেন। এটি ছিল বেঁচে থাকার সনদ এবং অত্যাচারীর লৌহমুষ্টি ভাঙার জন্য পূর্ব অংশের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠাই ছিল এর লক্ষ্য। পশ্চিম পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক, কৃষির মূল ভিতকে এটি কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বেই সেদিন এ দেশের সকল শ্রেণির মানুষ এক হয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল। এই সব কিছুই যেন তিনি টের পেয়েছিলেন বহু আগে। নানাবিধ ঘটনা আছে যার মধ্য দিয়ে তাঁর স্বপ্নচারিতার প্রমাণ মেলে। যেমন ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের ঘটনা। বঙ্গবন্ধু তখন ইসলামিয়া কলেজের বেকার হোস্টেলে ২৪ নং কক্ষে থাকতেন। সেখানে একদিন তিনি বিছানায় বসে চার সঙ্গীর সাথে পাকিস্তান নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। আলোচনায় তার প্রথম উক্তি ছিল, "এ পাকিস্তান, যে পাকিস্তানের জন্য তিনিও লড়াই করেছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর শিষ্য হিসেবে, সে পাকিস্তান এ পাকিস্তান নয়। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি হিসেবে পাকিস্তানের উদ্ভব। কাজেই এ পাকিস্তান বাঙালির স্বার্থ রক্ষা করবে না।" তার স্পষ্ট কথা তিনি তখনই বলে দিলেন। তখনই তিনি স্থির করলেন, ঢাকায় গিয়ে নতুন করে বাঙালির জন্য আন্দোলন করতে হবে। এবং তিনি মেঠো বাংলায় আরো একটি কথা বললেন, "এ মালাউনদের সঙ্গে বেশিদিন থাকা যাবে

না, অবাঙালি ওই পাকিস্তানের সঙ্গে বাঙালিরা বেশিদিন থাকতে পারবে না” তারা থাকেনি। বাঙালি থেকেছিল ২৪ বছর ৪ মাস ৩ দিন।

অন্য একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়, তখন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক ছিলেন তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। তার মধ্যস্থতায় বাম ঘরানার দু'জন নেতা কমরেড মনি সিং এবং কমরেড খোকা রায়ের সঙ্গে একটি গোপন বৈঠক করলেন। বৈঠকে শেখ মুজিবের বক্তব্য ছিল একটাই। বাঙালির সব সমস্যার সমাধান হবে স্বাধীনতা অর্জিত হলে। কমরেড দুইজন বললেন, “আপনার কথা মানলাম, কিন্তু এখন আইয়ুব খানের দেশ। স্বাধীনতার কথা প্রকাশ্যে বললে আপনার বিপদ হবে।” সভা শেষ হল শেখ মুজিবের একটি কথায়, “দাদা আপনাদের কথা মানছি, কিন্তু আমার কথাটাই রইল।” বাঙালির স্বাধীনতা প্রয়োজন। এটা ছিল তাঁর স্বাধীনতার স্বপ্ন।

এভাবেই তিনি তাঁর দূরদর্শী চিন্তার দ্বারা বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন। সে জন্যই ১৯৭২ সালে অন্নদাশঙ্কর রায়ের “আপনি কবে থেকে স্বাধীনতা কথা ভেবেছিলেন?” প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু নিদ্বির্ধায় বলেছিলেন “১৯৪৭ থেকে।” ইতিহাসও তাই বলে।

সম্মোহনী নেতৃত্ব

স্বাধীনতার মন্ত্রে জনতার উজ্জীবন বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার সম্মোহনী নেতৃত্ব গুন। ৫২ এর ভাষা আন্দোলন, '৬৬ এর ছয় দফা, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান এবং সর্বোপরি '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ -প্রতিটি আন্দোলনে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছিল কেবল তার এই সম্মোহনী ক্ষমতার জন্য।

১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন সূচিত হওয়ার পর ছাত্রলীগের অগ্রগণ্য নেতা, সিরাজুল আলম খান মন্তব্য করেছিলেন যে, “শেখ মুজিবের নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীন করতে হবে। কারণ, লোকে তাঁর কথা শোনে।” বাঙালির অনেক নেতা আছেন, ছিলেন, কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মত করে কেউ মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে পারেননি। তিনি তাঁর বক্তৃতা দক্ষতা দিয়ে মানুষের মনে জায়গা করে নেন, নিয়েছিলেন।

একটি কবিতা লেখা হবে তাঁর জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে: ‘কখন আসবে কবি?’

– কবি নির্মলেন্দু গুণ

সত্যিই বঙ্গবন্ধুর একটি নির্দেশের অপেক্ষায় থাকা জনগণের আকুলতা এমনই ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন যে একটি ভাষণের মাধ্যমে, তা হল তার ৭ মার্চের ভাষণ। একটি মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন, যা তিনি ১৯৪৭ সাল থেকে দেখে আসছেন, তা সমন্বিত আকারে উঠে এসেছিল ৭ মার্চের ভাষণে। আমেরিকান লেখক এবং গবেষক Andrew Newberg এবং Robert Waldman এর মতে, “সেদিন তাঁর কথা যারা শুনেছিলেন, তাদের মনোজগতে পরিবর্তন আসে; বিভ্রান্ত বাঙালি সেদিন পেয়েছিল পথের দিশা।” তাঁর

বজ্রকণ্ঠে সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল, "এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

কেবল দেশের মানুষের কাছেই তিনি সম্মোহনী নেতা ছিলেন না, বিদেশী নেতারাও তাঁর সম্মোহন ক্ষমতার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিল। ১৯৭১ সালে ঢাকায় কর্মরত আমেরিকার কন্সাল জেনারেল Archer K. Blood তাঁর লেখা বই, The Cruel Birth of Bangladesh: Memories of an American Diploma-তে উল্লেখ করেছেন, "Mujib's very appearance suggested raw power, a power drawn from the masses and from his strong personality. He was taller and stronger than most Bangalees, with ruggedly handsome features and intense eyes. A no-nonsense moustache gave added strength to his face."

বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনের অগ্নিপরীক্ষা চলেছিল পুরো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধজুড়ে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর নামেই চলেছিল মুক্তিযুদ্ধ। স্বল্পতম সময়ে আমরা অর্জন করেছিলাম শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু

১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের পতনের পর জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতায় এসে ১৯৭০ সালে নির্বাচন দিতে রাজী হলেন। ১৯৭০ এর নির্বাচনী প্রচারণাকালে বঙ্গবন্ধু নজিরবিহীন জনসংযোগের মাধ্যমে গোটা জাতিকে স্বাধিকার চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন। এ সময় তিনি পূর্ববঙ্গকে 'বাংলাদেশ' হিসেবে উল্লেখ করতে লাগলেন, জাতীয়তাবাদী প্রতীক ও স্লোগান ব্যবহৃত হতে লাগল। ফলে প্রাদেশিক পরিষদ ও জাতীয় পরিষদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আওয়ামী লীগ এবং বঙ্গবন্ধু হলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা।

১৯৭১ এর মার্চ মাসজুড়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির যে একতা দেখা গিয়েছিল তা নজিরবিহীন। মার্চের শুরুতে বঙ্গবন্ধু যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তাতে সকল মানুষ তথা সরকারি কর্মচারিরাও তাঁর ডাকে সাড়া দেয়। তখন থেকেই বঙ্গবন্ধু কার্যত সরকার প্রধান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। বাঙালিরা নিজেদের স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে অনুভব করতে শুরু করে। এই অনুভূতিই তাদের অস্ত্র হাতে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

লাখ লাখ বাঙালি তাঁর আদেশেরই অপেক্ষায় ছিল এবং একমাত্র তাঁর নির্দেশই তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। স্বাধীনতার ঘোষণাও তাই বঙ্গবন্ধুর নামেই ঘোষিত হয়েছিল। ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধও হয়েছিল তাঁর নামে। দেশে-বিদেশে সবাই এক নেতাকেই চিনতেন– 'তিনি বঙ্গবন্ধু।' বঙ্গবন্ধুর নির্বাচনী বিষয় ও অপার জনসমর্থনই তাঁর নেতৃত্বে আমাদের সংগ্রামকে বৈধতা দিয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধ শেষে পাকিস্তান কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু। দেশে ফিরে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখার পাশাপাশি দেশের মানুষকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করেন

তিনি। দেশ গড়ার এই সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস ছিল, দেশের মানুষ কখনো তাঁর ত্যাগ ও অবদানকে ভুলে যাবে না। অকৃতজ্ঞ হবে না।

স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নীতিমালাকে ঢেলে সাজান। সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রামে আহ্বান জানান ও অভূতপূর্ব সাড়া পান। খুব দ্রুত অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। দ্রব্যমূল্য সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে চলে আসতে শুরু করে, উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, নতুন আশার উদ্দীপনা নিয়ে স্বাধীনতার সুফল মানুষের ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্য অগ্রসর হতে শুরু করেন। কিন্তু মানুষের সুখ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৫ আগস্টের ভোরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাবিলাসী বিশ্বাসঘাতক অফিসারদের হাতে সপরিবারে নিহত হন। কবি রফিক আজাদ আক্ষেপ করে বলেছেন-

এই সিঁড়ি নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে,
সিঁড়ি ভেঙ্গে রক্ত নেমে গেছে
বত্রিশ নম্বর থেকে
সবুজ শস্যের মাঠ বেয়ে
অমল রক্তের ধারা বয়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলেও তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি চিরঞ্জীব। কেননা এই জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্থপতি তিনিই। যতদিন এ রাষ্ট্র থাকবে ততদিন তিনি অমর থাকবেন। সমগ্র জাতিকে তিনি জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় প্রস্তুত করেছিলেন। তাই তিনি এ জাতির চেতনায় চিরঞ্জীব। বঙ্গবন্ধু কেবল এক ব্যক্তি নন। এক মহান আদর্শের নাম।

তথ্যসূত্র

রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২)। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১৭)। *কারাগারের রোজনামচা*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

Mascarenhas. A. (1986). *Bangladesh: A legacy of Blood*, London, The Hodder and stoughton.

Newberg, A. B and Waldman, M. R. (2013). *Words can change your Brain: 12 conversaltion strategies to build trust, relsolve conflict and increase intimacy*, New York, A Plume Book.

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

মোঃ বদরুদ্দোজা
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফেনী

বাঙলা, বাঙালি ও বঙ্গবন্ধু একই সূত্রে গাঁথা। একই অবিনাশী সত্তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। জন্মদাত্রীকে 'মা' বলে ডেকে যে ভাষার জন্ম, সে ভাষাকে ধারণ করে যে জাতির বিকাশ, আর সে জাতির নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন, তারই সফল রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু মানে স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু না হলে আমরা স্বাধীন হতাম না, বাংলাদেশ হত না। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ যেন একই বৃন্তে ফোটা দু'টি ফুল। বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশের স্বাধীনতার অনন্য স্থপতি। দীর্ঘ সাধনায় বাঙালির মানস লোকে তিনি সঞ্চার করেছিলেন স্বাধীনতার বাসনা। উপনিবেশ কৃঙ্খলিত একটি ঘুমন্ত জাতিকে তিনি জাগ্রত করেছেন, তাদের করেছেন স্বপ্নমুখী, রক্তমুখী, মুক্তিমুখী। তিনি তাঁর ক্যারিসম্যাটিক নেতৃত্বগুণে পুরো বাংলাদেশকে জাগিয়ে তুলেছেন, তাদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করেছেন। তাঁর যাদু স্পর্শে পুরো দেশ জেগে উঠে স্বাধীনতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এজন্য তিনি বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি আজ এক সুতোয় গাঁথা, একটি অপরটির পরিপূরক, পরস্পর একাত্ম। তাইতো কবি বলেছেন–

এই ইতিহাস ভুলে যাব আজ, আমি কি তেমন সন্তান
যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান।

– সৈয়দ শামসুল হক (আমার পরিচয়)

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান **১৯২০** সালের **১৭** মার্চ ফরিদপুর জেলার বাইগার নদীর কূল ঘেষে অবস্থিত টুঙ্গীপাড়া গ্রামের সেরেস্তাদারদ শেখ লুৎফর রহমান ও সায়রা খাতুনের ঘর আলোকিত করেন। দুই ভাই ও চার বোনের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান।

পারিবারিক আনন্দঘন পরিবেশে বঙ্গবন্ধুর শৈশব-কৈশোরের দিনগুলো কাটে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। তিনি ছিলেন খুবই দুরন্ত, চটপটে ও দয়ালু। তিনি খোকা নামে পরিচিত ছিলেন। ছিলেন ছিপছিফে কিন্তু অদম্য প্রাণশক্তিতে ভরপুর। সাঁতার, খেলাধূলায়, খেলাধুলায় ছিলেন বেশ পটু। তাঁরুঅসমাপ্ত আত্মজীবনী" গ্রন্থে তিনি লিখেছেন– "ছোট বেলা থেকে ফুটবল খেলাটা আমার ভাল লাগত। আমার মনে আছে পরীক্ষার আগে আব্বাদের দলের সাথে খেলা ছিল, আমরা হেরে গিয়েছিলাম।" ছোট বেলা থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে দারিদ্র্য-বঞ্চিতদের জন্য ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিলো। এজন্য তিনি নিজের নতুন ছাতা বন্ধুকে দিয়ে দিতে পেরেছেন, বাড়ির গোলার ধান গরীব কৃষকদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ীর গোলার ধান কেন দিয়েছে লুৎফর রহমানের

এ প্রশ্নে তিনি বলেছিলেন– "এবারের চাষিদের জমির ধান সব বন্যায় নষ্ট হয়ে গেছে। আকালে পড়েছে কৃষক। আমাদের মত ওদের পেটেও ক্ষুধা আছে। ওরাও আমাদের মত বাঁচতে চায়।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ২০১২)।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি হয় গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। গিমাডাঙ্গায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি ভর্তি হন গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুলে এবং এখান থেকে ১৯৪১ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে তিনি ১৯৪৪ সালে আইএ এবং ১৯৪৬ সালে বিএ পাশ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন কিন্তু শেষ করতে পারেননি।

ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে বীর বাঙালি বহুবার বিদ্রোহ করেছে, রক্ত দিয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি। ১৯৫৭ সালে পলাশীর আম্র কাননে স্বাধীনতার যে সূর্য ডুবে গিয়েছিল, সেই আরাধ্য স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে অনেক নেতা চেষ্টা করেছে। কিন্তু কেউ পারেনি স্বাধীনতার সূর্যটাকে এনে দিতে। সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাংলার মাটি, জল, বাংলার প্রাণ ও প্রকৃতির হাজার বছরের একাগ্র প্রার্থনায় এ ভুখণ্ডে জন্ম নেন বাংলার 'মুক্তিদূত' শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলার মুক্তিকামী মানুষের অপরাজেয় চেতনাকে ধারণ করে তিনি হয়ে ওঠেন আমাদের মুক্তি সংগ্রামের অরাধ্য মহানায়ক। তিনি হয়ে ওঠেন বাংলার ইতিহাস। এজন্য কবি বলেছেন–

বাংলাদেশকে জানতে হলে
জানতে হবে শেখ মুজিবকে
জানতে হবে শুরু থেকে শেষকে

– (জানতে হলে তাকে, ২০১২)

কৈশোর কাল থেকেই তিনি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে ছিলেন সোচ্চার। অন্যায় দেখলেই তিনি করতেন প্রতিবাদ। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধুর বাঙালি আত্মপরিচয়। স্বকীয়তা এবং তা নিয়ে গর্ববোধের পরিচয় পাই। তিনি ছাত্র থাকা সময় থেকেই পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য আন্দোলন করেছিলেন। তিনি তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন– "পাকিস্তান হবে দু'টো, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। একটা বাংলা ও আসাম নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র আর একটা পশ্চিম পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে।"

কিন্তু পাকিস্তানের জন্ম হয় ধর্মীয় ভিত্তেতে– দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে। তিনি পাকিস্তানি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এই ভোবে যে, এই নতুন রাষ্ট্রে দারিদ্র্য মানুষ নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবে, দেশে গণতন্ত্র আসবে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারেন পাকিস্তান পূর্ব বাংলাকে শোষণ করবে, কোন অধিকার দিবে না। তখন তিনি ঢাকায় ফিরে প্রগতিশীল সংগঠন ও বাঙালির বিভিন্ন অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। বঙ্গবন্ধুর নেতা হবার পট শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের দাবিতে তিনি কারাবরণ করেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন–

"যে কোনো জাতি তার মাতৃভাষাকে ভালবাসে। মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতিই কোন কালে সহ্য করে নাই।"

(অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ২০১২)

বঙ্গবন্ধু ১৯৪৭ সালে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বকীয় আন্দোলনের শুরু করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ২১ দফা দাবি তুলে ধরেন। ১৯৪৯ সালে তিনি বাঙালিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে তিনি আত্মজীবনীতে বলেছেন– "আর মুসলিম লীগের পেছনে ঘুরে লাভ নেই, এ প্রতিষ্ঠান এখন কোটারী সংগঠনে পরিণত হয়েছে, গণবিচ্ছিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে... বিরোধী দল সৃষ্টি করতে না পারলে এ দেশে একনায়কত্ব চলবে।" ১৯৪৯ সালে তিনি কারাগারে যান কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ১৯৪৯-৫৪ সালে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন জেলায় আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করার কাজে লিপ্ত হন। ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্টের সদস্য নির্বাচিত হন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়টা তুলে ধরেন ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার মাধ্যম। তবে সে সময় যে তিনি যে শুধু ভাষার অধিকার নিয়েই সংগ্রাম করেছেন তা নয়, গরীব এবং নির্যাতিত মানুষের পাশে থেকে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিবাদী আন্দোলনে যোগ দেন। দেশের ভাষা ও স্থাপত্য বোধের তাড়নায় তিনি সংগ্রাম করেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকরা এদেশের নাম, ভাষা এমনকি মানচিত্রও বদলাতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বগুণে তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি এদেশের মানুষের অধিকার, ভাষা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বদা কাজ করে গেছেন। ১৯৫৫ সালের মে মাসের পাকিস্তানি গণপরিষদে বলেন– "ওরা পূর্ব বাংলা নামের পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তান নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার বলেছি আপনারা এটাকে বাংলাদেশ বলে ডাকেন। বাংলা শব্দটার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, ঐতিহ্য আছে।"– (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ২০১২)

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন শুরু হয়। সামরিক সরকার আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে নেয়। সামরিক সরকার আইয়ুব খানের (১৯৫৮-৬৮) বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে বঙ্গবন্ধুকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়।

১৯৬০ এর দশকে নানা রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের দাবি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় পরিণতি পায়। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা থেকে '৭০ এর নির্বাচনে, আওয়ামী লীগের বিজয় পর্যন্ত বাঙালির রাজনৈতিক চেতনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্নিবার প্রভাব বিস্তার করেন। ১৯৭১ সালের শুরু থেকে সারাদেশ কার্যত তাঁর নির্দেশের অধীন হয়ে পড়ে এবং স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্বের বুকে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটান।

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব শেষে পাকিস্তান নামে একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং পাকিস্তানের মোট রপ্তানির সংখ্যাগরিষ্ঠ রপ্তানি হত। তবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুবিধা আনুপাতিক ছিল না। বছরের পর বছর পূর্ব পাকিস্তান আঞ্চলিক ভিত্তিতে ক্রমাগত বৈষম্যের শিকার হতে থাকে। তাছাড়া সামরিক শাসন আইয়ুব খানের অপশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে শেখ মুজিব ৬ দফা দাবি পেশ করেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে যে সব আন্দোলন বাঙালির মনে স্বাধীনতার চেতনা ও স্পৃহাকে ক্রমাগতভাবে জাগিয়ে তুলেছিল ৬ দফা আন্দোলন তারই ধারাবাহিক ফসল। এই ৬ দফা দাবির ধারাবাহিকতায় '৬৯ গণঅভ্যুত্থান, '৭০ এর নির্বাচন জয়লাভ, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৫ মার্চের গণহত্যা, ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা ও বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পথে এগিয়ে যায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে ৬ দফা দাবী এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাইতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যথার্থ বলেছেন– "ছয় দফা বাঙালির স্বাধীনতার সনদ"

৬ দফা দাবি উত্থাপন করার মাধ্যমে শেখ মুজিব প্রকৃত নেতায় ও বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন। গত শতকের '৫০ দশকে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবায়িত করার প্রথম সক্রিয় প্রচেষ্টা হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ১৯৬৬ সালের ৬ দফা ছিল সে পদক্ষেপ। এ কারণেই ছয় দফা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেন–
"এটি (৬দফা) বাংলার প্রাণের দাবী, বাংলার বাঁচার অধিকার"
–(অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ২০১২)।

৬ দফা দাবী পেশ করার ফলে দেশে যে স্বজাত্যবোধ ও গণজোয়ারের সৃষ্টি হয়েছিল তারই ফলে, বাংলার স্বাধীনতা আসে। যে ঘটনার প্রত্যেকটিতে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর নাম ৬ দফার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রফেসর হান্নান বলেন–
"৬ দফা দাবী ছিল বাংলাদেশকে স্বাধীন করার সূচনা, যা পাকিস্তানি শাসকের পরাধীনতার কৃঙ্খলকে ভেঙে নতুন দিগন্ত সূচনা করে।"

৬ দফা দাবী পেশ করার ফলে শঙ্কিত হয়ে পাকিস্তানি সামরিক সরকার আইয়ুব খান ১৯৬৮ সালে "আগরতলা মামলায়" বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে এবং বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিতে ঝুলানোর পরিকল্পনা করে্ কিন্তু ৬ দফা দাবীর আহ্বানে জাগ্রত জনতা এই মিথ্যা মামলা থেকে মুক্তি করার জন্য তীব্র আন্দোলন ও গণজোয়ার গড়ে তোলে যা ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের ফলে বাঙালি জাতি তাদের অধিকার ও স্বাজত্যবোধ সম্পর্কে জানতে পারে। বঙ্গবন্ধুকে তারা তাদের প্রাণের নেতা হিসেবে মনে করে নেয়। ৬ দফা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর যে জনপ্রিয়তা হয়, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে তা স্থায়ী হয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব সরকারের পতন হয় এবং বঙ্গবন্ধু কারামুক্ত হন। শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে তোফায়েল আহমেদ বলেন–
"কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসে যে নেতা প্রিয় মাতৃভূমি বাংলার ছবি হৃদয়ে এঁকেছিলেন, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন, সেই নেতাকে

সেদিন (২৩ ফেরুয়ারি ১৯৬৯) জাতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞ চিত্তে 'বঙ্গবন্ধু' উপধিতে ভূষিত করা হয়।"

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের পতন হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানি সরকার পাকিস্তানে নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাইলফলক। সামরিক শাসক এবং পাকিস্তানি সামরিক জান্তার গণতন্ত্রবিরোধী অপশাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলনের পরে আসে এই নির্বাচন। সেই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পরিষদের ১৯৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে জয়লাভ করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু 'বাংলাদেশ' "জয় বাংলা" স্লোগান ব্যবহার করেন। ১৯৬৬-৭০ মাত্র ৪ বছরে বঙ্গবন্ধু সমগ্র বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার ঐক্যমতে আনতে পেরেছিলেন। এত স্বল্প সময়ে পৃথিবীর কোন নেতাই তার জনগণকে এমন সংঘবদ্ধ করতে পারেননি। বঙ্গবন্ধু সুমহান নেতৃত্ব গুণে ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে জনগণকে আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধু জয়লাভ করেছিলো। ১৯৭০ এর নির্বাচন সম্পর্কে রওনক জাহান বলেন– "১৯৭০ সালের নির্বাচন বাঙালির স্বাধীনতার দ্বার উন্মোচন করে দেয়।"

পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাস ছিল শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস, ছিল করুন ইতিহাস, রক্তে রঞ্জিত করার ইতিহাস। দ্বি জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কৃত্রিম রাষ্ট্রটি শুরু থেকেই ছিল বাঙালি বৈরী। বাঙালি তার অধিকার ও মর্যদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে গেছে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় অব্যাহতভাবে। বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদানে বাঙালি জাতি '৭০ এর নির্বাচনে জয়ী হয়। কিন্তু পাকিস্তানি সরকার বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতায় বসতে দিতে চায়নি। তারা নানা কৌশলে কালক্ষেপণ করছিল আর বাঙালির বিরুদ্ধে হামলে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর দূরদর্শীতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে সব বুঝতে পারেন।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ মুক্তিকামী বাঙালি জাতিকে শুনিয়েছিলেন 'অমর কবিতা' ৭ মার্চের ভাষণ। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে উত্তাল সমুদ্রে সভা মঞ্চে "রাজনীতির কবি" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ভাষণ দেন। মাত্র ১৯ মিনিটের ভাষণে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের ২৩ বছরের রাজনীতি ও বাঙালিদের বঞ্চনার ইতিহাস, পাকিস্তানে রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙালিদের দ্বন্দ্বের স্বরূপ উপস্থাপন, অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানে তাঁর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। সারা বাংলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ, প্রতিরোধ সংগ্রাম শেষাবধি মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেওয়ার ইঙ্গিত, শত্রূর মোকাবেলায় গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন, যে কোন উস্কানির মুখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার পরামর্শ দান ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন। তিনি ৭ই মার্চের ভাষণে প্রচ্ছন্নভাবে স্বাধীনতার ডাক দেন। তিনি বলেন– 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রূর মোকাবেলা করতে হবে, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দিব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।

তিনি সবাইকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করার জন্য বলেন, "... এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা"
– (বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৯৫৭-২০১৮, হারুন-অর-রশিদ)

বাঙালি জাতির ইতিহাসে ৭ই মার্চ এক অবিস্মরণীয় দিন। বাঙালির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতার এই ভাষণের দিক নির্দেশনায় ছিল সে সময় বজ্রকঠিন জাতীয় ঐক্যের মূল মন্ত্র। কালজয়ী এই ভাষণের মাধ্যমে তিনি বঞ্চিত ও মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ আর বহু ত্যাগের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি।

"৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি একটি জাতিকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেছেন, স্বাধীনতার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।"

-অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের পর পুরো দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। পূর্ব বাংলায় কার্যত পাকিস্তানি সরকারের কোন মূল্যই ছিল না। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় পরিচালিত হতে থাকে। ১লা মার্চ ১৯৭১ হতে ২৬ মার্চ পর্যন্ত নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হতে থাকে দেশ। একদিকে ক্ষমতায় বসানোর মিথ্যা আশ্বাস দিতে থাকে, অন্যদিকে পাকিস্তানি সরকার তাদের নীল নকশা বাস্তবায়ন করার জন্য চিন্তা করতে থাকে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে ২৫ মার্চ ছিল একটি নির্মম গণহত্যার দিন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি বাহিনী। বাঙালিদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে এ হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পরিচালিত সেই অভিযানে প্রায় ৫০ হাজার বাঙালিকে হত্যা করা হয় বলে ধারণা করা হয়। এই অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল ঢাকাসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান শহরগুলোতে আওয়ামী লীগ নেতা ও ছাত্রবৃন্দ এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের গ্রেফতার করে ও সামরিক অভিযান চালিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করা এবং পূর্ব পাকিস্তানে, পাকিস্তানি সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গভীর রাতে এদেশের বুকে দানবের মত ঝাপিয়ে পড়ে ও বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হবার পূর্বেই সব কিছু জেনে ফেলেন এবং ২৬ মার্চ ১৯৭১ এর প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, "ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা। আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছ, যাহার যা কিছু আছে তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটির হতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।"

– (বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা: ৬ষ্ঠ তফসিল, বাংলাদেশ সংবিধান)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে দেশে যুদ্ধের নির্দেশনা দেন এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার আহ্বান করেন। স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা ড. কামাল হোসেন বিবিসি বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন–

"স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চ তাঁর বাসভবন, ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে টেলিফোনে সারাদেশে যুদ্ধের প্রস্তুতির নির্দেশনা দেন।" তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে বলেন– "ইনস্ট্রাকশানের একটা ফর্মূলা ছিল। যে মুহূর্তে তারা আক্রমন শুরু করবে, সেই মুহূর্ত থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আঘাত হবার সাথে সাথে আমরা স্বাধীন। যে যা কিছু পাই, তাই নিয়ে আমরা প্রতিবাদ প্রতিরোধে নেমে যাব।"

এই ঘোষণার পরে বাংলার সর্বস্তরের মানুষ পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ এতটা রক্তমাখা সূর্যোদয় হয়তো এদেশের মানুষ কখনো দেখেনি, কিন্তু এ এক নতুন সূর্য, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সূর্য। যার রূপকার শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ এই ২৩ বছরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ক্রমাগত বেগবান হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্তরে ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬'র ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৭০ এর নির্বাচন সকল স্তরে বঙ্গবন্ধু অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন। বঙ্গবন্ধু সারাজীবন বাংলা, বাংলার মানুষের অধিকার নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে তিনি বলেছেন– "একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানব জাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্প্রীতির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।" – অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ২০১২)।

এই উদ্বৃতি থেকেই বাংলা, বাংলার মানুষের প্রতি তাঁর টান বুঝতে পারি। দেশের স্বার্থের কাছে, জনগণের স্বার্থের কাছে তিনি নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। এ কারণেই হয়ত কবি অনুদাশঙ্কর রায় বাংলাদেশের আরেক নাম রেখেছেন 'Mujibland'। এক অর্থে বঙ্গবন্ধুই একটা পর্বের বাংলাদেশের ইতিহাস। বাংলাদেশের ইতিহাস জানতে হলে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম চলে আসবে। তাঁর জীবন ও কর্মের ক্রমিক ইতিহাসই বাংলার ইতিহাস। এ কারণেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পরম মিত্র, ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন– "শেখ মুজিব ছিলেন মহান নেতা। তাঁর অনন্য সাধারণ সাহসিকতা এশিয়া ও আফ্রিকার জন্য প্রেরণাদায়ক ছিল।"

বিশ্ব ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর মতো জাতীয়তাবাদী নেতার দৃষ্টান্ত বিরল। তিনিই বিশ্বের একমাত্র নেতা– যিনি জাতীয় পুঁজির আত্মবিকাশে আকাঙ্ক্ষা ও বাঙালির সম্মিলিত মুক্তির বাসনাকে এক বিন্দুতে মেলাতে পেরেছেন। এ কারণেই তিনি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও সাহসিকতা দেখে ফিদেল ক্যাস্ত্রো বলেছিলেন– "আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি।"

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ একটি জাতিকে জাগ্রত করেছে। সবাইকে মিলিয়েছে এক মোহনায়, সবাইকে করে তুলেছে স্বাধীনতামুখী– এমন ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। হাজার বছরের অপেক্ষা শেষে ৭ মার্চের ভাষণ গোটা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছে স্বাধীনতার স্বপ্নে, মুক্তির সংগ্রামে, শুধু ৭ মার্চের ভাষণ না, ৬৬'র ৬ দফা বাঙালি জাতিকে নতুন পরিচয় দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সকল কর্মই ছিল বাংলা ও বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য। তাইতো কবি বলেছেন–

মুজিব মানে বাংলাদেশ, বাংলাদেশের অপর নাম
মুজিব মানে স্বাধীনতা, বাঙালি জাতির উত্থান।

২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসন শোষণের শেকল থেকে মুক্ত হয়েও ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি বাঙালিরা। মোকাবেলা করতে হয়েছে পাকিস্তানি শাসনের জুলুম ও অত্যাচার। শেখ মুজিবই এই জুলুম–অত্যাচার থেকে মুক্ত করে আরাধ্য স্বাধীনতা দিয়েছে।

স্বাধীনতার আগে বাংলার যে অবস্থা ছিল সেখান থেকে বাংলাদেশের যে আমূল পরিবর্তন হয়েছিল তার পেছনে ছিল বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু আজীবন স্বপ্ন দেখেছেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, মানবিক বাংলাদেশ। গড়তে চেয়েছিলেন সোনার বাংলা।

জানতে হবে সব ইতিহাস এদেশের
জানতে হবে তোমার নিজেকে
বুকে ফোটাও জাতির পিতার বীজকে
-(জানতে হলে তাকে, ২০১২)

কেবল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তিই নয়, বাংলাদেশের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মুক্তি সংগ্রামেরও অন্যতম নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু পালন করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বস্তুত, তার সাধনার মধ্য দিয়েই ভাষা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্ভব বাঙালির জাতীয়তাবাদের পূর্ণাঙ্গ রূপ সৃষ্টি করেছে।

স্বাধীকার থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম সবই পরিচালনা করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর ছিল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার মতো অসাধারন বজ্রকণ্ঠ। অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে তার ছিল বিপুল খ্যাতি। অকৃত্রিম দেশপ্রেম, সাধারণ জনগণের প্রতি গভীর ভালবাসা, অমায়িক ব্যক্তিত্ব, উপস্থিত বুদ্ধি তাকে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করেছে। তার হাত ধরেই স্বাধীন হয়েছিল এ দেশ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিলেও স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকের দল তার সাফল্য ও বাঙালির উত্থানকে মেনে নিতে পারেনি। দেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করে দিতে শুরু করে নতুন ষড়যন্ত্র। তিনি দেশীয় ষড়যন্ত্রের শিকার হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তৎকালীন কিছু বিপদগামী সদস্যের হাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। মুজিব হত্যা সম্পর্কে উহলিবান্ট বলেছেন, "মুজিব হত্যার পর বাঙালিদের আর বিশ্বাস করা যায় না। যারা মুজিবকে হত্যা করতে পারে তারা যে কোন জঘন্য কাজ করতে পারে।"

বঙ্গবন্ধুকে এই পৃথিবী থেকে সরালেও, বাঙালির ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। কেননা বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া মানে বাঙালি জাতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করার শামিল। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ যেন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। তাইতো কবি গৌরী প্রসন্ন মজুমদার বলেছেন–

শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ
মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি– প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে ওঠে রণি, বাংলাদেশ
আমার বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় জেলে কাটিয়েছেন, দেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের কারণে। তাঁকে যতবারই জেলে বন্দী করা হয়েছে, জেল থেকে বের হয়ে ততবারই নতুন উদ্দামে সংগ্রাম করেছেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর পুরো জীবনটা বাংলা, বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ নামক দেশ সৃষ্টি করার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।

কৈশোর কাল থেকেই তিনি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। '৪৮ ও '৫২ ভাষা আন্দোলন, '৫৪ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮-র সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬২-র শিক্ষার আন্দোলন, '৬৬র ছয় দফা আন্দোলন, '৬৯-র গণ অভ্যুত্থান, '৭০-র নির্বাচন, '৭১ এর গৌরবৌজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধ– বাঙালির প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের শক্তির প্রধান উৎস ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে ছিলেন সর্বদা বজ্রকণ্ঠ।

বঙ্গবন্ধু সারাজীবন আন্দোলনের রাজনীতি করেছেন ও দল গঠন করেছেন। মুক্তির কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি সবসময় গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং গণতন্ত্রের চর্চা করতেন। তিনি লাখ লাখ জনতাকে সংঘবদ্ধ করতেন আন্দোলনে। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল অহিংস এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, যাতে গণতান্ত্রিক পন্থার মধ্য দিয়ে জনমত সৃষ্টি করে অধিকার আদায় করা যায় এবং অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা যায়।

বাংলাদেশ ও বাঙালি সত্তাকে তিনি কী ভীষণভাবে ভালোবাসতেন, তা বোঝা যায় ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে তিনি যে ভাষণ দেন, তা থেকে। তিনি বলন– "আমার সেলের পাশে আমার জন্য কবরও খোঁড়া হয়েছিল।.......... আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময়ও আমি বলব, বাংলা আমার দেশ, বাংলার আমার ভাষা, জয় বাংলা।"

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস একটি অনন্য নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার, জাতির জনক। তাঁর দূরদর্শী, বিচক্ষণ এবং ক্যারিসমেটিক নেতৃত্বগুণেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। তিনি সব সময় দেশের ও জাতির কল্যাণে কাজ করে গেছেন। সমস্ত জাতিকে তিনি মুক্তি ও স্বাধীনতার চেতনায় ঐক্যবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তার আত্মত্যাগ জাতিকে মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। তাই আজও তিনি প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে চির অম্লান হয়ে রয়েছেন। কবি অন্নদাশংকরের ভাষায় বলতে হয়–

যতদিন রবে পদ্মা-মেঘনা-গৌরী-যমুনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

একসূত্রে গাঁথা বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

সাদিয়া বিনতে সোলায়মান
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট

তিনি একজন কিংবদন্তি, একটি নাম, বিস্ময় জাগানিয়া চিরজাগরুক একটি প্রত্যয়। চির দুর্মর, চির অমলিন এক বহ্নিশিখা। তিনি আমাদের জাতির পিতা। আমাদের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। যার সংগ্রামী তেজস্বী মনোভাব এবং বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল স্বাধীনতার স্পর্ধিত উচ্চারণ। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর দেশপ্রেম নিষ্ঠা ছিলো আকাশচুম্বী। তাঁর জীবন ও কর্ম ধ্রুপদি উপন্যাস ও মহাকাব্যিক জীবনবোধকে ছাপিয়ে গেছে এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের শ্বাশত পটভূমিতে বাঙালির জীবনে তিনি মহাকালের বাতিঘর হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে যাচ্ছেন। ছড়াবেন অনন্তকাল। বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আমাদের মহান স্বাধীনতা একে অপরের পরিপূরক।

বাংলাদেশ নামক পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল ভূখন্ডের অধিবাসী জনগণের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে আপন করে নিয়েছিলেন। তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু', 'জাতির পিতা'; 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন প্রকৃত মানবতাবাদী। তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' তে তিনি বলেছেন– "আমি মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখি। রাজনীতিতে আমার কাছে মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান বলে কিছু নাই। সকলেই মানুষ।"

এটি বঙ্গবন্ধুর আত্মপরিচিতি। এছাড়াও তাঁর সান্নিধ্যে যারা এসেছেন তারাও বঙ্গবন্ধুর মানবতাবাদী চেতনার দ্বারা সম্মোহিত হয়েছেন। ঘনিষ্ঠ অনুসারী জননেতা তোফায়েল আহমেদ বলেছেন, "দেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় তাঁর স্মৃতি অমর হয়ে আছে, থাকবে চিরকাল।"

শ্রদ্ধা করার মতো ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মানুষটি খুব সহজেই মানুষকে কাছে টেনে নিতেন। নাম মনে রাখতে পারতেন মাঠ পর্যায়ের কর্মীদেরও। তোফায়েল আহমেদ আরও বলেন, "সঠিক সময়ে শতভাগ নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় তার কোনো জুড়ি ছিলো না। তিনি যা কিছু বলতেন, চিন্তাভাবনা করে বলতেন এবং একবার যা বলতেন, সেখান থেকে একচুলও নড়াচড়া করতেন না। আর তাই তিনি জনগণের সত্য হয়েছেন। হয়েছেন নেতারও নেতা। সারা বাংলার মানুষের প্রিয় নয়নমণি।"

১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ লোক মারা যাচ্ছিল, তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র ছিলেন। এ সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পৌর সরবরাহ মন্ত্রী। অসমাপ্ত আত্মজীবনী- তে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন দুর্ভিক্ষের সময় কী অবস্থা হয়েছিল। লাখ লাখ লোক কীভাবে গ্রাম থেকে শহরে ছুটে গিয়েছে খাদ্যের

সন্ধানে, কীভাবে ব্যবসায়ীরা খাদ্য গুদামে সংরক্ষণ করে সংকটে ফেলেছিল এবং কীভাবে রাস্তায় লোক মরে পড়ে থাকত এর সবই বর্ণিত হয়েছে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে'। এ সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আদেশে লঙ্গরখানা চালু করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু বলেছেন–

"আমিও লেখাপড়া ছেড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অনেক লঙ্গরখানা খুললাম। দিনে একবার করে খাবার দিতাম। মুসলিম লীগ অফিসে, কলকাতার মাদ্রাসায় এবং আরও অনেক জায়গায় লঙ্গরখানা খুললাম। দিনভর কাজ করতাম; আর রাতে কোনো দিন বেকার হোস্টেলে ফিরে আসতাম, কোনো দিন লীগ অফিসের টেবিলে শুয়ে থাকতাম।"

১৯৬৯ সালের ২৩ ফেরুয়ারি ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সংবর্ধনা সভায় আসেন শেখ মুজিব। সেদিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রাণের জোয়ার নেমেছিল। ১০ লাখ মানুষের পদভারে গোটা উদ্যানের সবুজ ছেঁয়ে গিয়েছিল। গোধূলিলগ্নের অদ্ভুত আলোর আভায় মঞ্চে আসেন শেখ মুজিব। কেঁপে উঠে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। সমবেত সবার মনের আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণ ঘটে একটি কন্ঠে–

"আজ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু, বাংলার বঙ্গবন্ধু, যিনি ফাঁসির মঞ্চে গিয়েও বাঙালির জয়গান গেয়েছেন।"

-(তোফায়েল আহমেদ)

এটাইতো আমাদের বঙ্গবন্ধু। এটাইতো আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের আসল প্রতিচ্ছবি। মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার বিনিময়ে জনগণের কাছ থেকে যে আস্থা বঙ্গবন্ধু অর্জন করেছিলেন সে কারণে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র সৃষ্টির আগেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর দেশের শাসনভার তাঁর হাতে চলে এসেছিল। নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং আইনসভাসহ রাষ্ট্রযন্ত্রের এসব কাঠামোর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত কর্তৃত্ব স্থাপনের বিরল ঘটনা ইতিহাসবেত্তাদের নিকট অবিশ্বাস্য বলেই প্রতীয়মান হবে, সন্দেহ নাই। চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা বা রাশিয়ার স্বাধীনতা বা মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসেও এমনটি ঘটেনি। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালি জাতির নিরঙ্কুশ সমর্থন লাভ করেন। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে লাখো মানুষ ঘোষিত ইশতেহারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক, রাষ্ট্রপতি ও জাতির পিতা হিসেবে অনুমোদন করা হয়; যা দেশি-বিদেশি সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত সুদীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের পর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের রক্তাক্ত অভ্যুদয় ঘটেছে। জনগণের সঙ্গে রাজনীতি করতে করতে বঙ্গবন্ধুর জীবনযাপন এমনই হয়ে পড়েছিল যে তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে

গণভবনে কিংবা রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর বঙ্গভবনে বাস করতেন না। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে এ দেশের মানুষ, এ দেশের মাটি তার চির আপন।

ইতিহাস কখনো কখনো বাঁক নিতে গিয়ে থেমে যায়। কখনো বা সোজা যেতে যেতে বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে পারে না। সময়ের খোপে খোপে কেউ কেউ বারুদ জ্বালিয়ে সংগ্রাম শাণিয়ে তোলে। সেই সংগ্রাম কখনো সফল, আবার কখনো বিফল হয়। তবে যারা সংগ্রাম শাণিয়ে তোলে তারা একেকজন ইতিহাসের সূর্যসন্তান। এই বাংলাতেও ও যুগে যুগে ইতিহাসের সূর্যসন্তান এসেছেন। বাংলায় এসেছেন ক্ষুদিরাম-তিতুমীর-সুভাষ-সূর্যসেন। এসেছেন রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-সুকান্ত। এঁরা ইতিহাসের পাতায় পাতায় বাংলাকে মুক্ত করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ দুটি আলাদা নাম হলেও ইতিহাস কিন্তু একটিই। ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থক, এক ও অভিন্ন। তিনিই স্বাধীন বাংলাদেশের পথিকৃত। বাংলাদেশের ইতিহাস রচনায় তিনিই অবিসংবাদিত মহানায়ক, রাজনীতির মহাকবি। তিনি যুক্ত ছিলেন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে, ভূমিকা রেখেছেন চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট গঠনে, এবং নেতৃত্ব দেন আটান্ন-এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে। তার হাত ধরে আসে ছেষট্টির ছয় দফা। গ্রেপ্তার হন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়। সেই মামলা অপসারণের জন্য বাঙালিরা নামে রাজপথে।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কারণে মামলা থেকে অব্যাহতি পান শেখ মুজিব। এরপর সত্তরের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে তাঁর দল আওয়ামী লীগ। তারপরও পশ্চিম পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের টালবাহানা শুরু করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তো দমে যাওয়ার পাত্র নন। তাঁরই নেতৃত্বে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। আর এই আন্দোলন যাত্রা শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধের দিকে। তিনি এক পর্যায়ে নিজের জীবন বাজি রেখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি পায় স্বাধীন ও সার্বভৌম ভূখন্ড। যে স্বাধীনতার স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে বাঙালিকে দেখিয়ে এসেছেন।

বঙ্গবন্ধুই আমাদের প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন একটি শব্দ ও চেতনার সঙ্গে। সেটি হলো 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'। অর্থাৎ সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে একটি নতুন রাষ্ট্রগঠন। তবে সেই রাষ্ট্র গঠনে প্রাধান্য পায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন। তাঁর নেতৃত্বে একটি যৌক্তিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলে মুক্তিযুদ্ধ যার মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম ভূখন্ড। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে শাসিত ও শোষিত বাঙালিকে মুক্ত করার একমাত্র ও প্রধান হাতিয়ার হলো সব ধর্মের মানুষকে এক জায়গায় নিয়ে আসা। তাই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের ডাক দেওয়ার সাহস পেয়েছিলেন। একই সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে স্বাধীনতা অর্জন করে বাংলাদেশ।

অধিকার থেকে স্বাধীকার সব জায়গায়ই ছিলো বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সংগ্রামী উচ্চারণ। আর এজন্যই তিনি ঘোষণা দিয়ে বসলেন পূর্ব পাকিস্তান শতভাগ বাঙালি অধ্যুষিত।

এলাকার নাম হবে 'বাংলাদেশ' যা তিনি দিয়েই দিলেন। এবার সেই নামে একটি স্বাধীন জাতিসত্তার তিলক এঁকে দিতে দিলেন যুদ্ধের ডাক। মুক্তিকামী বাঙালি যুদ্ধ করে ছিনিয়ে আনল স্বাধীনতা ও অধিকার। মুক্তিযুদ্ধ দিলো বাঙালি জাতির উপর অধিকারের চাপ। সেটা কিন্তু বঙ্গবন্ধুই তৈরি করেছিলেন। সেদিন শোষণ ও শাসনের কৃঙ্খল থেকে মুক্তির নেশা তৈরি হয়েছিল সাতকোটি বাঙালির। একদিকে পাকিস্তানি সৈন্যদের তাক করা অস্ত্র, আরেকদিকে সাত কোটি বাঙালির রক্তমাখা চোখ। সেই রক্তমাখা চোখ চেয়েছিল তাদের মহানায়কের দিকে। মহানায়ক উচ্চারণ করলেন একটি শব্দ- 'স্বাধীনতা' মুক্তি ও স্বাধীনতা তখন বাঙালি জাতির জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ে। শেখ মুজিব নিজেকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন যে, বলতে গেলে ১৯৭১ সালের পুরো মাসের মার্চ তাঁর নির্দেশই হয়ে ওঠে সরকারি নির্দেশ। মানুষ সেই নির্দেশ মানতে থাকে, এমনকি সরকারি প্রশাসনও।

বলা হয়ে থাকে, স্বাধীনতা যতটা রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক, মুক্তি ততটাই অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক। বাঙালি '৪৭-এ দেশ ভাগের মাধ্যমে অপরিকল্পিত ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্য দিয়ে তথাকথিত স্বাধীনতা পেলেও মুক্তি পায়নি। তারা তাদের আত্মা বিক্রি করে দিয়েছিল পাকিস্তানের কাছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু চাইলেন বাঙালির মুক্তি। মুক্তি মানে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সব ধরণের শোষণ ও বৈষম্য থেকে মুক্তি। বঙ্গবন্ধু তাই ঘোষণা করলেন–

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

বাঙালি সেই ঘোষণার মধ্য দিয়ে জীবন বাজি রেখে অনিবার্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস পর ত্রিশ লাখ শহিদ ও দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম হারানোর মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীনতা।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষকে কী পরিমাণ ভালবাসতেন, এদেশের মানুষের জন্য তাঁর কী পরিমাণ দরদ ছিল তা একটি ঘটনা অবতারণা করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯৭১ এর ১৭ মার্চ ছিল বঙ্গবন্ধুর ৫২তম জন্মদিন। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা শেষে দুপুরে ধানমন্ডির বাসভবনে বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে একজন সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুকে তাঁর জন্মদিনের চাওয়া ও কামনা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন–

"জনগণের সার্বিক মুক্তি। আমি জন্মদিন পালন করি না। কেকও কাটি না। এদেশের মানুষের নিরাপত্তা নাই। আমি জনগণেরই একজন, আমার জন্মদিনই কী, আর মৃত্যুদিনই কী? আমার জনগণের জন্য আমার জীবন ও মৃত্যু।"

স্বাধীনতার পর বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন,

"And when you see them digging a grave and you think of everything you will have to leave behind you, do you think of your country, or, for instance, of your wife and children first?"

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,

"I feel for my country and my people and then my family. I love my people more. I suffered for my people and you have seen how my people love me."

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতিটি ধাপেই বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তির জয়গান গেয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ের পরতে পরতে ছিলো শুধু বাংলাদেশের মাটি আর মানুষের স্পন্দন। তাইতো দু'-দু'বার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন, "ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলবো, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।" বাংলা ও বাঙালির জন্য তাঁর হৃদয়ের ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। সমুদ্র বা মহাসমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করা সম্ভব; কিন্তু বাংলা ও বাঙালির জন্য বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ের দরদ ও ভালোবাসার গভীরতা অপরিমেয়, অতুলনীয়। বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু একটি পরিপূরক প্রত্যয়।

তথ্যসূত্র

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা (২০২১), সেরনিয়াবাত, মহিউদ্দীন, এটিএম, *দৈনিক যুগান্তর* ০৩ নভেম্বও, ২০২১।

বঙ্গবন্ধু ও একটি প্যারাডাইস শিফট (2021), *bdnews24.com*, 17 september, 2021.

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় (২০২০), রওনক জাহান, *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৬ ডিসেম্বর, ২০২০।

মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন, ছাত্রজীবন থেকে জাতীয় রাজনীতি ১৯২০-১৯৪৯*

রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২)। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহান স্বাধীনতা

আব্দুল্লাহ আল আমিন শাহীন
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা

শেখ মুজিবুর রহমান (মার্চ ১৭, ১৯২০-আগস্ট ১৫, ১৯৭৫) বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক নেতা যিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং জাতির জনক। তিনি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সভাপতি। বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং পরবর্তীতে এদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। জনসাধারণের কাছে তিনি শেখ মুজিব এবং শেখ সাহেব হিসেবে বেশি পরিচিত এবং তাঁর উপাধি "বঙ্গবন্ধু।"

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে স্বাধীনতার লাল সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। পরাজিত হয়েছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। বিজয় হয়েছিল মীর জাফর ও তার সহযোগীদের। তারা ইংরেজ শাসকদের বাংলার মসনদে বসিয়ে মোসাহেবের খাতায় নিজেদের নাম লিখিয়েছিল। এতে কায়েম হয়েছিল দু'শত বছরের ইংরেজ শাসন। এর পরে ১৯৪৭ সালে গোঁজামিলের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব হলো ১১০০ মাইলের। একমাত্র ধর্মীয় সাদৃশ্য ছাড়া দুই ভূখন্ডের মানুষের মত-পথ, ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার মধ্যে কোন ঐক্য সাদৃশ্য ছিল না। দুই ভূখন্ডের অর্থনীতি ও রাজনীতিও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ইংরেজ শাসন ও শোষণের হাত হতে আপাত মুক্তির প্রত্যাশায় এ গোঁজামিলকে মানুষ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই দুই ভূখন্ডের মধ্যে বৈষম্য ও বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

একচ্ছত্র শাসন ক্ষমতার মালিক হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নানাভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে ঠকাতে থাকে। চলতে থাকে শাসন ও শোষণ। বাঙালিদের মনে ক্ষোভ আর অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। সর্বপ্রথম আঘাত আসে আমাদের ভাষার ওপর। উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হলে ১৯৫২ সালে বুকের রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে মায়ের ভাষাকে রক্ষা করতে হয়। এরপর আঘাত আসে শিক্ষার ওপর। ১৯৬২ সালে একটা সর্বজনীন ও গণমুখী শিক্ষার দাবিতে বাঙালি জাতিকে আন্দোলনে রাজপথে নামতে হয়। এ প্রেক্ষাপটে শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী ও তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান আপাতত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সোচ্চার হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও শোষকগোষ্ঠী নিজেদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর সামরিক ফরমান বলে ক্ষমতা কেড়ে নেন।

পাকিস্তানের সামরিক শাসনের নাটের গুরু খ্যাত মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত ও দেশ থেকে বিতাড়িত করে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত

করে জেঁকে বসেন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন চলতে থাকে। ইতোমধ্যে পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের কারণে স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হয়। এভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ তৈরি হতে থাকে।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দান থেকে ঠিক বিকাল ৩ টা ২ মিনিটে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হলো সেই আপ্তবাক্য–

"এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

১৮ মিনিটের সেই বক্তৃতা পাল্টে দিল বাংলার ইতিহাস ও বাঙালির ইতিহাস। এই আপ্তবাক্য কি হঠাৎই উচ্চারিত হয়েছিল? এর পেছনে প্রস্তুতি ছিল, সংগ্রাম ছিল, রক্ত ঝরেছিল বহুবার সেই বায়ান্ন থেকেই। যেদিন বাঙালি বুঝতে শিখেছিল যে সে বাঙালি, বাংলা তার ভাষা, সেদিন থেকে পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু। ১৯৪৮ সালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন-

"If we begin to think of ourselves as Bangalis, Punjabis and Sindhis first, and moslems and Pakistanis only incidentally, then Pakistan is bound to disintegrate"

(The Magazine, 15 March, 1971)

৭ই মার্চ এর আগেই বঙ্গবন্ধু Time এর সংবাদদাতা Dan Coggin কে বলেছিলেন, "সমঝোতার আর কোন আশা নেই।"

১লা মার্চ থেকেই রাজপথে রক্তপাত আরম্ভ করেছিল পাকিস্তানি বাহিনী। জেনারেল ইয়াহিয়া আবারো ঘোষণা দিল যে গণপরিষদের বৈঠক বসবে ২৫ মার্চ। জেনারেলদের দম্ভভরা কণ্ঠে শোনা গেল যে, "যতদিন আমি সেনাবাহিনীর প্রধান আছি, আমি দেখিয়ে দেবো কীভাবে পাকিস্তানের অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে হয়।"

বঙ্গবন্ধুর ১৮ মিনিটের ভাষণে ভেসে গিয়েছিল ঐ জেনারেলের দম্ভোক্তি। নিষ্ঠুরভাবে সত্য হয়েছিল জিন্নাহর আশঙ্কা। জেনারেলদের দম্ভোক্তির উত্তরে বঙ্গবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানিদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "ওদের আমি শায়েস্তা করে দিব, ওদের হাঁটু গেঁড়ে বসতে বাধ্য করবো।"

৫ই ফেরুয়ারি, ১৯৬৬ তে শেখ মুজিব ৬ দফা প্রস্তাব লাহোরে উত্থাপন করেন রাজনৈতিক দলের বৈঠকে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে এ কর্মসূচি বিচলিত করে তোলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার কার্যকর পদক্ষেপ ছিল সেটি। ৬ দফার প্রস্তাবে ছিল বাঙালির বাঁচার দাবি এবং ঐ প্রস্তাবে স্বাধীনতার সংগ্রামে এক নতুন মোড় নেয়। তখন থেকেই শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনীতি এগুতে থাকে।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাংলার মানুষ যে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তা ছিল বিশ্ব ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের মোড়। একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের মূলে রয়েছেন বঙ্গবন্ধু, আওয়ামী লীগ ও জনগণের সুদীর্ঘ ২৪

বছরের বিরামহীন রাজনৈতিক সংগ্রাম। মূলত বঙ্গবন্ধুর প্রাজ্ঞ নেতৃত্বই এ দেশের মানুষ এগিয়ে গেছে গণতন্ত্রের পথে। অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনার দিকে, জাতীয় মুক্তির অর্জনের লক্ষ্যে।

৭ মার্চ ভাষণের পর ধাপে ধাপে অথচ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় রাজনীতি। বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ঘোষণার জন্য যেন দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ছিল এবং তাঁর নির্দেশনা বাস্তবে সফল করার জন্য কঠোর শপথ নিল। বস্তুত স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হয় ৭ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পতনের সাথে। বিকল্প সরকার চলতে থাকে বঙ্গবন্ধুর আদেশে। সচিবালয়ই হোক বা মন্ত্রণালয়ই হোক তা স্থানান্তরিত হল ইডেন বিল্ডিং থেকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে। ছয়দফা তখন এক দফায় রূপ নেয় স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা।

"তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা কিছু আছে– আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দিবে।"

এ আদেশ সশস্ত্র সংগ্রামে আদেশ, যুদ্ধের প্রস্তুতি। বঙ্গবন্ধুর এ আদেশেই লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়েছিল হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছিল স্বাধীনতার জন্য। ২ লক্ষ নারী লাঞ্ছিত হয়েছিল হানাদার বাহিনীর হাতে।

মার্চের প্রথম দিন থেকেই পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা হারিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুই ছিলন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা। মওলানা ভাসানীর মত নেতাও মেনে নিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব।

বঙ্গবন্ধুকে হানাদার বাহিনী গ্রেফতার করে নিয়ে যায় জেনারেল ইয়াহিয়ার নির্দেশে। তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বিচার করার জন্য। এদিকে বঙ্গবন্ধুর শেষ আদেশে দেশের লোক অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। তাঁর দেয়া স্লোগান 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে শারীরিকভাবে অনুপস্থিত; কিন্তু তার প্রতীকের উপস্থিতি সর্বত্রই।

স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী মুজিবনগর তাঁরই নামে। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র তৈরি হয়। এ ঘোষণাপত্রে বলা হয়, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা ঢাকাতে ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন।

ঘোষণাপত্রে আরো বলা হয় যে, সংবিধান প্রণয়ন না করা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র প্রধান হবেন। এটি পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। ১১ এপ্রিল স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ একটি ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধুর নামে নামকরণ করা হয় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' সরকারের কর্মস্থল।

বাংলাদেশে অবস্থিত সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তখন থেকে পাকিস্তান সরকারের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশকেই অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে শুরু করে। শুধু প্রাদেশিক সরকারি দপ্তর নয়, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরসমূহেও বঙ্গবন্ধুকে আইনসঙ্গত নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে গণ্য করে তাঁর নির্দেশ মান্য করে চলতে থাকে।

বস্তুত, একটি সরকার দেশের প্রশাসন, আইন কৃঙ্খলা রক্ষা, প্রতিরক্ষা, অর্থনৈতিক কার্যক্রম, পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে যে যে দায়িত্ব পালন কওে; বঙ্গবন্ধুর ৩৫টি নির্দেশনায় ঐ সব বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়।

যেমন, ১নং নির্দেশে বলা হয়েছিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট, সরকারি ও বেসরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, হাইকোর্ট ও বাংলাদেশের সমস্ত কোর্ট-কাচারি বন্ধ থাকবে। এর মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের বাংলাদেশ বিরোধী কার্যকলাপ পরিপূর্ণভাবে রোধ করা সম্ভব হয়েছিল।

৩নং নির্দেশে জেলা ও মহকুমা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাথে সহযোগিতা ও সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কাজ করার নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং এসব নির্দেশ আন্তরিকভাবে পালিত হয়েছিল।

২৫ নং নির্দেশে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহ স্বাভাবিকভাবে কার্যকলাপ চালিয়ে যাবে; কিন্তু স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে বাংলাদেশের বাইরে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাঠানো যাবে না।

বস্তুত, ৩৫টি নির্দেশনামায় বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় এমন সুচিন্তিতভাবে উল্লিখিত হয়েছিল যে বাংলাদেশ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব এবং অধিকার বঙ্গবন্ধুর হাতে চলে গিয়েছিল। এ নির্দেশগুলো প্রকৃতপক্ষে ছিল বঙ্গবন্ধু প্রণীত ছয় দফারই বাস্তবায়ন। তাঁর প্রদত্ত নির্দেশাবলি সারা পূর্ব বাংলায় অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। পাকিস্তান সরকারের কোন অস্তিত্বই তখন ছিল না।

আধুনিক বিশ্বে যে কোন বড় ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে SWOT Analysis প্রবাদটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে S অক্ষরটি Strength, W অক্ষরটি Weakness, O অক্ষরটি Opportunity এবং T অক্ষরটি Threat-এর প্রতিনিধিত্ব করে। মুক্তিযুদ্ধের বিষয়াবলির SWOT বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হল–

Strength	Weakness	Opportunity	Threat
১। শোষিত-নির্যাতিত জনগণ	১। শাসন গোষ্ঠীর কৌশল	১। ভারতের সর্বাত্মক, সমর্থন, সাহায্যে ও সহযোগিতা	১। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর ঐক্য ও ক্ষমতা লিপ্সা
২। আওয়ামী লীগ	২। পূর্ব পাকিস্তানের কিছু রাজনীতিবিদের	২। ভারত কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ	২। ৭ম নৌবহর

	মোসাহেবী ও ক্ষমতার অংশীদারিত্ব		
৩। বঙ্গবন্ধুর সাহসী নেতৃত্ব ও দেশপ্রেম	৩। পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও পাকিস্তান বন্দনা	৩। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন	৩। পাকিস্তানের সাথে গণচীনের সুসম্পর্ক ও সহযোগিতা
৪। ছাত্র নেতৃত্ব ও আন্দোলন	৪। ২২ পরিবারের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতা	৪। সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক প্রেরিত ৮ম নৌ বহর	৪। টিক্কা খান ঘোষিত "বাংলার মাটি চাই, মানুষ চাই না" নীতি
৫। শ্রমিক নেতৃত্ব ও বাম রাজনীতিকদের অংশগ্রহণ	৫। বাঙালির নিরস্ত্র অবস্থা	৫। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত	৫। দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব ও মানবসৃষ্ট দূর্যোগ।
৬। ইপিআর, পুলিশ ও বাঙালি সেনা সদস্য	৬। অস্ত্র, গোলাবারুদ ও রসদের অভাব	৬। মিশ্র বাহিনীর অপারেশন	৬। প্রশিক্ষিত পাক হানাদার বাহিনী
৭। বাঙালি জাতির ঐক্য, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ	৭। রাজাকার, আল বদর, আল শামস	৭। গেরিলা যুদ্ধ কৌশল ও নদী মাতৃকা	৭। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড, পাকিস্তানি বিমান বাহিনী ও যুদ্ধ বিমান

বিদেশী সাংবাদিক David Frost এর প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "My qualification (Strength) is that I love my people. My disqualification (Weakness) is that I love my people too much."

বঙ্গবন্ধুর ছিল জনগণের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, দেশপ্রেম ও সাহস। বাঙালির ত্যাগ বৃথা যাবে না, জয় আমাদের হবেই– এ প্রত্যয় নিয়েই সব Weakness ও Threat কে অতিক্রম করেছেন তিনি। সকল জেল জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন আর মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা করে তিনি জাতিকে চূড়ান্ত বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। তাই তিনি বাঙালি জাতির জনক, স্বাধীনতার স্থপতি।

মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্ত ঝরা দিনগুলোতে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল দেশ মাতৃকার স্বাধীনতার সূত্রে। জাতীয় ঐক্যের অভূতপূর্ব নিদর্শন ছিল সেই দিনগুলো। ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী-কৃষক-শ্রমিক যুবক সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণে সফল জনযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন হয়েছে সুমহান বিজয়। আর এখানেই নিহিত আছে জাতির পিতার ঐতিহাসিক সাফল্য। স্বাধীনতার ডাক দিয়ে একটি নিরস্ত্র জাতিকে তিনি সশস্ত্র জাতিকে রূপান্তরিত করেছিলেন। সেদিনকার শ্লোগান ছিল– 'জাগো

জাগো বাঙালি জাগো', 'পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'জয় বাংলা' ইত্যাদি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের জবাবেই আন্দোলনের অস্ত্র পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল, বিজয় অর্জন করছিল মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বরে। এভাবেই বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে।

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বীরের বেশে তাঁর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১০ই জানুয়ারি রাতেই তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরের দিন ১১ই জানুয়ারি দেশের সরকার কাঠামো পরিবর্তন করে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধুই হন দেশের প্রধানমন্ত্রী। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ ছুটে আসেন বাংলাদেশে স্বাধীনতার স্থপতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে দেখার জন্য। শুভেচ্ছা নিয়ে এবং সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে।

বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে কাজী নজরুল ইসলাম কবিতা লিখে বিদ্রোহী কবির উপাধি পেয়েছেন। তিনি জাতিকে শিকল ভাঙ্গার কবিতা ও গান শুনিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে পরাধীনতার শিকল ভাঙতে বাঙালি জাতি হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। শেষাবধি তিনি পরাধীনতার শিকল ভেঙ্গেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন মুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এটি বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় অর্জন। কিউবার সংগ্রামী নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমি হিমালয় দেখিনি; কিন্তু আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় তিনি হিমালয়ের মত।"

বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ও দেশের মানুষের মনকে জয় করেছেন, জয় করেছেন নির্যাতিত-নিপীড়িত এবং শোষিত বিশ্ববাসীর হৃদয়ও। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালির প্রাণের মানুষ। বাংলাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন। তিনি আজীবন বাঙালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। বাংলাদেশের মানুষের জন্যই তিনি জেল-জুলুম-অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন। জীবন দিয়ে বাঙালির মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। বাঙালি জাতিকে এবং বাংলার মানুষকে তিনি বিশ্বাস করতেন। কোন বাঙালি তাকে খুন করবেন একথা তিনি ভাবেন নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৫ই আগস্টের কালোরাত্রে তিনি সপরিবারে নিহত হলেন বিপদগামী একদল বাঙালি সেনা অফিসারের হাতে। বিশ্ববাসীকে কাঁদিয়ে চলে গেলেন আমাদের বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা আজ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি গত ক'বছরে বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে কাজ করেছেন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার রূপকল্প আজ বাস্তবায়নাধীন। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ স্বপ্ন নয় বাস্তব। বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন "সোনার বাংলা" আজ বাস্তবায়নের পথে।

অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ ও একজন রাজনীতির কবি

খালিদ বিন মনসুর
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া

বর্তমান বাংলাদেশ প্রাচীনকালে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বঙ্গ, বরেন্দ্র, সমতট, হরিকেল, রাঢ় প্রভৃতি অঞ্চল। এসব অঞ্চল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজপরিবারের দ্বারা শাসিত হয়েছে। প্রতিটি রাজবংশই ছিল কোন না কোন ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং রাজপরিবার সে ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে। ফলশ্রুতিতে সে ধর্ম লাভ করেছে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা। এভাবেই সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন হয়েছে যুগে যুগে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচারের ইতিহাসও বেশ পুরানো।

পাল রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। আবার সেন আমলে এই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাই হয় নির্যাতিত, নিপীড়িত। ত্রয়োবিংশ শতাব্দীর শুরুতে যখন ভিনদেশী মুসলিমদের দ্বারা সেন রাজবংশের পতন ঘটে, তখন এ অঞ্চলের অধিকাংশ নিপীড়িত মানুষই ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ধর্মান্তরিত হওয়ার পিছনে যতটা না আদর্শ কাজ করেছে, তার চেয়ে প্রকট ছিল নিরাপত্তা লাভ। এর ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত। ১৯৫৭ সালে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় নতুন যুগের সূচনা। বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে পরিণত হয় বৃটিশ কলোনিতে। প্রায় ৫০০ বছর ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা মুসলমানদের সাথে দূরত্ব বাড়তে থাকে সিংহাসনের। পরিবর্তিত দৃশ্যপটে প্রভাব বৃদ্ধি হতে থাকে হিন্দুদের। ধর্মভিত্তিক এ বিভেদ বাড়তে বাড়তে এক সময় তা পরিণত হয় বিদ্বেষের বটগাছে। ফলশ্রুতিতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। রক্তে রঞ্জিত হয় সমগ্র ভারতবর্ষ। বৃটিশদের হাত থেকে মুক্তির আন্দোলনে আসন গেড়ে বসে ধর্মীয় উগ্রবাদ, যার ফলাফল পাকিস্তান ও ভারত নামের দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম। বর্তমান বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয় পাকিস্তানের। ধর্ম দেশ পেলো বটে, মানুষের ভাগ্য রয়ে গেল অপরিবর্তিত। পাকিস্তান জন্মলাভের পর এ অঞ্চল প্রত্যক্ষ করে একই সাথে ভৌগোলিক ও ধর্মীয় বৈষম্য। এ বৈষম্য গিয়ে আঘাত হানে বাংলার সংস্কৃতিতে। ধর্মান্ধতা পরিণত হয় চরম উগ্রবাদে।

পূর্বের আলোচনা থেকে এতটুকু স্পষ্ট যে, ১৭৫৭ সালের আগে এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হতো রাজাদের দ্বারা। রাজারাও ক্ষমতা দখল করতো যুদ্ধের মাধ্যমে। 'জোর যার মুল্লুক তার' এ নীতিতেই পরিচালিত হতো দেশ। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এ অঞ্চলের মানুষ ভোটাধিকার পেলেও তা প্রয়োগ করার সুযোগ ছিল সীমিত। নতুন দেশ পাকিস্তান হওয়ার পরও তার কোন পরিবর্তন ঘটে না।

এ অঞ্চলের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এক তরুণ প্রাণ, আমাদের গণতন্ত্রের ইতিহাসও তার আন্দোলনের ইতিহাস। তিনি আর কেউ নন, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। ছোটবেলা থেকেই তার চরিত্রে মানবিকতার গুণাবলী প্রকাশিত হয়। তিনি ছিলেন, দরিদ্রদের জন্য নিবেদিত প্রাণ। যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেও তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। এরই ধারাবাহিকতায় জড়িয়ে যান রাজনীতিতে। ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের ছাত্র থাকার সময় তৎকালীন মূখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আসেন স্কুল পরিদর্শনে। কংগ্রেসের নির্দেশে হিন্দু ছাত্ররা এতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলে শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি তাঁর যাদুকরী নেতৃত্বের দ্বারা হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের ছাত্রদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করেন। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "এ খবর শুনে আমি আশ্চর্য হলাম। কারণ আমার কাছে তখন হিন্দু-মুসলমান বলে কোন জিনিস ছিল না।" তৎকালীন পূর্ববঙ্গের নিপীড়িত মুসলিম সমাজের জন্য তিনি স্বপ্ন দেখেন একটি স্বাধীন দেশের। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র অর্জনে পালন করেন বলিষ্ঠ ভূমিকা।

এই তরুণ যুবকই আবার আশাহত হন মুসলিম লীগের শাসকবর্গের অন্যায়, অবিচারে। এ অঞ্চলের মানুষের বাংলা ভাষার অধিকার যখন কেড়ে নেয়া হয়, ইতিহাস পুণরায় দেখতে পায় প্রতিবাদী মুজিবকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র শেখ মুজিব ছাত্র সমাজকে সাথে নিয়ে জড়িয়ে পড়েন ভাষার আন্দোলনে। গড়ে তোলেন ছাত্রলীগ, যা এ অঞ্চলের সবচেয়ে পুরানো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তাঁর সক্রিয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকায় এ অঞ্চলে প্রথম জন্মলাভ করে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল। শেখ মুজিবুর রহমান দলটির যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠানটির ছাত্রত্ব হারান। ১৯৪৮ সালের শুরু থেকে কারাবাস তার জীবনের নিত্য নৈমত্তিক ঘটনাতে পরিণত হয়।

আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেছেন, "Democracy is a government of the people, by the people, for the people." এই নীতির আলোকেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। জনগণের দাবিই হয় দলটির রাজনৈতিক এজেন্ডা। জনগণকে সাথে নিয়ে বাংলা ভাষা রক্ষার দাবিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। এর সম্মুখ সারিতে নেতৃত্ব দিয়ে বারবার কারাবরণ করতে হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ সামনে থেকে নেতৃত্ব প্রদান করে। ফলস্বরূপ শেখ মুজিবুর রহমান সহ শীর্ষ নেতৃত্বের সবাই কারাবন্দী হন। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট যে ২১ দফা ইশতেহার ঘোষণা করে তার প্রথম দফাই ছিল বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার প্রতিশ্রুতি। ইশতেহারটি

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি দাবিই জনগণের অধিকার সম্বলিত, যা জনগণের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। নির্বাচনে ভূমিধ্বস জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট। জনগণের অধিকারের সাথে সামঞ্জস্য না থাকায়, যে মুসলিম লীগ মাত্র কয়েক বছর আগে পাকিস্তান এনেছিল, জনগণ তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেয় আস্তাকুড়ে। নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান দায়িত্ব গ্রহণ করেন কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ মন্ত্রিসভা মাত্র ৫৪ দিন স্থায়ী হয়। মন্ত্রিত্ব থেকে বঞ্চিত হলেও থেমে থাকেনি শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক পথচলা। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে প্রতিনিয়তই উপস্থিত হতে থাকেন শাসকগোষ্ঠীর সামনে। সাম্প্রদায়িকতার বেড়াজাল হতে মুক্ত হতে দলের নাম পরিবর্তন করে রাখেন- 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ'। ১৯৫৬ সালে প্রাদেশিক সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্তির পর ঝাঁপিয়ে পড়েন পুরো কর্মস্পৃহা নিয়ে। কারিগরি শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেন। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার বস্ত্র ও পাটশিল্পের উন্নয়নে "টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট" এর পরিধি বড় করতে তা পুরান ঢাকার নারিন্দা থেকে তেজগাঁও এ স্থানান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

এ মহান নেতা ক্রমাগত অনুভব করছিলেন যে, জনগণের সাথে তাঁর দূরত্ব বেড়ে চলছে। তাই ১৯৫৭ সালে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দলীয় কাজে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। ১৯৫৮ সালে সামরিক সরকার ক্ষমতা দখল করলে জনগণের ভাগ্যে নেমে আসে ঘোর অমানিশা, গণতন্ত্র হয় ভূলুণ্ঠিত। যেখানে প্রায় সকল রাজনৈতিক শক্তি তৎকালীন সরকারের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়, সেখানেও একজন অকুতোভয় প্রাণ শেখ মুজিব লড়ে যান মাথা উঁচু করে। বাবার কাছ থেকে যে, "Honesty of purpose and sincerity of purpose" এর শিক্ষা পেয়েছেন, তা থেকে একচুলও বিচ্যুত হননি কোনদিন। তিনি ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনেও জনগণের পক্ষে মাঠ দাপিয়ে বেড়িয়েছেন।

এতদিন পর্যন্ত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে কোন নির্দিষ্ট দাবি দাওয়াকে কেন্দ্র করে। জনগণের পূর্ণাঙ্গ মুক্তির রূপরেখা ছিল অনুপস্থিত। অবশেষে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে উপস্থিত হন সর্বসাধারণের মুক্তির দাবি "ছয় দফা" সনদ নিয়ে। জনসমর্থন বঞ্চিত পাকিস্তানের সব রাজনৈতিক দলই ছয় দফা দাবি প্রত্যাখ্যান করে। শাসক দলের আক্রোশ পাহাড় হয়ে উপস্থিত হয় শেখ মুজিবের সামনে, ভোগ করতে থাকেন টানা কারাবাস। ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি করে তাঁকে সামরিক বিচার ট্রাইবুন্যালের মুখোমুখি করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশ হয়ে উঠে এক উত্তাল সমুদ্র। এ প্রিয় নেতার মুক্তির দাবিতে রাজপথ হয় জনারণ্য। অবশেষে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান জনগণের প্রাণের নেতা। ২৩ ফেব্রুয়ারি পল্টনের জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তন হয়। আইয়ুব খানের পদত্যাগের পর ক্ষমতা দখল করেন জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান। 'Legal Framework Order' জারি করে নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে

ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এর আলোকে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদে ৩১৩ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮ আসনে জয়লাভ করে সমগ্র পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু চক্রান্তকারী পাকিস্তানি গোষ্ঠী জনগণের দলকে ক্ষমতায় বসতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। শুরু করে নানরকম টালবাহানা।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ৭ মার্চ, ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ প্রদান করেন, যা ইউনেস্কো কর্তৃক 'মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার' এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জাতিকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি একচেটিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে বিরত থাকেন। আবার মার্টিন লুথার কিং এর মতো 'I have a dream' বলে থেমে যাননি, তিনি জাতিকে দেখিয়েছেন স্বপ্ন পূরণের পথ। তিনি যুদ্ধের ডাক দেননি, কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন। জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, "ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।"

২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা শুরু হলে জনগণের কথা ভেবে নিজের মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এ মহান নেতা। জাতিকে বিভ্রান্তির কবল থেকে রক্ষা করতে গ্রেফতার হওয়ার আগ পর্যন্ত অবস্থান করেছেন ধানমন্ডির নিজ বাড়িতে। ৫ এপ্রিল, ১৯৭১ এ আন্তর্জাতিক 'নিউজ উইক' ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'রাজনীতির কবি' আখ্যায়িত করে একটি প্রবন্ধ রচনা করে। তিনি ১০ এপ্রিল গঠিত মুজিবনগর সরকারে কারান্তরীন থাকা অবস্থায় বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ সুসজ্জিত প্রশিক্ষিত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একজন মুজিবের অনুপ্রেরণায়। এ যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয় বাংলাদেশের হিন্দু জনগোষ্ঠী।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে প্রত্যাবর্তন করে একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে মনোনিবেশ করেন। মাত্র নয় মাসে জনগণকে উপহার দেন একটি আদর্শ ও যুগোপযোগী সংবিধান। এতে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমেই যাত্রা আরম্ভ করে বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণ যে ম্যান্ডেট আওয়ামী লীগকে দিয়েছিল, তিনি চাইলেই এর ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করতে পারতেন। কিন্তু গণতন্ত্রমনা মুজিব পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আবারো জনগণের মতামত নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করলেন। ফলে ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচন। এবার আরো বেশি জনসমর্থন (৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩ আসন) নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এ সরকারের শাসনামলে সংখ্যালঘুদের প্রতি সব ধরণের অত্যাচার বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় দুই হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালি প্রথম লাভ করে জনগণের শাসন।

সদ্য স্বাধীন ধ্বংস প্রায় দেশ পরিচালনায় আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে থাকে। ফলে শাসনব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ অবস্থায় জনমুখী শেখ মুজিব জনগণের কল্যাণে সাহসী পদক্ষেপ নিতে একটুও দ্বিধা করেননি। তিনি ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ সহ সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করেন। আওয়ামী লীগ, সিবিপি ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর) ও জাতীয় লীগের সমন্বয়ে গঠন করেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)। শেখ মুজিবই সম্ভবত প্রথম রাষ্ট্রনায়ক, যে নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় জনগণের কল্যাণে চারটি প্রধান দলের সমন্বয়ে সরকার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

জাতি হিসেবে আমাদের জন্য অতি লজ্জার বিষয় যে, এ দেশেরই মুষ্টিমেয় কুচক্রীমহলের হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে নিহত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরই সাথে থেমে যায় এক অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা। ১৯৯১ সালের পর এসে গণতন্ত্র পুণরায় যাত্রা শুরু করেছে বটে, তবে স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে এসেও আজ বাংলাদেশ যে সাম্প্রদায়িক নৃশংসতা পর্যবেক্ষণ করছে তাতে একজন শেখ মুজিবের অভাব সমগ্র বাঙালির হৃদয়ে হাহাকার হয়ে দেখা দিয়েছে যা কখনোই পূরণীয় নয়।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশঃ সমার্থক দুটো শব্দ

মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা

বাঙালির সমষ্টি চেতনার বড় অভাব ছিল। কোনদিন স্বাধীন ছিল না। পাল বা সুলতানি আমল এমনকি যাকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব বলা হয় তার আমলেও নয়। আর নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাঙালি ছিলেন না। লর্ড ক্লাইভ লিখেছিলেন, পলাশী যুদ্ধের আশেপাশে যে সব কৃষক মাঠে চাষ করছিল তারা যদি নবাবের পক্ষ হয়ে আক্রমণ করত লাঠি সোটা নিয়ে তাহলেও ইংরেজরা জয়ী হতে পারত না। অর্থাৎ বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ ছিল না।

বাঙালি চিন্তাবিদরা ব্যক্তি স্বাধীনতার দর্শন, মার্কসবাদ, ইউরোপীয় মানবতাবাদ এর ধারাবাহিকতার বৃত্তান্ত চর্চা করেছেন। কিন্তু বাঙালির বা বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তা ও স্বাধীনতার জন্য তেমন উল্লেখযোগ্য কোন চিন্তাভাবনা করেননি। প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরীর মতো স্বল্প কয়েকজন ব্যক্তি বাঙালিদের স্বার্থের কথা বললেও বাঙালির স্বাধীনতার কথা তেমন উচ্চ কণ্ঠে কেউ বলেননি।

নিজেদের 'বাঙালি জাতি' বলে উল্লেখ করলেও রবীন্দ্রনাথ কখনো কল্পনাতেও ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা জাতি বা রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করেননি। নজরুল ইসলাম দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বাধীনতার কথা বললেও 'ভারত লক্ষ্মী' বা 'ভারত জননী'র প্রতি আনুগত্য ছিল অম্লান। তাঁর স্বপ্ন 'ভারত মহাভারত' হবে এবং যেদিন পীড়িত মানুষের প্রতিকারে প্রাণে সাড়া জাগবে 'মহামানুষের সেদিন সৃষ্টি হবে।' বাংলার স্বাধীনতার কথা কেউ আগে উচ্চারণ করেনি। বাংলা ভাষায় স্বাধীনতার কথা লেখা হলেও সে স্বাধীনতা বাংলার স্বাধীনতা নয়। বাংলার স্বাধীনতার কথা ও স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৪৭ সালের ৩ জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত ভাগের নীতি ঘোষণা করেন। এ সময় জুন মাস থেকেই পত্রিকায় খবর বের হতে থাকে পাকিস্তানের নেতারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চান। বেশ কয়েকজন বাঙালি বুদ্ধিজীবী এর বিরোধিতা করে প্রবন্ধ লেখেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কাজী মোতাহের হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ, ড. এনামুল হক, আব্দুল হক, ফররুখ আহমেদ প্রমুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে সময় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১১ মার্চের হরতালে পুলিশ লাঠি চার্জ করে এবং অনেককে গ্রেফতার করে। তরুণ শেখ মুজিবুর রহমানকেও গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে খাজা নাজিমুদ্দিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে ৮ দফা চুক্তি করেন। সরকারের পক্ষে খাজা নাজিমুদ্দিন ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কামরুদ্দিন আহমদ

চুক্তি সই করেন। চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে জেলে গিয়ে বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানকে চুক্তি দেখিয়ে আনেন শামসুল হক ও অলি আহাদ।
জিন্নাহ ১৯ মার্চ ১৯৪৮ সালে প্রথমবারের মতো বাংলার মাটিতে আসেন। ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেন এক নাগরিক সংবর্ধনাতে। ২৪ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সম্মানে আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে কার্জন হলে জিন্নাহ বলেন, উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা। সেখানে বঙ্গবন্ধুসহ উপস্থিত ছাত্র নেতারা "না, না" বলে চিৎকার করে প্রতিবাদ করেন।

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা অর্থাৎ নিম্ন আয়ের কর্মচারীরা কয়েকটি দাবি জানিয়ে এক মাসের নোটিশে ধর্মঘট শুরু করে। এ সময় ছাত্রলীগের নেতারা তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা করেন। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ২৭ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধুকে ১৫ টাকা জরিমানা করা হয়। বঙ্গবন্ধু জরিমানা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। শাস্তি পাওয়া অনেক ছাত্রই মুচলেকা দিয়ে শাস্তি প্রত্যাহার করে নেন। শাস্তি প্রত্যাহারের দাবিতে বঙ্গবন্ধু ভিসির বাড়িতে ধর্মঘট শুরু করেন। ভিসি পুলিশকে খবর দিলে গ্রেপ্তার হন বঙ্গবন্ধু।

শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া পান ২৭ জুন ১৯৪৯ সালে। এ দিকে ২৩ জুন ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। আওয়ামী মুসলিম লীগ মানে জনতার মুসলিম লীগ, আরেকটি মুসলিম লীগ আছে সেটি সরকারি মুসলিম লীগ। সভাপতি হন মওলানা ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক টাঙ্গাইলের শামসুল হক, আর যুগ্ম সম্পাদক হন শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু তখন কারাবন্দি ছিলেন, ছাড়া পান ২৭ জুন। কথিত আছে বঙ্গবন্ধুর জন্য যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদ সৃষ্টি হয় তিনি যখন ১৯৫৩ সালে দলের সাধারণ সম্পাদক হন তখন আবার যুগ্ম সম্পাদক পদ বিলুপ্ত করা হয়। বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন ১৯৬৬ সালে।

তৎকালীন সময়ে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের দুটি গ্রুপ ছিলো। সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেম ছিল প্রগতিশীল। অন্যদিকে মওলানা আকরাম খাঁ নাজিমুদ্দীনের গ্রুপ ছিল রক্ষণশীল। বঙ্গবন্ধু ছিলেন সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেম গ্রুপের রাজনীতির সমর্থক। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর পূর্ব বাংলা পার্লামেন্টের নেতা নির্বাচিত হন নাজিমুদ্দিন। তখন সোহরাওয়ার্দী ও হাসিম গ্রুপের নেতা কর্মীরা দলে কোনঠাসা হয়ে পড়ে। তারা তখন 'মুসলিম লীগ কর্মী শিবির বা মুসলিম লীগ' ওয়ার্কাস নামে ১৫০ নম্বর মোগলটুলিতে রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরু করেন।

পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লিয়াকত আলী খান। জিন্নাহর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন গুজরাটের অন্যদিকে লিয়াকত আলী খান ছিলেন ভারতের উত্তর প্রদেশের। যাদের সাথে নবসৃষ্ট রাষ্ট্র ও মানুষের একমাত্র ধর্ম ছাড়া তেমন কোন যোগসূত্র ছিল না। জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মারা গেলে খাজা নাজিমুদ্দীন হন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল, পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন নুরুল

আমিন। লিয়াকত আলী খান ১৯৫১ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে খাজা নাজিমুদ্দীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শুরু হতে থাকে পাকিস্তানে ক্যু এর রাজনীতি। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ খাজা নাজিমুদ্দীনকে বহিষ্কার করেন। প্রধানমন্ত্রী করা হয় মোহাম্মদ আলী বগুড়াকে। তিনি ছিলেন মার্কিনপন্থী। মোহাম্মদ আলী বগুড়া ছিলেন সে সময় পাকিস্তানের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত। গোলাম মোহাম্মদ সোহরাওয়ার্দীকে বলেন তাকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী করা হবে, তবে এখন মোহাম্মদ আলী বগুড়ার মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে। আইনমন্ত্রী হিসেবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে একটি সংবিধান বানাতে হবে। অথচ মোহাম্মদ আলী বগুড়া ছিলেন রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দীর শিষ্য।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সমগ্র পাকিস্তানের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছিলেন আর বঙ্গবন্ধু তখন পূর্ব বাংলা চষে স্বাধিকারের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে যাচ্ছিলেন। এটা ছিল গুরু শিষ্যের এক ধরণের কৌশল। কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের প্রভাব ধরে রাখার জন্য। কিছুদিন পর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদকে সরিয়ে ইস্কান্দার মির্জাকে গভর্নর জেনারেল করা হয়। ইস্কান্দার মির্জা গোলাম মোহাম্মদকে সরিয়ে নিজে গভর্নর জেনারেল হন। তারপর প্রধানমন্ত্রী করা হয় চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে। সোহরাওয়ার্দী এবারো প্রধানমন্ত্রী হতে পারলেন না। এক বছর পর ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানের ৫ম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। ক্ষমতায় আরোহন করে শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দী ১৯৫৯ সালের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। নির্বাচনের আশঙ্কায় ইস্কান্দার মির্জা ১৩ মাসের মাথায় হোসেন সোহরাওয়ার্দীর সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করেন।

১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার ভাসানী-ফজলুল হক-শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট বিপুল বিজয় লাভ করে। মুসলিম লীগ ধ্বসে যায় চিরতরে। ফজলুল হক হোন প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পান শেখ মুজিবুর রহমান। যুক্তফ্রন্টের বিজয় মেনে নিতে পারেননি কেন্দ্রীয় সরকার। ভারত শাসন আইনের ৯২(ক) ধারায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার। বন্দি করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানসহ অসংখ্য রাজনীতিবিদকে।

সোহরাওয়ার্দী সরকারের পতনের পর প্রধানমন্ত্রী হয় ইসমাইল ইব্রাহিম চুন্দ্রিগড় মাত্র ২ মাসের জন্য। তারপর প্রধানমন্ত্রী হন ফিরোজ খান নুন। ইস্কান্দার মির্জা গভর্নর জেনারেল হিসেবে আইয়ুব খানকে মনোনীত করেন। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্যু করে ইস্কান্দার মির্জাকে সরিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন। মার্শাল 'ল জারি করা হয় সমগ্র দেশ জুড়ে। গ্রেপ্তার হয় বঙ্গবন্ধু, সোহরাওয়ার্দীসহ আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ। শুরু হয় স্বৈরাচারের দশ বছর।

এর মাঝে আওয়ামী লীগে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে ভাঙন ধরে। ভাসানী আলাদা দল গঠন করে যা পরিচিতি পায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ নামে।

পরবর্তীতে ন্যাপ আবার দু'ভাগে বিভক্ত হয়; ভাসানি (চীনপন্থী) ও মোজাফ্ফর (মস্কোপন্থী)। আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। রাজনীতিবিদদের উপর 'এবডো' প্রয়োগ শুরু করেন। এবডো মানে ইলেকটিভ বডি ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার। বঙ্গবন্ধুর উপরও এবডো প্রয়োগ করা হয়। প্রথমে সোহরাওয়ার্দীর উপর এবডো প্রয়োগ করা হয়নি, কিন্তু পরে সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে এবডো প্রয়োগ করা হয়।

আইয়ুব খান রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের উপর এবডো প্রয়োগ করে এক উদ্ভট গণতন্ত্র চালু করেন। যার নাম মৌলিক গণতন্ত্র বা বেসিক ডেমোক্রেসি। ক্ষমতায় এসে আইয়ুব খান ৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল করেন, তার পরিবর্তে সামরিক জান্তা প্রণীত কতিপয় আদেশ, নির্দেশ, বিধি-বিধানকে সংবিধান নাম দেন। পরবর্তীতে যা ৬২ সালের সংবিধান নামে অভিহিত হয়। এই তথাকথিত সংবিধানদ অনুযায়ী সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংবিধানের অধীনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়।

১৯৫৯ সালের ২৫ অক্টোবর আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ জারি করেন। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে পূর্ব পাকিস্তানে ৪০ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৪০ হাজার, মোট ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী বা বিডি ডেমোক্রেট নির্বাচিত হন। যারা ছিলেন দেশের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ, প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

এ রকম অবস্থায় রাজনীতি যখন অন্ধকূপে, পাকিস্তান তখন ঘোর অমানিশা। কিছুদিন পর শুরু হয় ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন। দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে সে আন্দোলনের বারুদ। সামরিক জান্তা কঠোর হস্তে দমন পীড়ন চালায় আন্দোলনকারীদের উপর।

রাজনীতি যখন হিমঘরে তখন ঘরোয়া বৈঠকই ছিল রাজনীতির সূতিকাগার। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর মারা যান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। বঙ্গবন্ধু একা হয়ে গেলেন কিন্তু ভেঙ্গে পড়লেন না। পরের বছর তিনি আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন ঘটান। বঙ্গবন্ধু আবারো দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তার পরের বছর ১৯৬৫ সালে শুরু হয় পাক-ভারত যুদ্ধ। ১৭ দিনের যুদ্ধে পাকিস্তান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। সে সময় পূর্ব বাংলা ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। ভারত সহজেই পূর্ব বাংলা দখল করে নিতে পারতো। এ থেকেই বোঝা যায় পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলা থাকুক বা না থাকুক তাতে পাকিস্তানের কিছু আসে যায় না। এর থেকেই জন্মলাভ করে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬ দফা।

১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেরুয়ারি বঙ্গবন্ধু লাহোরে বিরোধী দলের এক সম্মেলনে প্রথম ৬ দফা উত্থাপন করেন। ইতোপূর্বে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় ভারতীয় উপহাইকমিশনে শশাঙ্ক ব্যানার্জীর মাধ্যমে জহরলাল নেহেরু সরকারের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন ১৯৬২ সালের বিভিন্ন সময়ে। বঙ্গবন্ধু এর মাঝে আগরতলা যান, সেখানে দেখা করেন ত্রিপুরার

প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শচিন্দ্রলাল সিংহের সাথে। বঙ্গবন্ধুর একটি চিঠি পৌঁছে দেন জহরলাল নেহেরুকে।

পরিকল্পনা ছিল বঙ্গবন্ধু লন্ডনে গিয়ে সরকার গঠন করবেন। মানিক মিয়াসহ অনেকে দেশের ভিতরে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখবে। '৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু যখন ৬ দফা উত্থাপন করেন, এরপর বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে প্রায় ১২টি মামলা হয়। ১৯৬৬ সালের ৮ মে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর এক নাগাড়ে দেড় বছর কারাবন্দি করে রাখা হয়। মুক্তি পান '৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি, পরের দিন ১৮ জানুয়ারি জেল গেটে শেখ মুজিবুর রহমানকে আবার গ্রেফতার করা হয়। আসলে এসবই ছিল আইয়ুব খানের চাল। '৬৫ সালের মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে আইয়ুব খান ৭০ এর নির্বাচনেও অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করছিলেন। আর সে মোতাবেক বঙ্গবন্ধুকে পথের কাঁটা মনে করে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়।

৬ দফা দাবি অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানের যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তাকে তীব্রতর করে তোলে। এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গড়ে ওঠে, যা আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তোলে। দুর্বার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ২০ জানুয়ারি ঢাকায় পুলিশের গুলিতে আসাদ নিহত হয়। ২৪ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে নবকুমার ইন্সটিটিউটের ছাত্র মতিউর নিহত হলে আইয়ুব খানের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ৬৯ সালের ১৫ ফেরুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হক সামরিক বাহিনীর গুলিতে নিহত হন, ১৮ ফেরুয়ারি ড. শামসুজ্জোহা নিহত হন। এ অবস্থায় আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠকের ডাক দেন। শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত করার চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি নিয়ে যেতে নিষেধ করেন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। তিনি প্যারোলে মুক্তির কথা শুনে অনুমতি নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে যান বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে। সেখানে গিয়ে বলেন, "তুমি প্যারোলে যেওনা, বাংলার মানুষের সাথে এটা তোমার বেঈমানী হবে।" বঙ্গবন্ধু প্যারোলে যাননি, গোলটেবিল বৈঠকেও যোগ দেননি। বঙ্গবন্ধুকে জনতা ২১ ফেরুয়ারি মুক্ত করে আনে, ২৩ ফেরুয়ারি তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ। ক্ষমতায় আসেন ইয়াহিয়া খান। ক্ষমতায় এসে ইয়াহিয়া খান লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার জারি করে। এর অধীনে ৭০ এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পর ১২০ দিনের ভেতর জাতীয় পরিষদ পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করবে বলা হয় LFO তে।

৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ ১৬৯ আসনের বিপরীতে ১৬৭ আসনে জয়লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ ২৮৮ আসনে জয়ী হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে ইয়াহিয়া ভুট্টো চক্র লারকানা ষড়যন্ত্র সহ নানা লীলনকশা করতে থাকে। বঙ্গবন্ধু ৬ দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের

সংবিধান রচনা করার ব্যাপারে অনড় ছিলেন। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। প্রতিবাদে ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩রা মার্চ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়। ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান রেডিওর ভাষণে ২৫ মার্চ অধিবেশন আহ্বান করেন।

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণ দেন রেসকোর্স ময়দানে। ১৮ মিনিটের ভাষণে বঙ্গবন্ধু ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার পাশাপাশি স্বাধীনতার ডাক দেন। তিনি বলেন, "এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম।"

১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ১৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সাথে বৈঠক করেন। ২২ মার্চ বঙ্গবন্ধু, ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর মধ্যে বৈঠক হয়। ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস, বঙ্গবন্ধু সেদিন নিজ বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা তোলেন। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। রাতে পাকিস্তানের মাটিতে পা দিয়েই টিক্কা খানকে নির্দেশ দিলেন পূর্ব পাকিস্তানকে কবরস্থান বানিয়ে দাও!

বঙ্গবন্ধু রাত ১২টা ৩০ মিনিটে ধানমন্ডির বাসভবনে গ্রেপ্তারের পূর্বে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। যা সংবিধানের ৫ম তফসিলভুক্ত। এর উপর ভিত্তি করে গঠিত হয় ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ গঠিত হয় মুজিবনগর সরকার।

মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ। এভাবেই বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে পরিচালিত হতে থাকে মুজিবনগর সরকার।

দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের মাধ্যমে, ৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে জন্মলাভ করে বাংলাদেশ। ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে লন্ডন হয়ে দেশে ফিরেন বঙ্গবন্ধু। লক্ষ জনতা প্রিয় নেতাকে গ্রহণ করতে তেজগাঁও বিমানবন্দরে যান। দেশে ফিরেই তিনি লেগে যান যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গঠনে।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায়, ১৩৬তম দেশ হিসেবে জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তি এবং মাত্র ৯ মাসে দেশকে সংবিধান উপহার দেন, যা বাহাত্তরের সংবিধান নামে পরিচিত। তিনি বাংলাদেশের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন। গ্যাসফিল্ড জাতীয়করণ, শান্তি-মৈত্রী চুক্তি, ন্যামে যোগদান, জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দান করে বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। তাই কবি বলেছেন-

টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে
আমাদের গ্রামগুলো তোমার সাহস নেবে
নেবে ফের বিপ্লবের দূরন্ত প্রেরণা.......

স্বাধীনতা ও পুনর্গঠন: বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

মোহাম্মদ তৌফিকুর রহমান
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সারাটি জীবন উৎসর্গ করেছেন এই বাংলার মাটি ও মানুষের জন্য। তাঁর আজন্ম লালিত স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে। এদিন বিশ্বের মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামক নবীন এক দেশ আত্মপ্রকাশ করে। জন্মলাভ করে স্বাধীন এক জাতিরাষ্ট্র। নবীন এই দেশটির নামকরণও করেছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজে। 'বঙ্গবন্ধু' ও 'বাংলাদেশ' একে অন্যের পরিপূরক, একে অন্যের প্রতিশব্দ।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্ব ধর্মকে জাতীয়তার মূল ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। পাকিস্তানের আত্মপ্রকাশের পর ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কাছে ধর্মভিত্তিক দেশবিভাগ প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে। এক সময় বঙ্গবন্ধু ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাকে প্রত্যাখ্যান করে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাকে তুলে ধরলেন বাঙালির সামনে। বাঙালি খুঁজে পেল আপন ঠিকানা।

১৯৪৮ সালে বঙ্গবন্ধু মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানান। ২ মার্চ ১৯৪৮ তিনি সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১ মার্চ বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হলেও ১৫ মার্চ সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ২৩ জুন ১৯৪৯ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ যাত্রা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৫২ এর শুরুর দিকে ভাষা আন্দোলন চরম রূপ ধারণ করে। ছাত্রদেরকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এমনকি জেলে থেকেও তিনি ছাত্রদেরকে নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। ২১ শে ফেরুয়ারির রক্তাক্ত বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ভাষা আন্দোলন দুর্বার গতি লাভ করে। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ভাষা আন্দোলন ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধের জন্ম দেয়। বঙ্গবন্ধু ছিলেন এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

ভাষা আন্দোলনের সাফল্য বাঙালিদের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর উত্থানকে আরো ত্বরান্বিত করে। সারা বাংলার আনাচে কানাচে শেখ মুজিবের নাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫৩ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের আগে আওয়ামী মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্টে যোগদান করে। এই নির্বাচনটি বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মুসলিম লীগের

সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে চিরতরে প্রত্যাখ্যান করে অসাম্প্রদায়িকতাকে বেছে নেয় বাংলার মানুষ। গোপালগঞ্জ আসন থেকে জয়লাভ করেন বঙ্গবন্ধু, মন্ত্রিসভায়ও যোগদান করেন। কেন্দ্রীয় সরকার পরবর্তীতে তুচ্ছ কারণে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে অপসারণ করে।

১৯৫৫ সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' এর নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' রাখা হয়। এতে করে আওয়ামী লীগ এর অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে। দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এ সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন শেখ মুজিব। অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণকারী একমাত্র দল হিসেবে পূর্ব বাংলার মানুষের মনে স্থান করে নেয় আওয়ামী লীগ। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন। অল্প কিছুদিন পরেই গ্রেপ্তার হন বঙ্গবন্ধু।

ষাটের দশকের শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধু দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু করেন। যার একটি ছিল তাঁর দলকে পুনর্গঠিত করা। অন্য উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করা। প্রথম উদ্দেশ্যটি খুব দ্রুত অর্জিত হলেও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে তাঁর সময় লেগেছিল প্রায় এক যুগ।

১৯৬১ সালে বিশিষ্ট ছাত্র নেতারা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' গঠন করেন। এই সংগঠন তৈরিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন শেখ মুজিব। এই সংগঠনের কাজ ছিল গোপনে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য ছাত্রদেরকে সংগঠিত করা। সিরাজুল ইসলাম খান, আব্দুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদ ছিলেন এই সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এর কাজ ছিলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যাবতীয় নীতি-কৌশল প্রণয়ন করা এবং স্বাধীকার আন্দোলনকে সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাওয়া।

২৫ জানুয়ারি ১৯৬৪ তারিখে আওয়ামী লীগ ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) ত্যাগ করে এবং বঙ্গবন্ধু পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। দায়িত্ব গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু প্রথমে চলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরোধে তৎপর হোন। এরপর তিনি সামরিক শাসন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯৬৫ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু আইয়ুব বিরোধী প্রচারণায় শামিল হন। নির্বাচনের আগেই তিনি গ্রেপ্তার হন এবং নির্বাচনের পরে ছাড়া পান।

১৯৬৬ সালের ফেরুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু বাঙালির ম্যাগনাকার্টা নামে পরিচিত ছয় দফা দাবি পেশ করেন। সামরিক শাসনের ভিত নাড়িয়ে দেয়া এই ছয় দফা দাবির মূলকথা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। পূর্ব পাকিস্তানে অল্প দিনের মাঝেই ছয় দফা অভূতপূর্ব সমর্থন অর্জন করে। বঙ্গবন্ধু এ সময়ে দলের সভাপতি নির্বাচিত হন।

৩ জানুয়ারি ১৯৬৮ তারিখে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মূল আসামী করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামক রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করে। তাদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগ আনা হয়। এ মামলা দায়েরের আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু অন্য একটি মামলায় জেলে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু এবং অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে

জনরোষে ফেটে পড়ে সমগ্র পূর্ব বঙ্গ। ক্যান্টনমেন্টে আটক বঙ্গবন্ধু এ সময় হয়ে উঠেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা।
তীব্র গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান সরকার ১৯৬৯ এর গোড়ার দিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। বঙ্গবন্ধুসহ অন্য অভিযুক্তরা সবাই মুক্তি পান। ২৩ ফেরুয়ারি এক জণজমায়েতে এ ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, "এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তান 'বাংলাদেশ' নামে পরিচিত হবে।"

১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু তাঁর ছয় দফাকে প্রচারণার মূল কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। তিনি আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে ছয় দফার পক্ষে গণভোট বলে ঘোষণা করেন। পূর্ব পাকিস্তানের মোট ১৬৯টি আসনের মাঝে ১৬৭টিতেই আওয়ামী লীগ জয় অর্জন করে। এই অবিশ্বাস্য ব্যবধানের জয়কে বঙ্গবন্ধু তাঁর মূল লক্ষ্যে অগ্রসর হবার সবুজ সংকেত হিসেবে গ্রহণ করেন। নির্বাচনের আগে পাকিস্তান সরকারও নিশ্চিত ছিলো আওয়ামী লীগ জয় লাভ করলে ছয় দফার দাবি আরো জোরালো হবে।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের ডিফ্যাক্টো সরকারে পরিণত হন। সমগ্র জাতি তাঁর সকল নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। ২ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধু সারাদেশে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণটি দান করেন যা আজো বিশ্বব্যাপী মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণার উৎস হয়ে বেঁচে আছে। এই ভাষণে তিনি স্বাধীনতার যুদ্ধের ডাক দেন। পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দান করা এই ভাষণটি মানবজাতির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর একটি।

২৫ মার্চ মধ্য রাতের ঠিক আগে পাকবাহিনী মানব জাতির ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যার সূচনা করে। এক রাতেই ঢাকা শহরের প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক প্রাণ হারায়। বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হবার আগেই তাঁর ধানমন্ডি ৩২ এর বাসভবন থেকে ইপিআর এর ওয়্যারলেস এর মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয়। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষে তিরিশ লক্ষ শহিদদের প্রাণের বিনিময়ে বাঙালি স্বাধীনতা লাভ করে। পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন এক দেশ আত্মপ্রকাশ করে। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাঙালি জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবের দিন।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে লন্ডন ও দিল্লী হয়ে ঢাকায় প্রবেশ করেন। লাখো মানুষ তাদের প্রাণের নেতাকে সেদিন বরণ করে নেয়। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

দেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শাসনভার গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। স্বদেশ পুনর্গঠনে রাখেন নৈপুন্যের ছাপ। সাড়ে তিন বছরে বঙ্গবন্ধু সরকারের গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

১. সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ শাসনতন্ত্র আদেশ জারি করেন। ২৩ মার্চ জারি করেন গণপরিষদ আদেশ। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ স্বাধীনতার ১ম বর্ষপূর্তিতে কার্যকর হয় সংবিধান।

২. বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রদত্ত ভাষণে জাতীয়করণ কর্মসূচী ঘোষণা করেন। জাতীয়করণ নীতি সফল করতে সরকার ব্যাংক, জীবন ও সাধারণ বীমা, পাট-বস্ত্র-চিনি শিল্পসহ পরিত্যক্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বিমান ও জাহাজ কর্পোরেশন প্রভৃতিকে চিহ্নিত করা হয়।

৩. কৃষক সমাজের দূর্দশা দূর করে চাষীদের স্বল্পমেয়াদী সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হয়। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হয়। সরকারিভাবে খাদ্য মজুদের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ১০০টি খাদ্যগুদাম তৈরি করা হয়। কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়।

৪. যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের জন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩-৭৮ মেয়াদী প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। কৃষি অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু গ্রাম-প্রকল্প প্রণয়ন করেছিলেন।

৫. বঙ্গবন্ধুর আমলে শিপিং কর্পোরেশন চালু হয়। ১৯৭৪ সালের মধ্যে ১৪টি সমুদ্রগামী জাহাজ সংগ্রহ করা হয়। নদীতে সারা বছর নাব্যতা ধরে রাখার জন্য সে সময় নদী খনন কার্যক্রম শুরু হয়।

৬. যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের বিদ্যুতের ভগ্ন দশা ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ লাইন ও পোলগুলো নষ্ট ছিল। বঙ্গবন্ধু সরকার ১৫০০ কি. মি. নতুন বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করে। ৪০০ ধ্বংসপ্রাপ্ত সাবস্টেশন পুনর্নির্মাণ করে ২০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে তা ৫০০ মেগাওয়াটে নিয়ে যাওয়া হয়।

৭. ১৯৭২ সালের ১৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু সরকার এক ঘোষণায় যুদ্ধকালীন ৯ মাসের (মার্চ-ডিসেম্বর) সব শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন মওকুফ করে। একই সঙ্গে শিক্ষকদের নয় মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়। ২৬ জুলাই ১৯৭২ ড. কুদরত-এ-খুদাকে সভাপতি করে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের অর্ডিন্যান্সের ফলে ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। ফলে স্বাধীন ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার পথ সুগম হয়।

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের ৪৬৮২ দিন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য জেলে কাটিয়েছেন। যে মানুষটি জীবনের ১৪ বছর কারাগারে পার করেছিলেন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে, তাঁর সে স্বপ্ন সফল হয়েছিল বাঙালির আত্মত্যাগের বিনিময়ে। তাঁর দেশ মুক্ত হয়েছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে। তাঁর জীবন বিশ্লেষণ করে বলাই যায়, বঙ্গবন্ধু আর বাংলাদেশ একে অন্যের পরিপূরক।

বঙ্গবন্ধুর আরেক নাম বাংলাদেশ

মোঃ ইউসুফ আলী
পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ

বাঙালি জাতির আশির্বাদ, মৃত্যুঞ্জয়ী নেতা, বাংলাদেশের মহান স্থপতি, ক্যারিশম্যাটিক লিডার, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, এক অনন্য কালজয়ী অবিসংবাদিত চরিত্রের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যার রক্ত ধারায় মিশে আছে বাংলাদেশ আর বাঙালিত্বের চেতনা। কবিতার ভাষায়-

"শোধ হবে না কোনোদিনও তার ত্যাগের দাম
মুজিব নামেই মিশে আছে বাংলাদেশের নাম।"

যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন বিভিন্ন কালজয়ী ব্যক্তিত্ব। আমেরিকার আব্রাহাম লিংকন, চিনের মাও সে তুং, তুরস্কের মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক, ভারতের মহাত্মা গান্ধী তেমনি কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। এই স্রোতোধারা বয়ে বাংলাদেশের অগ্নিঝরা দুঃখময় নিরাশ জীবনে রক্ষক হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন ইতিহাসখ্যাত বাঙালি জাতিসত্ত্বার আরেক নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনকালের লড়াই, অবিচল নেতৃত্ব এবং অবিরাম ত্যাগের মাধ্যমে বাঙালির লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠেছেন। তাঁর সাহসী নেতৃত্বে বীরত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। কেউ কেউ তাকে হিমালয় বলে ডাকতেন, আবার কেউ তাকে 'রাজনীতির কবি' বলে ডাকতেন। কিন্তু আমি তাঁকে 'বাংলাদেশ' বলব। (হোসেন, ২০১৭)

জন্ম ও পরিচয়

সীমাহীন গুণে গুণান্বিত এই জাদুকরী চরিত্র শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম বর্তমান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। প্রসঙ্গত গোপালগঞ্জ বর্তমানে একটি স্বতন্ত্র জেলার নাম। এই মহান ব্যক্তি ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ (বাংলা ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ৩রা চৈত্র) তারিখের এক সৌভাগ্যময় মাহেন্দ্রক্ষণে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং মহিয়সী স্নেহময় মাতার নাম সায়েরা খাতুন। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা ছিলেন গোপালগঞ্জ দায়েরা আদালতের সেরেস্তাদার। বঙ্গবন্ধু খুবই আদরের সন্তান ছিলেন। তাই আদর করে সবাই তাঁকে 'খোকা' বলে ডাকতেন। তিনি গরিব দুঃখী মানুষকে তাঁর নিজের গায়ের চাদর খুলে দিতেন। নিজেদের খাবারের জন্য রাখা ধান তিনি অসহায়দের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। তাইতো তিনি সারাটা জীবন অন্যের ভালো এবং দেশের কল্যাণে কাজ করে গেছেন।

শিক্ষাজীবন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম শিক্ষা শুরু হয় তাঁর পরিবার থেকে। তাঁর বাবা তাঁকে নীতি-নৈতিকতার পাশাপাশি প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় ৭ বছর বয়সে। ১৯২৭ সালে তিনি গিমাডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এর পর ১৯২৯ সালে ৯ বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। এর কিছু দিন পরে তিনি মিশনারী স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু ১৯৩৪ সালে তিনি বেরিবেরি নামক একটি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। এর ফলে ৪ বছর তাঁর পড়ালেখা বন্ধ ছিল। এই কঠিনতম রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে তিনি আবার পড়ালেখায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি উক্ত মিশনারী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন।

এর পর তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৪৪ সালে উক্ত কলেজ থেকে তিনি আই.এ পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি একই কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। কিন্তু তিনি এখানে অধ্যায়নকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সাথে তাদের আন্দোলনে শামিল হন। এতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্ষুদ্ধ হয়ে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার করেন। সর্বশেষ ১৪ আগস্ট ২০১০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুর ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেয় এবং তাকে মরনোত্তর সম্মানসূচক ডিগ্রি ‘ডক্টর অব লজ’ প্রদান করেন।

শেখ মুজিবের রাজনীতিতে হাতে খড়ি

শেখ মুজিব ছোট বেলা থেকেই রাজনৈতিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন। সৃষ্টিকর্তা তাঁর মাঝে কিছু রাজনৈতিক গুণাবলী জন্মগত ভাবেই দিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই দেশ ও দেশের মানুষের কথা ভাবতেন। মনের গভীর থেকে তিনি তাদের দুঃখ-দুর্দশা, চাওয়া-পাওয়ার কথা ভাবতেন। ছাত্র জীবনেই তিনি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদদের সান্নিধ্য পান। কিন্তু তার রাজনীতির দীক্ষাগুরু ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯৩৮ সালে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ সফরে আসেন। তাদের সংবর্ধনার দায়িত্ব দেওয়া হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে। সভা শেষে শহীদ সাহেব স্কুল পরিদর্শনে এলে তিনি শেখ মুজিবের একনিষ্ঠতা লক্ষ্য করেন এবং ফেরার পথে তিনি শেখ মুজিবকে কাছে ডেকে বলেন এবং আদর করে রাজনীতি করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। (রহমান, ২০১৭) সেই থেকে তিনি রাজনীতিতে মনোনিবেশ করেন এবং রাজনীতিতে তার হাতে খড়ি হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগের সরকারের দুঃসহ জুলুম, নির্যাতন ও স্বৈরশাসনের প্রতিবাদ করেন এবং ১৯৪৯ সালের ২৩ শে জুন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানীর সভাপতিত্বে নয়া রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন।

ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ছিল অত্যান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিহাস ঘাটলেই তার সত্যতা পাওয়া যায়। আজন্ম মাতৃভাষাপ্রেমী এই মহান নেতা ১৯৪৭ সালের

ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকে পরবর্তীতে আইনসভার সদস্য হিসেবে এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। ভাষা আন্দোলন এর সূচনালগ্নে ১৯৪৭ সালের ৬ এবং ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তানের কর্মী সম্মেলন। সম্মেলনে বাংলা ভাষার স্বপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবটি পাঠ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। এভাবে তিনি ভাষা আন্দোলনে অবদান রাখেন। ভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাবটিতে তিনি বলেন, "পূর্ব পাকিস্তান প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের লেখার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক।"

বঙ্গবন্ধুর প্রথম জীবনীকার অধ্যাপক ড. মাযহারুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেন, "শেখ মুজিবুর রহমান এই মজলিশকে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বহু কাজে সাহায্য ও সমর্থন করেন।" (ইসলাম, ২০০২)। রাষ্ট্রভাষাসহ ২১ দফা ইশতিহার প্রণয়ন করে প্রণয়নকারীরা এতে স্বাক্ষর প্রদান করেন যেখানে বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষর রয়েছে। এভাবে জানা অজানা অনেক উপায়ে বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলনে অবদান রাখেন। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য পাকিস্তান সরকার তাকে বারবার জেলবন্দি করেন কিন্তু তাতেও তিনি পিছ পা হননি। বাঙালির প্রাণের দাবি মাতৃভাষা বাংলার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই ঘরে ফিরেছেন।

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার মন্ত্রী মুজিব

ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। এরপর তিনি বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার দায়িত্বে মনোনিবেশ করেন। তিনি শেরে বাংলার সাথে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টে যোগদান করেন। ২১ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করেন। এই যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ছিল বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের অন্যতম স্মারক। নির্বাচনে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেন। উক্ত সরকারে তিনি কৃষি, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। এভাবে তিনি বাংলাদেশের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে অবদান রাখেন।

ছয় দফা আন্দোলন: বাংলাদেশের 'ম্যাগনাকার্টা'

ছয় দফাকে বলা হয় বাঙালির মুক্তির সনদ বা বাংলার ম্যাগনাকার্টা। এই ছয় দফা দাবির প্রবর্তক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ছয় দফা দাবি ছিলো বাঙালির প্রাণের দাবি। ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেরুয়ারি লাহোরে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাস ভবনে বিরোধী দলীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। ছয় দফা দাবিকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী সহজভাবে নিতে পারেননি। তারা এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু শেখ মুজিব তার আন্দোলন চালিয়ে গেছেন।

ছয় দফা দাবি আদায়ের জন্য ১৯৬৯ সালে ৫ই জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। এই আন্দোলনের সময় বাংলার আপামর জনসাধারণ ছয় দফার দাবিতে সোচ্চার হন। বঙ্গবন্ধুকে থামাতে না পেরে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করেন এবং তাকে গ্রেফতার করেন। এতে বাংলার জনগণ আন্দোলনে ফুঁসে উঠে। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে গণঅভ্যুত্থান শুরু হয়। আন্দোলন

গণ আন্দোলনে রূপ নিলে পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন এবং শেখ মুজিবকে মুক্তি দেন। এতো বারে বারে কারাবদ্ধ হয়েও তিনি কখনো আন্দোলন থেকে পিছ পা হননি।

৭০-এর নির্বাচন ও ম্যানডেটেড নেতা

কারাগার থেকে মুক্তির পর শেখ মুজিবুর রহমান আইয়ুব খানের আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দেন। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানীসহ অনেক রাজনৈতিক দলের নেতারা সামরিক সরকারের অধীন ৭০-এর নির্বাচনে অংশগ্রহনে বিরোধীতা করেন। কিন্তু শেখ মুজিব নির্বাচনে অংশগ্রহনের ঘোষণা দেন। প্রথম পাকিস্তান সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও পাকিস্তানী সামরিক শাসকরা ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানান। শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এভাবেই মুজিব হয়ে উঠেন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত এক নেতা।

৭ মার্চের ভাষণ: এক অমর কবিতা

১৯৭১ সালের এই দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির কাছে মুক্তির বার্তা পৌছে দিয়েছিলেন। মার্চের সেই ভাষণের সফল ফলাফল স্বাধীন বাংলাদেশ। ৪৭ বছরেও সেই ২৮ মিনিটের ভাষণের আবেদন একটুও কমেনি। গত বছরের ৩০ শে অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্থান পায়। গবেষকেরা বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর সার্বজনীনতা ও মানবিকতা। এই ভাষণ সব সময় যে কোনো নিপীড়িত মানুষের কাছে আবেদনকারী। (Mamoon, 2019)

১৯৭১ সালের এই দিনে মহান নেতা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, “এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।”

স্বাধীনতার ঘোষণা

১৯৭১ সালের ১লা মার্চে পাকিস্তান এর সামরিক সরকার যখন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন, তখন বাংলার মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। তারা তাদের হৃদয় থেকে পাকিস্তান নামটি মুছে ফেলতে শুরু করে। এমন সময় ঐতিহাসিক ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু এক ঐতিহাসিক ভাষণে পরোক্ষভাবে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ভোরে পাকবাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করে। গ্রেফতারের ঠিক আগ মুহুর্তে ২৬ শে মার্চ ভোরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার শেষ গানটি গেয়েছিলেন। সেই রাতে দেড়টায় ধানমন্ডি ৩২ নং বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করেন পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। জনগণ প্রতিরোধ শুরু করেন। কিন্তু তাদের সুনির্দেশনা দরকার। সেই দিক নির্দেশনা দেওয়ার অধিকার একমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আছে। তাই ১০ এপ্রিল প্রতিরোধের পথ দেখাতে মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করা হয়।

দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। জন্ম হয় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, নাম তার বাংলাদেশ। পরে ৮ই জানুয়ারি ১৯৭২ সালে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে মুক্তি দিলে ১০ জানুয়ারি তিনি দেশে ফিরে তাঁর অভাগা বাংলাদেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা এক ও অভিন্ন নাম। স্বাধীনতা বাঙালির রক্তপাতের ইতিহাস এবং বাঙালির স্বাধীনতার ইতিহাস একটি মহাকাব্য এবং বঙ্গবন্ধু তার একমাত্র অভিনয় শিল্পী। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস যতদিন থাকবে বঙ্গবন্ধুর নাম অমর হয়ে থাকবে। পৃথিবীর ইতিহাসে, স্বাধীনতার ইতিহাসে, বঙ্গবন্ধুর নাম পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে উচ্চারিত হবে। যতদিন বাঙালি বেঁচে থাকবে, বাংলাভাষা যতদিন পৃথিবীতে উচ্চারিত হবে, ততদিন বঙ্গবন্ধুর নামও উচ্চারিত হবে।

তথ্যসূত্র

হোসেন, সেলিনা। *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ*, জয়িতা প্রকাশনী।

রহমান, শেখ মুজিবুর। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

ইসলাম, মাযহারুল। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর*, আগামী প্রকাশনী।

রহমান, হাসান হাফিজুর এবং কবির, মফিজুল্লাহ। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মামুন, মুনতাসীর (সম্পা), *বঙ্গবন্ধু কোষ*, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, মুক্তিযুদ্ধ ও একটি জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব

শিবু দাশ
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নড়াইল

তিনি নেতা ছিলেন না, ছিলেন জনতার ভাই, বন্ধু, খোকা। সর্বোপরি তিনি ছিলেন নিপীড়িত, শোষিত আর অবহেলিত মানুষের মুক্তির দূত। তিনি হয়ে উঠেছিলেন সবার প্রিয় বন্ধু। ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি উচ্চতার একজন মানুষ যেন হয়ে উঠেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনের পথপ্রদর্শক। ভোরের আলো যেমন অন্ধকার দূর করে শুভ্র একটি মিষ্টি সকালের আবির্ভাব ঘটায় তেমনি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ২৪ বছরের শাসন-শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে উঠেছিলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

মার্চ, ১৯৭১: দীর্ঘ সংগ্রামের পর স্বাধীনতার উত্তাল মাস। বলা যেতে পারে একই সাথে আমাদের জন্য গর্ব, হারানো ও বেদনার একটি মাস। ওই বছরের ১ মার্চ হঠাৎ এক হটকারী সিদ্ধান্তে পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করলে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বাংলার আপামর জনতা। সেদিনই অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন বঙ্গবন্ধু । পরবর্তীতে ২৫ মার্চ পর্যন্ত নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এ অঞ্চলের স্বাধিকার আন্দোলন রূপ নেয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে। যদিও ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকে পূর্ব বাংলা চলে আসছিলো অনেকটা 'de facto' রাষ্ট্রের মতো করে। কারণ ১৯৭০ এর নির্বাচনে এ অঞ্চলের মানুষ বঙ্গবন্ধুকে ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে একমাত্র 'সিম্বোলিক ফিগারে' পরিণত করেন। সময়ের পরিক্রমায় অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণটির আগমন ঘটে অর্থাৎ ৭ মার্চ নামক ঐতিহাসিক দিনটির।

৭ই মার্চ সকাল থেকেই ঢাকায় ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে ছিল আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ভীড়। তরুণ ছাত্রনেতারা তাঁকে স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করছিলেন। কিন্তু তিনি তো সর্বজ্ঞ, কখন কোন সিদ্ধান্ত নিতে হবে তার চেয়ে ভালো আর কে জানে। শরীরে হালকা জ্বর নিয়ে সেদিন সকালটা বেশ ব্যস্ত সময় পার করেন তিনি। দুপুরে খাওয়ার পর বিশ্রামের জন্য রুমে গেলে কথা হয় তাঁর প্রিয় রেণুর সাথে। শেখ মুজিব গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে সবসময় তাঁর সহধর্মিণীর সাথে আলাপ করতেন। সেদিন ভাষণ দিতে যাবার আগে তিনি বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন "তোমার সামনে জনগণ পিছনে গুলি, তোমার হৃদয় যা চাইবে তাই বলবে আজ।"

সেই রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রিয় মুজিব এলেন শুভ্র সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা এবং হাতকাটা কালো কোট পড়ে। মঞ্চে পূর্ব থেকেই গণসংগীত চলছিল। সেদিন মঞ্চে কবি একাই ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর আগমনের শুরুতে যেমন গগনবিধারী চিৎকার ছিল তেমনি ভাষণ শুরু হতেই নেমে আসে পিনপতন নীরবতা। স্বাধীন সার্বভোম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সব দিকনির্দেশনা নিহিত ছিল এই একটিমাত্র ভাষণে যাও কিনা সম্পূর্ণ অলিখিত। সেদিন ভাষণ শেষে জনতা যেন ধর্মীয় কোনো সভা থেকে প্রফুল্ল চিত্তে ফিরে গিয়েছিলো।

ভাষণের শুরুতে বলছিলেন “ভায়েরা আমার”, একটু পর আবার বলেন “আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে”, “১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে ৭ জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে”, “আমার গরীবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের উপরে গুলি করা হয়েছে”, “যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে”, “আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়”, “তোমরা আমার ভাই”। নেতা তো তিনিই যিনি তাঁর দেশের আপামর জনতাঁকে নিজ ভাইয়ের মতো আপন করে নিতে জানেন। বঙ্গবন্ধু তার দেশের প্রত্যেক মানুষকে এই ভাষণে “আমার ভায়েরা” বলে সম্বোধন করেছিলেন। কতোটা দরদী হলে এভাবে বলা যায়। তাঁর ভাষণের এসব দিক বিশ্লেষণ করলে এদেশের মানুষের প্রতি চিরায়ত মায়া ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ফুটে উঠে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ

৭ মার্চের ভাষণে তিনি একবারের জন্যও পূর্ব পাকিস্তান কথাটি উল্লেখ করেননি। কারণ তিনি সবসময় বিশ্বাস করে এসেছেন বাঙালি জাতীয়তাবাদে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৯ এ বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথাই বলা আছে। ৭ মার্চের ভাষণে তিনি অসংখ্যবার বাংলা শব্দটি উচ্চারণ করেছেন। আমরা দেখতে পাই তিনি বলছিলেন-

- বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়
- নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্নভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন
- ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস
- বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস
- দোষ দেয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেয়া হলো আমাকে
- আমার বাংলার মানুষের উপর গুলি করা হয়েছে
- সমস্ত দোষ বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন
- এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙ্গালি-অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই
- পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না
- টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে

বঙ্গবন্ধু মুক্তিতে বিশ্বাস করতেন। ৭ মার্চের ভাষণে তিনি মোট পাঁচ জায়গায় মুক্তির কথা বলেছেন।

- আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়
- এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে
- যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে
- এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ
- এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম

মূলত মুক্তি কথাটি দিয়ে পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসন শোষণের হাত থেকে মুক্তি চেয়েছেন। তিনি বারবার বলতেন "আমি শোষিতের পক্ষে"। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমাজতন্ত্রের পূজারী ছিলেন তার ভাষণে শুনতে পাই "আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছিয়ে দিবেন। আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন।" বিশ্ব যখন শাসক আর শোষিত এই দুই ভাগে বিভক্ত তখন তিনি শোষিতের মুক্তির দূত হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১০ এ সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি তাঁর এই কথারই বহিঃপ্রকাশ।

গণতন্ত্রের জয়গান

তিনি বলছিলেন "যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজনও যদি সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলী বসবে। আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করবো এবং এই দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। আপনারা আসুন বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি।" আমরা জানি সংবিধানের ১১নং অনুচ্ছেদে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথাই বলা হচ্ছে।

অসাম্প্রদায়িক চেতনার স্ফুরণ

এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান, বাঙ্গালি অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর। আমাদের যেন বদনাম না হয়। সংবিধানের ১২নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা যেন তাঁর এই কথারই সাক্ষ্য বহন করছে।

নেতাঁকে হতে হবে মানবিক

তিনি বঙ্গবন্ধু, আপামর জনগণের নেতা। জনতার কথা স্মরণে রেখেই তিনি এদিন বলেছিলেন “গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেজন্য সমস্ত রিকশা, গরুর গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নিবার পারে”।

আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত দখলদার হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র বাঙ্গালি সম্মুখ সমরে মিলিত হলে আমাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে, এজন্য তিনি তাঁর ভাষণে দিয়ে গেছেন গেরিলা যুদ্ধের নির্দেশনা। বঙ্গবন্ধু বলেন “প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা কিছু আছে, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।” তিনি জানতেন যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হবে। তাই তিনি বলেছিলেন “আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো।” বস্তুত যুদ্ধ যদি বর্ষাকালে গড়ায় তবে এই অঞ্চলে মাঠ-ঘাট ডুবে যাবে। ফসলের উৎপাদন কমবে এবং পাকিস্তানিরা সাঁতারে ততটা পটু নয়।তাই তিনি তখন তাদের ভাতের অভাবে ও পানিতে চুবিয়ে মারার কথা বলেছেন।

যারা রাজনীতি করেন, যারা জনগণের আস্থাশীল তাঁরা বেশ আগে থেকেই ধারণা করতে পারেন ভবিষ্যতে কি ঘটতে চলেছে। ভাষণটির এক জায়গায় তাঁকে বলতে শোনা যায় “হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।” তিনি যে সর্বজ্ঞ এখানেই সেটির আভাস দিয়েছিলেন। মূলত এর মাধ্যমে তিনি ‘লারকানা ষড়যন্ত্রের দিকে দৃষ্টি রেখেছেন। একটু পিছনে যাওয়া যাক। ১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি জেড. এ. ভুট্টোর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, সেনাপ্রধান জেনারেল হামিদ, প্রধান স্টাফ অফিসার লে. জে. পীরজাদাসহ আরো গণহত্যার পরিকল্পনা হয়েছিল যা খাদিম হুসেন রাজার ‘A stranger in my own country’ বই থেকেও অল্পবিস্তর জানা যায়। রবার্ট পেইন তাঁর ‘Massacre: The Tragedy at Bangladesh and the Phenomenon of Mass Saughter throughout History’ বইতে লিখেছেন পূর্ব পাকিস্তানে একটা সর্বাত্মক গণহত্যা শুরুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যায় ১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন সেনা সদর দপ্তরে বৈঠকে বসেছিলেন পাঁচ শীর্ষ সেনা কর্মকর্তা এই পাঁচজন হলেন- প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, চিফ অব স্টাফ জেনারেল পীরজাদা, জেনারেল টিক্কা খান, জাতীয় নিরাপত্তা কমিশনের চেয়ারম্যান জেনারেল উমর খান এবং গোয়েন্দা শাখার প্রধান জেনারেল আকবর খান। সেখানেই তারা গণহত্যার একটি নীলনকশা তৈরি করেন।

কীভাবে যুদ্ধ হবে বা কারাই বা দিকনির্দেশনা দেবেন তাও তিনি বলেছেন তাঁর ভাষণে "প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।"

৭ মার্চে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা না দেয়ার কারণ

সিদ্দিক সালিক তার 'Witness to Surrender' বইতে তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন-

১. সম্ভবত ৬ মার্চ ইয়াহিয়ার সাথে শেখ মুজিবের ফোনে কথা হয় যাতে ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে ভাষণে শান্তির বার্তা দিতে অনুরোধ করেন।
২. পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড একপক্ষীয় স্বাধীনতা ঘোষণা না দিতে বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ জানান।
৩. জিওসি খাদিম হুসেন রাজার নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর হামলে পড়ার কড়া বার্তা

যদি বঙ্গবন্ধু সেদিন স্বাধীনতার ঘোষণা দিতেন তবে সেটি হতো 'Unilateral Declaration of Independence' বা 'UDI' তখন পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ঘোষণা দিয়ে সাথে সাথে বাংলাদেশে আক্রমণ করতে পারতো। কারণ আকাশে তখন পাকিস্তানী জঙ্গী বিমান হামলার উদ্দেশ্যে উড়ে বেড়াচ্ছিল। তিনি চাইছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের উপর আক্রমণ হলে তিনি বিশ্ববাসীকে দেখাতে পারবেন দখলদার হানাদার বাহিনীর বর্বরতা। তিনি এমনভাবে স্বাধীনতার কথা বললেন যাতে অপূর্ণতা বলতে কিছুই রইলো না। তাঁর বক্তব্যে বিভ্রান্ত হয়ে ISI রিপোর্ট করে, "চতুর শেখ মুজিব চতুরতার সাথে বক্তৃতা করে গেলেন, এক দিকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে গেলেন অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হবার দায়িত্ব নিলেন না। আমাদের বসে বসে চেয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিল না।"

লিখার শুরুতে বলেছিলাম, বাংলাদেশ তখন চলছিলো অনেকটা 'de facto' রাষ্ট্রের মতো করে। 'ডি ফ্যাক্টো' শব্দটি ল্যাটিন যার অর্থ হলো কার্যত স্বাধীন রাষ্ট্র। কার্যত স্বাধীন রাষ্ট্রে মৌলিক চারটি উপাদান ভূমি, সরকার, জনসংখ্যা ও সার্বভৌমত্ব) বহাল থাকে। তবে তার পঞ্চম এবং গৌণ উপাদানটি স্বীকৃতি) সীমিত থাকে বা থাকে না। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে পূর্ব বাংলার সবকিছু চলছিলো যা তাঁর দেয়া ৭ই মার্চের ভাষণে সাধারণ মানুষের প্রতি দিকনির্দেশনা, সরকারী কর্মচারীদের প্রতি তাঁর নির্দেশ, শিল্পকলকারখানা মালিকদের প্রতি শ্রমিকদের বেতন পৌঁছে দেবার নির্দেশ থেকে প্রতীয়মান হয়।

আরেক প্রকার রাষ্ট্র হলো 'de jure' রাষ্ট্র। ডি জুরি মানে হল- আইনত স্বাধীন ও সার্বভোম রাষ্ট্র। অর্থাৎ রাষ্ট্র গঠনের চারটি মৌলিক উপাদান (ভূমি, সরকার, জনসংখ্যা ও সার্বভৌমত্ব) ছাড়াও এর বাড়তি আরো একটি যোগ্যতা আছে; সেটি হলো অন্যান্য আইনত স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। সেসময় এই স্বীকৃতিই শুধুমাত্র বাংলাদেশের ছিল না।

ভাষণটির এক জায়গায় তাঁকে বলতে শোনা যায় "রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।" পবিত্র কোরআনের সুরা কাহফ, আয়াত: ২৩-২৪ এ ইনশাল্লাহ শব্দের ব্যাখ্যা দেয়া আছে। এতে বলা হচ্ছে ভবিষ্যতে কোন কাজ মহান রবকে স্মরণ করে করার উদ্দেশ্যেই বান্দা মূলত 'ইনশাল্লাহ' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। আর ইনশাল্লাহ শব্দটি একবার উচ্চারণ করে ফেললে কাজটি তিনি করবেন এই অঙ্গীকারই ব্যক্ত করা হয়। বাংলাকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে রূপান্তরিত করে তিনি সে কথা রেখেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে বেশ কয়েকটি ভাষণের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে তার মধ্যে একটি হলো আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের বিখ্যাত গেটিসবার্গ ভাষণ, "Government of the people, by the people, for the people, shall not perish form the earth." কালো মানুষের অধিকার আদায়ে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ ও মানবাধিকার নেতা মার্টিন লুথার কিং এর 'I have a dream', অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধীর Quit India- "Ours is not a drive for power but purely a non violent fight for India's independence", ৪৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পেলোপোনেশিয়ান যুদ্ধের প্রথম বছরে পেরিক্লিসের দেয়া 'Pericles's Funeral Oration', এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষের অধিকার আদায়ের নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার 'I am prepared to die' প্রভৃতি কালজয়ী ভাষণের সাথে যা কিনা সারা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা বঞ্চিত নিপীড়িত শোষিত ও মুক্তিকামী মানুষকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে নিরন্তর।

আব্রাহাম লিংকন, মার্টিন লুথার কিং, চার্চিল বা গান্ধীর মতো মহান নেতাদের ভাষণের মতো শেখ মুজিবের ভাষণ দেবার প্রেক্ষাপটও ছিল ভিন্ন তবে বঙ্গবন্ধুর মতো পরাধীন দেশে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন কেবল মহাত্মা গান্ধী। ২০১৩ সালে প্রকাশিত 'Jacob Franz Field' তাঁর গ্রন্থে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের দেয়া ভাষণ থেকে শুরু করে এই নিকট অতীতে দেয়া ভাষণকে স্থান দিয়েছেন যেখানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নেতা, রাষ্ট্রনায়ক ও মিলিটারি জেনারেলদের উদ্দীপনামূলক বক্তব্য রয়েছে যাতে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। তার দৃষ্টিতে সেরা ৪০টি ভাষণ এতে সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটির শিরোনাম দেয়া হয়েছে 'We Shall Fight on the Beaches: The Speeches that Inspired History'। এই শিরোনামটি নেয়া হয়েছে উইনস্টন চার্চিলের ১৯৪০ সালের ৪ জুন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দেয়া ভাষণ থেকে। ১৬৭ পাতার এই বইয়ের অর্ধেকটা জুড়ে আছে উইনস্টন চার্চিল-এর বিখ্যাত ভাষণ বাকিটায় স্থান পেয়েছে অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ভাষণ!

আমাদের সংবিধানের চারটি মূলনীতি- জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা যদিও বঙ্গবন্ধু তাঁর ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালের ভাষণে সরাসরি বলেছেন কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় এই চারটি মূলনীতির কথা তিনি ৭ মার্চের ভাষণেও বলে গেছেন যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি সম্প্রতি ইউনেস্কোর 'Memory of the World Register' এ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যচিত্রের ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এর পূর্বে বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টা ও কানাডায় বসবাসরত দুইজন প্রবাসী বাঙালি রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালাম (তাঁরা ছিলেন মাতৃভাষা প্রেমিকগোষ্ঠীর সদস্য) -এর উদ্যোগে ২১ ফেব্রুয়ারিও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা পায়। ইউনেস্কোর ৩০তম অধিবেশনে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আরেকটি গৌরবের বিষয় হলো ইউনেস্কোর তৎকালীন মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর প্যারিসে অবস্থিত সদর দপ্তরে জানান ইউনেস্কো ৭ মার্চের ভাষণকে 'World's Documentary Heritage' (বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রত্যেকটি বাঙালি জাতির জীবনে ৭ মার্চ একটি অবিস্মরণীয় দিন। বাঙালির বীরোচিত সংগ্রাম ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই দিকনির্দেশনায় ছিল বজ্রকঠিন জাতীয় ঐক্যের মূলমন্ত্র। কালজয়ী ও অবিস্মরণীয় এ ভাষণ বিশ্বের নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত ও মুক্তিকামী মানুষকে সবসময় বিজয়ের পথে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাবে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ এবং ত্রিশ লক্ষ শহিদ ও দুই লক্ষ মা-বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ের মাধ্যমে এই লাল সবুজের দেশটি লাভ করি। কোনো জাতিকে তার আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। চাইলেই বন্দুকের নল কিংবা অস্ত্রের মুখে দাবায়ে রাখা যায় না। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী বঙ্গবন্ধুর সাত কোটি বাঙালিকে দাবায় রাখতে পারেনি। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, সর্বোপরি একটি জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তারই একটি বাস্তব উদাহরণ । ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ছয় দফা পেশ করার মাধ্যমে বাঙ্গালিকে যে স্বাধিকারের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সেটিই ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে স্বাধীনতার স্বপ্নে পরিণত হয় এবং দীর্ঘ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিজয় অর্জিত হয়।

ভাষণ বলতে সাধারণত কোনো বিষয়ে শ্রোতাকে উদ্দেশ্য করে বলাকে বুঝায় আর অভিভাষণ বলতে বুঝায় শ্রোতার উদ্দেশ্যে যখন সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সহকারে, মুখের ভাষার সাথে শারীরিক অঙ্গভঙ্গির এক অদ্ভুত মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিষয়টিকে শ্রোতার নিকট আরও বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়। সেই অর্থে বলা যেতে পারে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে একটি অভিভাষণ।

কারাগারে মহানায়ক

ফাইরুজ তাসনিম
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান , বাঙালির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু তার পুরো জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন বাঙালির মুক্তির আন্দোলনে। তিনি ছিলেন একজন অবিসংবাদিত নেতা যিনি তাঁর জীবনের মুল্যবান ৪৬৮২টি দিন কারাগারের অন্ধকারে কাটিয়েছিলেন। 'কারাগার' শব্দটি শুনলেই আমাদের মনে একটি গভীর নিস্পৃহ অনুভূতি জন্মায় অথচ বঙ্গবন্ধু এই কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন তাঁর জীবনের অনেকটা সময়। তাঁকে তুলনা করা যায় ২৭ বছর কারাভোগ করা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী আন্দোলনের নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে। বারবার মিথ্যা মামলার ঘেরাটোপে আবদ্ধ হয়ে পরিবারের পরিজনের মায়া ত্যাগ করে কারাগারে দীর্ঘ সময় কাটালেও তিনি কখনোই অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি।

প্রিয়তমা স্ত্রী আর অবুঝ সন্তানদের কাছে পাওয়ার আকুতি, মুক্ত বাতাসে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার বাসনা বারবার তাঁকে উদ্বেলিত করলেও বাঙালির জন্য স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার প্রত্যয়ে তিনি ছিলেন অবিচল। অন্যায়ের বিপক্ষে আর শোষিতের পক্ষে তাদের অধিকার আদায়ের দাবিতে সবসময় তিনি ছিলেন অনড়, ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ী। ক্ষমতা, হিংসা, লোভ কিংবা লালসা কোন কিছুই তাঁকে সত্যের পথ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। মাত্র ৫৪ বছরের পথচলায় এত দীর্ঘ সময় কারাগারে কাটানোর নজির ইতিহাসে বিরল। তিনি বাংলার মানুষকে ভালোবেসে শৃঙ্খলের পাষাণ বেড়ি বরণ করেছিলেন। তবে বঙ্গবন্ধুর কারাবাসের ব্যপ্তি প্রকৃত হিসাবে আরও বেশি কারণ প্রতিবার মুক্তি পেলে কারাগার থেকে বের হতে তার আরো কিছুদিন সময় বেশি লেগে যেত। ছয় দফা আন্দোলনের সময় সভা-সমাবেশ করতে গেলেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতো এবং গভীর রাত পর্যন্ত আটকে রেখে ছেড়ে দিতো। বিচারবহির্ভূতভাবে বঙ্গবন্ধুর কারাগারে কাটানো এই সময়গুলো হিসাবের খাতায় নিলে দেখা যায় তিনি তাঁর জীবনের চারভাগের মধ্যে এক ভাগেরও বেশি সময় কারাগারে কাটিয়েছেন। কারাগারে বসেই তিনি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদার দাবিতে লড়াই করেছেন। স্বপ্ন দেখেছেন স্বাধীন বাংলাদেশের, কারাগারে বসেই তিনি রচনা করেছেন অনন্য সাধারণ দুটি বই 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' আর 'কারাগারের রোজনামচা' যা জাতি হিসেবে আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস, সামনে এগিয়ে চলার পাথেয়।

‘কারাগারের রোজনামচা’ বইটিতে তিনি লেখক হিসেবে অত্যন্ত সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। কারাগারের খুটিনাটি বিষয়, সেখানকার কয়েদিদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন দফা, তাদের দৈনন্দিন কার্য্যাবলী , তাদের সুখ দুঃখ, হাসি কান্নার যে গল্প এ বইয়ে বলেছেন তা এক কথায় মর্মস্পর্শী। তিনি কারাগারের প্রকৃতি, সেখানে তাঁর নিজ হাতে করা বাগান, সেই বাগানে খেলতে আসা হলুদ পাখি সবকিছু মিলিয়ে কারাগারের একটি বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এ সব কিছু মিলিয়ে বইটি একদিকে যেমন পাঠকের মনে করুণ রসের সৃষ্টি করে অন্যদিকে ঠিক তেমনি এই মহান নেতার জন্য অন্যরকম ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার জায়গা তৈরি করে।

বঙ্গবন্ধু কয়েদিদের মনস্তত্ব বোঝার চেষ্টা করতেন, তাদের জীবন বৃত্তান্ত, অপরাধ করার প্রেক্ষাপট , অপরাধ করার পেছনের কারণসমূহ নিয়ে চিন্তা করতেন, তাদের সঠিক উপদেশ দিতেন, ভালোবাসতেন, সাজা শেষে কারামুক্ত হয়ে সৎ জীবন যাপন করার অনুপ্রেরণা দিতেন। তাঁর কাছে কারাগারের ভেতরকার আর বাহিরের মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলো না। মানুষকে খুব সহজে আপন করে নেওয়া দরদী এ মহান নেতা কে তাই কয়েদিরাও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। কারা প্রকোষ্ঠেও তিনি ছিলেন সকলের মধ্যমণি। কারাগারে থাকলেও তিনি সর্বদা দেশের খোঁজ-খবর রাখতেন। নিয়মিত ৫টি দৈনিক পত্রিকা পড়তেন। কোন কোন দিন পত্রিকা আসতে দেরি হলে তিনি অস্থিরতা বোধ করতেন। দেশ বিদেশের রাজনীতির পাশাপাশি নেতাকর্মীদের ও খোঁজ খবর রাখতেন। তাদের কষ্টে ব্যথিত হতেন। নির্মম পাকিস্তানি শাষকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে অন্তরীণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি, জাতির এ বীর সন্তানকে কষ্ট দিতে, মানসিকভাবে চাপে রাখতে তারা বহু কূটকৌশল অবলম্বন করেছিলো। তারা জেল কোড অমান্য করে বঙ্গবন্ধুকে নির্জন কারাবাসে থাকতে বাধ্য করেছিলো। এ নির্জন কারাবাসের দুঃসহ অনুভূতি আমরা বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচারণ থেকে পাই। কারাগারে রোজনামচা বইটিতে তিনি বলেন, “কারো সঙ্গে আলাপ করার উপায় নাই, কারো সঙ্গে পরামর্শ করারও উপায় নাই। সান্ত্বনা দেবার কেহ নাই। কারাগারে একাকী রাখার মতো নিষ্ঠুরতা আর কি হতে পারে?”

সহজেই কাটতে চাইতো না বলে কারাগারে দিনের চেয়ে রাত বঙ্গবন্ধুর কাছে অসহনীয় ছিল। দীর্ঘ কারাজীবনে জাতির পিতাঁকে অনেকগুলো ঈদও কারাগারের চার দেয়ালে কাটাতে হয়। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তার পরিবারের কারোরও ইদ উদযাপন করা হতো না। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তার পরিবারের কেউ নতুন কাপড় পরতেন না। কারাগারে বঙ্গবন্ধুকে কয়েক মিনিটের জন্য দেখতে পারাটাই ছিলো ঈদের দিনে তাদের একমাত্র আনন্দের উৎস। ইদের দিনে দেশবাসীর মঙ্গল কামনা করে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থণা করেই তাঁর দিন কাটতো। ‘কারাগারের রোজনামচা’ বইয়ে তাঁর উক্তিতে আমরা পাই,

"আমার প্রিয় জনগণ কীভাবে তাদের ঈদ উৎসব পালন করছে? এই প্রশ্ন আমি করলাম। জানি না কাকে! সেই দিন জানি না তাদের দেখা পাবো, সেটা না জেনেই আমি মোনাজাত করে আমার জনগণের মঙ্গল ও নিরাপত্তা দয়াময় আল্লাহর হাতে সমর্পণ করলাম। এটাই ছিলো আমার ঈদ।"

বঙ্গবন্ধুর কারাজীবনে আলোকপাত করতে গেলে প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর পরিবারের আত্মত্যাগের নিদর্শন আমাদের সামনে আসে। বঙ্গমাতা রেণু ও বঙ্গবন্ধুর সন্তানেরা যে কঠোর ত্যাগ আর কষ্টের মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর কারাগারে থাকা দিনগুলো কাটাতেন তা এক কথায় পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে আর্থিক অস্বচ্ছলতা, নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেও বঙ্গমাতা দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতেন, বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনার ব্যপারে আলোকপাত করতেন। সন্তানদের দেখাশোনা করতেন। তবে জাতির পিতার সন্তানদের জন্য তাদের পিতাঁকে সম্বোধন করতে না পারা, তাঁর সাথে সময় কাটাতে না পারাটা ছিলো অত্যন্ত কষ্টের। বঙ্গবন্ধু সর্বকনিষ্ঠ ২ বছরের ছোট রাসেলের জন্য পিতৃস্নেহে উদ্বেলিত হতেন, ছোট মেয়ে রেহানার জন্য মনে ব্যথা অনুভব করতেন। তাঁর জবানীতে আমরা পাই একবার বঙ্গবন্ধুর সাথে কারাগারে দেখা করতে আসলে বঙ্গবন্ধু দেখলেন রাসেল বঙ্গমাতাঁকে আব্বা বলে ডাকছে। কারণ জিজ্ঞেস করলে বঙ্গমাতা বলেন "বাড়িতে আব্বা আব্বা বলে কাঁদে। তাই ওকে বলেছি আমাকে 'আব্বা' ডাকতে।" কী তীব্র অনুভূতি! পিতা জীবিত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ডাকতে না পেরে মাকে 'আব্বা' সম্বোধন করা। কী নিদারুণ ত্যাগ আর আত্মোৎসর্গ করেছে বঙ্গবন্ধু সহ তার গোটা পরিবার তা এই ছোট ছোট আবেগতাড়িত উক্তি থেকে সহজেই অনুমেয়। জাতির পিতা তাঁর বড় কন্যা শেখ হাসিনার বিয়েতেও উপস্থিত থাকতে পারেননি। দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু তাঁর কন্যা সম্প্রদানের সেই গুরু মুহূর্তটিকে কী ভাবছিলেন? নিশ্চিত করেই বলা যায় পরিবার, সন্তান সবকিছুর উর্ধ্বে তাঁর কাছে বড় ছিলো শত বছরের শোষণ আর বঞ্চনার শিকার হওয়া বাঙালির মুক্তি, মুক্তির সংগ্রাম।

তবে এত ত্যাগ আর তিতিক্ষার পরেও বাঙালি নামী কতিপয় সুবিধাভোগী মানুষের স্বার্থপরতা বঙ্গবন্ধুকে ব্যথিত করেছে। 'পরগাছার' সাথে তিনি তাদের তুলনা করেছেন। তিনি কারাগারে সেখানকার বাগানে কাকদের বাসা ভেঙে দেওয়ায় তাদের সম্মিলিত প্রতিবাদ দেখে বলেছিলেন বাঙ্গালিদের চেয়েও এদের একতা বেশি। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তার দৃঢ়তা ও মনোবল ভেঙ্গে দিতে সবসময় চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাঙ্গালির মুক্তির প্রতিটি ধাপেই তিনি ছিলেন অবিচল, পর্বতের মত অটল। কখনো তিনি ছিলেন রাজপথে, কখনোবা তিনি ছিলেন কারাগারে ।কারাগারের চার দেয়াল তাঁকে দৈহিকভাবে আটকে রাখতে পারলেও তার চেতনাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। সে চেতনায় বলীয়ান

হয়েই ১৯৭১ সালে বীর বাঙ্গালি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে উদ্দীপ্ত হয়ে যে যেখানে, যে অবস্থাতে ছিল সেভাবেই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। ছিনিয়ে এনেছিলেন স্বাধীনতা।

বঙ্গবন্ধু প্রথম কারাভোগ করেন ১৯৩৮ সালে ৭ দিনের জন্য। তারপর ১৯৪৮ সালে চার মাসের জন্য এবং ১৯৪৯ দুই দফায় ৯ মাস তিনি কারাগারে কাটান। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫২ সালে তিনি টানা ৭৮৭ দিন কারাগারে ছিলেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর বঙ্গবন্ধুকে ২০৬ দিন কারাভোগ করতে হয়। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির পর বঙ্গবন্ধু ১১ বার গ্রেপ্তার হন আবং টানা ১ হাজার ১৫৩ দিন তাঁকে কারাগারে কাটাতে হয়। এছাড়াও ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালে তিনি বারংবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, ১৯৩৯ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি যখন তিনি মুক্তি পান তার আগে তিনি ১ হাজার ২১ দিন কারাগারে ছিলেন ।

১৯৭১ সালে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দানের পরপরই বঙ্গবন্ধুকে আটক করে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা। স্বাধীনতার এ ক্রান্তিলগ্নে বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করে তারা স্বাধীনতার প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করে। তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে আটক করেই ক্ষান্ত হয় নি। তাঁকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দিতে শাসকগোষ্ঠী সর্বাত্মক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে । গ্রেপ্তারের পর তারা বঙ্গবন্ধুকে লাহোর থেকে ৮০ মাইল দূরে লায়ালপুর শহরের কারাগারে নিয়ে যায়। পাকিস্তানের উষ্ণতম স্থান লায়লাপুরের তাপমাত্রা তখন অসহনীয়, বন্দীদের জীবন তখন হয়ে উঠেছিলো দুর্বিষহ, ঠিক সে সময় জাতির পিতাঁকে তারা আটকে রেখেছিল নিঃসঙ্গ কারাগারের সেলে । তারা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেওয়ারও ষড়যন্ত্র করে। তারা চাইল বঙ্গবন্ধু কারাগারের বিরূপ পরিবেশে, মাত্রাতিরিক্ত গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ুক।

পরবর্তীতে প্রহসনের বিচারের আয়োজন করে তারা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ১২ দফা অভিযোগ গঠন করে যার ৬ টিতেই তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। সেখানেও জাতির পিতা দৃঢ় চেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সাজানো এ মামলার বিচারকার্যে তিনি কোনরূপ আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেননি। এমনকি পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া সরকারি উকিলকেও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার ঠিক প্রাক্কালে ৪ ডিসেম্বর জাতির পিতার বিচারের রায় ঘোষণার পর তাঁকে সামরিক বাহিনী মিয়ানওয়ালী কারাগারে নিয়ে যায়, তারা মৃত্যুদন্ডাদেশ পালনের প্রস্তুতি নিতে থাকে। তাঁর সেলের ঠিক পাশেই চলতে থাকে তাঁর জন্য কবর খোঁড়ার কাজ। আজ বাংলার স্বাধীন মাটিতে দাড়িয়ে আমরা কি ভাবতে পারি ঠিক সে মুহূর্তে বিশ্ব বিখ্যাত এই মহান নেতার কি অনুভূতি হচ্ছিলো? সারাটা জীবন ধরে যিনি বাংলার মানুষের মুক্তির সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছেন, সেদিন

স্বাধীনতার রঙিন সূর্য উদিত হওয়ার সময় তিনি ঠিক কী বলতে চেয়েছিলেন জাতিকে সে উত্তর জানবার কোন পথ আজ খোলা নেই।

তবে জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে বাঙালিকে যে স্থান বঙ্গবন্ধু দিয়ে গেছেন তার জন্য এ জাতির হৃদয়ের মণিকোঠায় তিনি অমর হয়ে থাকবেন। স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্রের সীমানায় বয়ে যাওয়া প্রতিটি ধূলিকতায়, নদীর প্রতিটি স্রোতের কিনারে, গাছের প্রতিটি পাতায় তাঁর নাম লেখা থাকবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মের সুবাস, তাঁর আত্মত্যাগ, তাঁর পরিবারের আর্তনাদ, তাদের রক্ত কোন কিছুই বৃথা যাবে না। ২০৪১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণ করে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবোই আর এ ক্ষেত্রে জাতির পিতার ত্যাগ আর নিষ্ঠাই হবে আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানঃ রাজনীতির এক মহান কবি

স্বরূপ মুহুরী
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন রাজনীতির এক মহান কবি। রাজনৈতিক জীবনের দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে তিনি এনে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বাংলার আকাশ শেখ মুজিবের কথা বলে, বাংলার মাটি শেখ মুজিবের কথা বলে, বাংলার জল শেখ মুজিবের কথা বলে। একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বঙ্গবন্ধু ক্রমান্বয়ে তার রাজনৈতিক দর্শন ও রাজনৈতিক আদর্শের আদলে এ দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলায় মনোনিবেশ করেন। একটি গণমুখী রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধু নিরলসভাবে কাজ করেন।

একাত্তরের আগে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ও রাজনৈতিক দর্শন ছিল একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সাত কোটি মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। পৃথিবীর মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর এক খন্ড জমি ছিল তার স্বপ্ন। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ছয় দফা, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এর সবই ছিল প্রধানত একটি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াই এবং লড়াইয়ের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক কৌশল।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরে সর্বাপেক্ষা বড় পদক্ষেপ ছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন। বঙ্গবন্ধুর দিক-নির্দেশনায় এ লক্ষ্যটি দ্রুতই অর্জিত হয়। পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নে যেখানে ৯ বছর সময় লেগেছিল, সেখানে মাত্র ১ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা যেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বাণীকে তুলে ধরে। ১৯৭৩ সালের ২৬ ফেরুয়ারি সিরাজগঞ্জের জনসভায় দেওয়া এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "শাসনতন্ত্রে লিখে দিয়েছি যে, কোনও দিনও আর শোষকেরা বাংলার মানুষকে শোষণ করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয় কথা, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। জনগণের ভোটে জনগণের প্রতিনিধিরা দেশ চালাবে, এর মধ্যে কারও কোনও হাত থাকা উচিত নয়। তৃতীয়, আমি বাঙালি। বাঙালি জাতি হিসেবে বাঁচতে চাই সম্মানের সঙ্গে। চতুর্থ, আমার রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ। মানো ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান তার ধর্ম-কর্ম পালন করবে, হিন্দু তার ধর্ম-কর্ম পালন করবে, বুদ্ধিস্ট তার ধর্ম-কর্ম পালন করবে। কেউ কাউকে বাঁধা দিতে পারবে না। তবে একটা কথা হলো, এই ধর্মের নামে আর ব্যবসা করা যাবে না।" শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কীভাবে একটি রাষ্ট্র পরিচালিত হবে তার

রূপরেখা বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণে বিদ্যমান। দুঃখী, মেহনতি মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখতেন তার বাস্তব প্রতিফলন এ ভাষণ এবং তারই স্বাপ্নিক প্রয়োগ ছিল ১৯৭২ এর বাংলাদেশের সংবিধান।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা প্রায় ১৪ মিনিট জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। যা ছিল জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। তিনি ডাক দিলেন দেশ গড়ার সংগ্রামের। উপস্থিত জনতা দু'হাত তুলে সেই সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ভাষণে কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, "বিশ্বকবি তুমি বলেছিলে, "সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি"। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তুমি দেখে যাও, তোমার আক্ষেপকে আমরা মোচন করেছি। তোমার কথা মিথ্যা প্রমাণিত করে আজ ৭ কোটি বাঙালি যুদ্ধ করে রক্ত দিয়ে এই দেশ স্বাধীন করেছে। হে বিশ্বকবি তুমি আজ বেঁচে থাকলে বাঙালির বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে নতুন কবিতা সৃষ্টি করতে।" বাঙালি জাতির প্রতি অবিচল আস্থা ছিল তার। স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিলেন, "এই বাংলাদেশে হবে সমাজতন্ত্র ব্যবস্থা, এই বাংলাদেশে হবে গণতন্ত্র, এই বাংলাদেশে হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।" মহান মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের সমর্থনকে আকুণ্ঠ চিত্তে তিনি স্বীকার করেন এ ভাষণে। তিনি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানান ভারত সরকার, সে দেশের জনগণ ও তাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে। কৃতজ্ঞতা জানান বৃটেন, জার্মানি, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে। আবার, বঙ্গবন্ধু মার্কিন জনগণকে ধন্যবাদ জানান, সরকারকে নয়, এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ফুটে ওঠে।

১৮ জানুয়ারি ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি আগেই বলেছি যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের যা প্রয়োজন আওয়ামী লীগের সে চারটি জিনিস- নেতৃত্ব, আদর্শ, সংগঠন ও নিঃস্বার্থ কর্মী রয়েছে। আমরা আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করেছি। আজ যে নতুন সংগ্রাম শুরু হয়েছে- দেশ গড়ার সংগ্রাম, দুঃখী মানুষকে বাঁচাবার সংগ্রাম, এ সংগ্রামেও আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। .... তাই আজ তোমাদের কাছে আমার আবেদন রইলো- গ্রামে গ্রামে কাজ কর। দুঃখের দিনে মানুষের পাশে দাঁড়াও। .... শুধু একটা কথা বলে যাই,- শেষ কথা আমার, যে কথা আমি বারবার বলেছি- সোনার বাংলা গড়তে হবে। এটা বাংলার জনগণের কাছে আওয়ামী লীগের প্রতিজ্ঞা। আমরা আওয়ামী লীগের কর্মীরা যখন বাংলার মানুষকে বলি তোমরা সোনার মানুষ হও, তখন তোমাদেরই প্রথম সোনার মানুষ হতে হবে, তাহলেই সোনার বাংলা গড়তে পারবা। আর যারা দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করছো, তারা বাংলার দুঃখী মানুষের কাছ থেকে সরে যেও না।" সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার বাস্তবায়নে দলের নেতা কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ভাষণ মূলত তার রাষ্ট্র দর্শনের পরিচয় বহন করে। সোনার বাংলা গড়তে হলে আগে সোনার মানুষ হতে হবে। এর চেয়ে বড় রাজনৈতিক দর্শন আর কী বা হতে পারে।

১৯৭৫ সালের ১১ জানুয়ারি সামরিক একাডেমিতে প্রথম শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানে কুমিল্লায় বিদায়ী ক্যাডেটদের উদ্দেশ্য দেওয়া এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আজ লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। ... মাঝে মাঝে আমরা অমানুষ হয়ে যাই। আমরা এত রক্ত দিয়ে দেশে স্বাধীনতা এনেছি। তবু অনেকের চরিত্রের পরিবর্তন হয়নি। ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, চোরাকারবারী আর মুনাফাখোররা বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তাদের জন্য আমি আমার জীবন কারাগারে কাটিয়ে দিয়েছি। তাদের দুঃখ দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই।" দেশের মানুষের দুঃখ, দুর্দশা নিয়ে একজন রাষ্ট্রনায়কের ভাবনা এখানে গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, চোরাকারবারী আর মুনাফাখোরদের হাত থেকে বাংলার সাধারণ জনগণকে রক্ষা করার সদিচ্ছা, প্রতিজ্ঞা বঙ্গবন্ধুর গণমুখী রাষ্ট্র চিন্তার স্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করে। বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধু তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাটিয়ে দিয়েছেন। আজীবন সংগ্রাম করেছেন বাংলার দুঃখী, মেহনতি মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য।

১৯৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি প্রথম পুলিশ সপ্তাহ ও বার্ষিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "সমস্ত সরকারি কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে তাদের সেবা করুন। যাদের জন্য যাদের অর্থে আজকে আমরা চলছি, তাদের যাতে কষ্ট না হয়, তার দিকে খেয়াল রাখুন। যারা অন্যায় করবে, আপনারা অবশ্যই তাদের কঠোর হস্তে দমন করবেন। কিন্তু সাবধান, একটা নিরপরাধ লোকের ওপরও যেন অত্যাচার না হয়। তাতে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। আপনারা সেই দিকে খেয়াল রাখবেন। আপনারা যদি অত্যাচার করেন, শেষ পর্যন্ত আমাকেও আল্লাহর কাছে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কারণ, আমি আপনাদের জাতির পিতা, আমি আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আমি আপনাদের নেতা। আমরাও সেখানে দায়িত্ব রয়েছে।"

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দায়িত্ব কী হবে, আইন-কৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্ব কী হবে এবং একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে নিজেকেও এর জন্য দায়ী করা নিঃসন্দেহে একটি আধুনিক রাষ্ট্র চিন্তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। "যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে, তাদের সেবা করুন"। এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সাধারণ জনগণের প্রতি সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছেন। সরকারি-কর্মচারীরা যাতে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ভুলে না যায়, তার জন্য বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ উত্তম রাষ্ট্রচিন্তার পরিচায়ক।

১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। সে ঘোষণায় দেওয়া বক্তব্যে তিনি বলেন, 'সত্যিকার অর্থে আমরা শতকরা পাঁচজন শিক্ষিত। শিক্ষিতদের কাছে আমার প্রশ্ন .... আমার কৃষক দুর্নীতিবাজ? না, আমার শ্রমিক? না। এই আমাদের মধ্যেই ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ। .... দুর্নীতিবাজ এই শতকরা ৫ জনের মধ্যে, এর বাইরে নয়। শিক্ষিত সমাজকে একটা কথা বলবো, আপনার চরিত্রের পরিবর্তন হয় নাই। আপনি চাকরি করেন, আপনার মাইনে দেয় গরিব কৃষক, আপনার মাইনে দেয় ওই গরিব শ্রমিক। আপনার সংসার চলে ওই টাকায়।

আপনার গাড়ি চলে ওই টাকায়...। ইজ্জত করে কথা বলুন, ওরাই মালিক ....।' জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এ ভাষণ ছিল একজন জনদরদী রাষ্ট্রনায়কের। যে ভাষণে কৃষক, শ্রমিক, মজুরকে রাষ্ট্রের মালিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যে রাষ্ট্রচিন্তায় সমাজের শিক্ষিত-চাকুরীজীবীদেরকে মালিকের প্রতি সম্মান রেখে কথা বলার জন্য এবং উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশনা দেওয়া হয় সে রাষ্ট্রই তো সত্যিকারের গণতান্ত্রিক, সে রাষ্ট্রই সত্যিকারের সমাজতান্ত্রিক। রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এ চিন্তা-ভাবনা সত্যিই অনুকরণীয়। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার পর থেকে বঙ্গবন্ধু দৃঢ় নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন। বিশ্বের মানচিত্রে একটি সুখী সমৃদ্ধ জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে তা ছিল বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন।

১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এদিন ভাষণের শুরুতেই তিনি বলেন, 'আজ এই মহামহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এই জন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ আজ এই পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়া বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহারা বিশ্বের সকল জাতির সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়া বাস করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন।'

তিনি বলেন, 'যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে, আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমাদের এই অঙ্গীকারের সাথে শহীদদের বিদেহ আত্মাও মিলিত হইবে।'

বাঙালি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং সে রাষ্ট্রের প্রভূত উন্নতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অনস্বীকার্য। বাঙালি জাতির এ অবিসংবাদিত নেতা সম্পর্কে কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো বলেছিলেন, "আমি হিমালয় দেখিনি, তবে আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসে এ মানুষটি হিমালয়ের সমতুল্য। আর এভাবেই আমি হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।' এভাবেই বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু হতে বিশ্ববন্ধু হওয়ার পথে যাত্রা করেছিলেন, স্বপ্ন দেখেছিলেন সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত সোনার বাংলার।

ঐ আসে মহামানব

মোঃ রাশিদুল হাসান জন
সহকারী পরিচালক, ৩৯ আনসার ব্যাটালিয়ন, কক্সবাজার

একজন মানুষ কখনো হয়ে যায়
অতুলন মহার্ঘ্য প্রতীক
তখন আমরা সবাই তাকে পতাকার মতো উড়াই
মহামূল্য নীলকান্তমণি নয় সে
যে প্রতিটি অনামিকা শোভিত করবে
আকাশি জৌলুশে।
বরং সে ঠিক সূর্যের মতোই একা।
প্রত্যেকেরই চোখের সামনে খোলা।
সবাইকে ছুঁয়ে আছে, আমরা পারিনি ছুঁতে।
প্রতিটি ব্যক্তিগত দিগন্তের মতো,
নিষ্ঠুর দূরায়ত অথচ কত কাছাকাছি।
(একান্ত মানচিত্র বাংলা, হাসান হাফিজুর রহমান)

উপরিউক্ত পঙক্তিগুলো মহান পুরুষ, বিজয়ী যশস্বী বীর বাঙালির ত্রাণকর্তা, বিশ্বমানবতার অফুরান প্রেরণার উৎস, নিষ্পেষিত মানবের কাজল, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্তুতি করে লেখা। লাখো মানুষের রক্তস্নাত পথ পেরিয়ে বাঙালি অর্জন করেছে মহান বিজয়। যে বিজয়ের পিছনে একটি নামই সকল প্রেরণার উৎস বঙ্গবন্ধু। যে নাম শুধু আজ নয় বাঙালি জাতি যতদিন থাকবে, পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন তা থেকে যাবে অপার বিস্ময় ও সকল মুক্তিকামী মানুষের জন্য অনন্ত প্রেরণা হবে তাঁর মুখনিঃসৃত অমিয় বাণী, তর্জনীর অনিন্দ্য সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতির মত প্রাণবান হয়ে বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি বলেছিলেন–

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

বাঙালি, ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বিশ্বের মূলধারার রাজনীতিবিদদের মধ্যে তিনি অন্যতম। মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ। রাজনীতি ও সৃষ্টির এ উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত। আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি আশৈশব তাঁর হৃদয়ে মানব মুক্তি লালন করেছিলেন এবং পরিণত বয়সে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাঙালি জাতির মুক্তির দিশারী হিসাবে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর ঐন্দ্রজালিক মোহনীয় নেতৃত্বই বাংলাদেশকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে, যে পথ হাজার বছরেও কেউ দেখাতে পারেনি।

মুজিব চরিত্রে ছিল আবেগ, বাগ্মিতা, সাহসিকতা ও ত্যাগের অপূর্ব সমন্বয়। মানুষকে কাছে টানার যাদুকরী কৌশল আর ভালবাসা তাঁকে অনন্য করে তুলেছিল। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সিদ্ধান্তে অটল থাকা, সর্বোপরি সমগ্র বাংলাদেশকে তিনি হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। ৫২, ৫৪, ৬৮, ৬২, ৬৬, ৬৯ এর বহু দূর্গম পথ হেঁটে ৭ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে সৃষ্টি করেছিলেন এক মাহেন্দ্রক্ষণ। যখন সারা বাংলার মানুষ এক হয়ে তাকিয়ে ছিল– সটান দাঁড়ানো, বুক ভরা বিশ্বাস, অসীম সাহসী, দৃঢ় দৃপ্ত পায়ে যিনি সংঘাতময় পরিস্থিতিতে জাতিকে মুক্তির পথ দেখাবেন, সেই মানুষ শেখ মুজিবের দিকে। এই মাহেন্দ্রক্ষণ কোন যাদুবলে এক নিমিষে আসেনি। এর পিছনে ছিল তাঁর দীর্ঘ জীবন সাধনা, একান্ত সাহসী ও দীপ্তিময় ত্যাগের অনড় সিদ্ধান্ত। ৭ মার্চের মহাকাব্যিক ভাষণে জাতির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আঠারো মিনিটের অগ্নিঝরা বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধের জন্য, স্বাধীনতার জন্যে বাঙালি জাতির সুতীব্র আকুলতা সব মানুষকে এক করে তুলেছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান সামরিক জান্তার হাতে গ্রেপ্তার হন ২৫ মার্চ রাতের দ্বিতীয় প্রহরে ১:৩০ মিনিটে। গ্রেফতারের পূর্বেই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বাঙালির পরম প্রাপ্তির অনাবিল নবযুগের সূচনা হয় এই মহৎ ঘোষণার মাধ্যমে। এক দিকে মহান মুক্তিযুদ্ধ, পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম গণহত্যার মুখোমুখি বাংলাদেশ। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তান্ডবলীলায় বিধ্বস্ত পুরো দেশ। তবু দমে যায়নি বীর বাঙালি। উদ্যম, উল্লাসে দেশকে স্বাধীন করার ব্রত নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। বঙ্গবন্ধু জীবিত না মৃত এই খবর কেউ জানে না। মার্চে গ্রেফতারের পর থেকে তিনি মিয়ানওয়ালি কারাগারে বন্দী থেকে বাংলদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছেন। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নিন্দা ও আন্তর্জাতিক চাপ থাকা স্বত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধুর বিচারের ঘোষণা দেন। ২ আগস্ট বিচারের জন্য সামরিক আদালত গঠন করা হয়। লায়ালপুর কারাগারে সামরিক কারাগারে ১১ আগস্ট বিচার কাজ শুরু হয়। সামরিক আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মোট ১২টি অভিযোগ আনা হয়। এর মধ্যে ৬টি অভিযোগ মৃত্যুদণ্ড চাওয়া হয় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে কিছু না জানিয়ে অত্যন্ত গোপনে বিচার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে সামরিক আদালতে বিচারের রায় প্রকাশিত হয়। ঘোষণা করা হয় বিচার শেষে বঙ্গবন্ধুকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে। বিচার শেষে তাকে লায়ালপুর কারাগার থেকে পুনরায় মিয়ানওয়ালি কারাগারে প্রেরণ করা হয়। সেখানে বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির দ্রুত কার্যকরের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই লক্ষ্যে তাঁর সেলের পাশে একটি কবরও খোঁড়া হয়।

ইতোমধ্যে পাকিস্তানের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যায়। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সনে মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীর কমান্ডারদের নিকট পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পন করে। এই পরাজয়ে জেনারেল ইয়াহিয়ার ক্ষমতা নড়বড়ে হয়ে যায়। তিনি ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন।

পাকিস্তানের পরাজয়ে ক্ষমতা পালাবদলে জুলফিকার আলী ভুট্টো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেন। ২০ ডিসেম্বর ক্ষমতা গ্রহণ করে দৃশ্যপটে তিনি চলে আসেন। গৃহবন্দী হন ইতিহাসের

কালো অধ্যায় সৃষ্টিকারী ইয়াহিয়া খান। ক্ষমতা হারানোর শেষ মুহূর্তেও তিনি বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরিকল্পনা থেকে সরে আসেন নি। তিনি প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর নিকট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার অনুমতি চান। তিনি বলেন, "আমার জীবনে যদি কোন ভুল থাকে তা হল শেখ মুজিবকে ফাঁসির কাষ্ঠে না ঝোলানো।" কিন্তু ভুট্টো সে সুযোগ দেননি। ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই তিনি মিয়ানওয়ালী কারাগারের প্রিজন গভর্নর হাবিব আলীর নিকট বার্তা পাঠান যেন বঙ্গবন্ধুকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। রাওয়ালপিন্ডি থেকে ২৫ কি. মি. দূরে সিহালা এলাকার রেস্ট হাউজে ২৩ ও ২৭ ডিসেম্বর দু'দফায় বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাত করতে আসেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। এ সময় ভুট্টোকে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন বঙ্গবন্ধু। তিনি ভুট্টোকে প্রশ্ন করেন, "তাকেও বন্দী করা হয়েছে কিনা?" আমি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট।" বঙ্গবন্ধু অবাক হয়ে বলেন, "তুমি কিভাবে প্রেসিডেন্ট হও, যেখানে তোমার চেয়ে আমি দ্বিগুণ আসন পেয়েছি।" ভুট্টো উত্তরে বললেন, "তুমি যদি চাও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পার।" দৃঢ় কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু জবাব দেন, "আমি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চাই না, আমি যত দ্রুত সম্ভব আমার দেশের মানুষদের কাছে ফিরে যেতে চাই।" "এজন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করা হবে"– ভুট্টো জানালেন। দ্বিতীয় সাক্ষাতে ভুট্টো ভ্রাতৃত্বের দোহাই, দুই পাকিস্তানকে এক রাখা, কনফেডারেশন করা ইত্যাদি নানাবিধ প্রস্তাব দেন। সকল প্রস্তাব বঙ্গবন্ধু অগ্রাহ্য করে তিনি দেশে ফিরে আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। ভুট্টো সরকার অবশেষে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ৩ জানুয়ারি ১৯৭২ করাচিতে লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে এক জনসভায় ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়ার কথা বলে তাদের মতামত জানতে চান। উপস্থিত জনতা মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে সম্মতি প্রকাশ করে। এ সময় ড. কামাল হোসেন পাকিস্তানের হরিপুর কারাগারে বন্দী ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ড. কামাল হোসেনকে মুক্তি দেয়া হয়। ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ রাত ১১ টায় বঙ্গবন্ধু ও ড. কামাল হোসেনকে রাওয়ালপিন্ডি বিমান বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরো বিমান বন্দর ব্ল্যাক আউট করে পিআইএ এর একটি বিশেষ বিমানে তাদের লন্ডনে পাঠানো হয়। তবে এ ব্যাপারে কিছুই জানানো হয়নি তাদেরকে। রাত দুইটায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মুক্ত আকাশে উড়াল দেয় বিমানটি। সেই সাথে শুরু হয় এক নতুন ইতিহাস, এক নতুন যুগের। পরিসমাপ্তি ঘটে পাকিস্তান নামক শাসকগোষ্ঠীর। বিমান লন্ডন এয়ারপোর্টের কাছাকাছি পৌঁছালে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে একটি বার্তা পাঠানো হয়।, যাতে লেখা- শেখ মুজিবুর রহমান সাতটার দিকে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন।

৯ জানুয়ারি বিমানটি হিথ্রোর বিমান বন্দরে অবতরণ করলে বঙ্গবন্ধু প্রথম মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করেন। প্রথমে তিনি ভিআইপি লাউঞ্জে আসেন। এখানেই উপস্থিত লোকদের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা জানতে পারেন। ভিআইপি লাউঞ্জ থেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে ব্রিটিশ সরকারের সম্মানিত অতিথি হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যারিজেস হোটেলে। এখানে তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে বিশ্ববাসীর কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথমে যে আকাঙ্ক্ষা বাঙালি হৃদয়ে জেগে উঠেছিল, তা হল নেতাকে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। বঙ্গবন্ধু ফিরে না এলে স্বাধীনতা যেন অপূর্ণই

থেকে যাবে। তখনো চারদিকে পাকিস্তানি হায়েনাদের বিভৎস অত্যাচারের চিহ্ন, লাশ, কান্না আর স্বজনের খোঁজে হাহাকার। জীবন পুরো মাত্রায় জেগে উঠেনি। সাঁঝবাতি জ্বলে উঠেনি কোনো বাড়িতেই। তবু তাঁর মুক্তির খবর পেয়ে বাঙালির চেতনায় আবারো জয়ের উচ্ছ্বাস বেজে উঠে মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে সুরের মূর্ছনার মত। যুগপৎ আনন্দ বেদনা-হাহাকার চিৎকার করে মানুষ বলে উঠে, 'জয় বাংলা'। অতঃপর বীরের বেশে ফেরার পালা। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি প্রহর গুনছে তাঁর আগমনের। ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান বহরের কমেট জেট ৯ জানুয়ারি ১৯৭২, বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার জন্য রওনা হন। যাত্রাপথে তিনি দুই ঘন্টার যাত্রা বিরতি করেন দিল্লিতে। এ সময় ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি. ভি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। অবশেষে ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পন করেন দেশ মাতৃকার শ্রেষ্ঠ সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান। দেশের মাটিতে পা রেখে আবেগে তিনি কেঁদে উঠেন। তেজগাঁর বিমানবন্দর থেকে তিনি রেসকোর্স ময়দানে এসে পৌঁছান। এ সময় মুক্তিযোদ্ধাসহ মুক্তিকামী লাখো বাঙালি অশ্রুসজল নয়নে বরণ করে নেন ইতিহাসের এই বরপুত্রকে। যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তাঁদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আগামীর বাংলাদেশ নিয়ে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। বক্তব্যের এক পর্যায়ে লাখো মানুষের উদ্দেশ্যে কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলে উঠেন, "বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ তুমি বলেছিলে, সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করনি।" হে কবি, তুমি দেখে দাও আমার বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে। আজ তুমি জীবিত থাকলে বাঙালির বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে নতুন কবিতা লিখতে।

এই হল বঙ্গবন্ধু, সময়ের প্রয়োজনে যিনি মানব থেকে মহামানবে পরিণত হয়েছেন। হয়েছেন বাঙালি জাতির মুক্তিদাতা, দিয়েছেন আমাদের এক স্বাধীন পতাকা। সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর মহান কীর্তিতে স্মরণ করে লিখেছেন-

যতকাল রবে পদ্মা, যমুনা, গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।
দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা রক্ত গঙ্গা বহমান
তবু নাই ভয়, হবে হবে জয়, জয় মুজিবুর রহমান।

তাইতো সৈয়দ শামসুল হকের মত আমারও বলতে ইচ্ছে করে–

এই ইতিহাস ভুলে যাবে আজ
আমি কি তেমন সন্তান
যখন আমার জনকের নাম
শেখ মুজিবুর রহমান।

তথ্যসূত্র

সরকার, মোনায়েম, হাসান, সৈয়দ জাহিদ চৌধুরী, আব্দুল গাফফার। *বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শত প্রবন্ধ*।

আহমেদ, তোফায়েল (২০২০)। *জনকের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন*, প্রথম আলো (১০ জানুয়ারি ২০২০)

মকসুদ, সৈয়দ আবুল (২০২০)। *বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংহত করে*, প্রথম আলো (১০ জানুয়ারি, ২০২০)

হক, মফিদুল (২০২১)। *পাকিস্তানি কারাগারে বঙ্গবন্ধু*, প্রথম আলো (২৬ মার্চ, ২০২১)।

শিকল পায়ে পথচলা

সব্যসাচী মজুমদার
সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা

ভোরের নতুন সূর্য যাকে আহ্বান করে নতুনকে আলিঙ্গন করার, নীড়হারা পাখি যার বয়ে নিয়ে আসে গভীর অরণ্যের সবুজের বার্তা, প্রবাহমান নদী যাকে পথ দেখায় দিগন্তে হারিয়ে যাওয়ার তার গতি রোধ করার ক্ষমতা কে রাখে! এমন স্বার্থক জনম যেমন ইতিহাসে বিরল তেমনি হয়তোবা এমন জনমই এক ইতিহাস। যেমনই ইতিহাস ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। যে ইতিহাস ইতিহাসকে ছাপিয়ে হয়েছে কিংবদন্তি যে ভূখণ্ডে জন্মই ছিলো এক আজন্ম পাপ সেখানে নিজের জন্মকে করেছে মহিমান্বিত। স্বার্থক জন্ম দিয়েছে এক জাতিসত্তার, ইতিহাসকে বদলে দিয়ে সৃষ্টি করেছে নতুন এক জাতি রাষ্ট্রের- নাম তার বাংলাদেশ। আর একজন মানুষের শিকল পরা পায়ের পথ চলাই হল এই বাংলাদেশের জন্ম নেওয়ার পথের বাঁক।

একুশ শতকের বটতলায় বসে বিংশ শতকের ডামাডোলের আওয়াজ আমি আজও শুনতে পাই, ভালোভাবে কান পেতে থাকলে সেই ডামাডোলের আওয়াজ এর মাঝেও শুনতে পাই এক দিপ্ত পায়ের পথচলা, শুনতে পাই এক বজ্রকণ্ঠের নিনাদ- কেউ একজন কালের ধুলিমাখা পথ ধরে হাটছেন আর অবারিত ডাকছেন আর বলছেন -"ওঠ ,জাগো আর ঘুমিয়ে থেকো না ,সময় এখন বিদ্রোহের, সময় এখন বিপ্লবের। এই ধুলো মাটির সোঁদা গন্ধ তোমার মায়ের গন্ধ, এই গন্ধকে গায়ে মেখে নাও। এমনি করে ভাবতে থাকলে ভাবনার আর সমাপ্তি আসবে না। শুরু করা যাক পথে চলার, ঘুরে আসি সে ধূলিমাখা পরের বাঁকে।

গত শতাব্দীর শুরুর দিকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন তখন মধ্য গগনে। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে তখন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে আন্দোলন। একদিকে শিকল ভাঙার বিপ্লব যেমন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে দাবানলের ভস্মের স্তূপ। আগুনের ছাই ছেয়ে দিয়েছিল সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে। বিপ্লবের রক্তমাখা আর ভস্মের কালিমা মিলে চারদিক থেকে গিয়েছিল এক বিচিত্র ধোঁয়াশায়। যে ধোঁয়াশায় পথ হারানো পথিক হন্নে হয়ে খুঁজতে থাকে এক নতুন পথের দিশা।

দূরবীনে চোখ লাগিয়ে নাবিক দূর দিগন্তে থেকে তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চেষ্টা চালালেও ছাইয়ের স্তূপ এতটাই বড় আর উচুঁ হয়ে উঠছিল মাঝে মাঝেই যে নাবিকের লক্ষ্য যেন তার পায়ের কাছেই থেমে যাচ্ছিলো। থেকে থেকে এই ছাইয়ের কালিমা অনেকটা ব্লাকহোলের মতন টেনে নিয়ে যাচ্ছিল অনেক মানুষের মনুষ্যত্ব আর বিবেকবোধ। উচ্ছ্বসিত জাতিসত্তায় বলীয়ান হওয়ার পথেই যেন হিন্দু মুসলমানের অবিশ্বাস আর ঘৃণাও

চরমে পৌঁছায়। চারদিকে যখন দ্বিধা , দ্বন্দ্ব আর হিংসা- প্রতিহিংসা চরমে তখন কেউ একজন খুঁজে চলেছেন সঠিক পথের দিশা। খুঁজে চলেছেন এমন এক নাবিকের সন্ধান যে দিবে তাকে দিগন্তের পথ বাতলে।

এমন একজনের সাথে দেখা হয়েছিল সেই তরুণ বয়সে। নাম তার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। চিন্তা-ভাবনা আর কথায় যেন তাকে মনে হয় আলাদা একজন। পথিক গেলেন তার কাছে । মেনে নিলেন নিজের রাজনৈতিক গুরু হিসেবে। সোহরাওয়ার্দী দেখলেন ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি উচ্চতার দীর্ঘ এক যুবক। চোখের মধ্যে যার ধীর স্থিরতা, রক্তে যার টগবগে বিপ্লবের বাষ্প। গুরু শিষ্যের এই মহামিলন দুজনকে দিল এক অবারিত আনন্দ। কথায় বলে ঈশ্বরের এক বৃহৎ পরিকল্পনা রয়েছে । আর সকল ঘটনাটি সে বৃহৎ পরিকল্পনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বটে। পেছন থেকে দেখলে আমাদের জীবনটাকে মনে হয় যেন জীবন সাজানো কিন্তু চলমান ঘটনার মুহূর্তে তা শুধুই আকস্মিকতা আর সামগ্রিকভাবে সে হয় কতগুলো আকস্মিকতার গাঁথামালা। পুরো মালাটা যদি হয় আজকের বাংলাদেশ, তাহলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর এর জীবনের প্রতিটি ঘটনা সে মালার একটি একটি ফুল। সমগ্র জীবনব্যাপী শেখ মুজিবকে শিকল পায়ে জড়িয়ে হেঁটেছেন বেলাশেষে সে শিকলটি হয়েছে এই মালার সুতা আর শেখ মুজিব নিজে হলেন সূতিকাগার । তাইতো সে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, বাঙালি জাতির পিতা।

চল্লিশের দশক রাজনীতিতে তখন এক টালমাটাল অবস্থা। সারা পৃথিবীতে চলমান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। পৃথিবীব্যাপী দীর্ঘদিনের চলমান ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে সংগ্রাম, বিদ্রোহ আর বিপ্লব । মানুষ শুধু ছুটছে আর ছুটছে। বিশ্ব রাজনীতির পট পরিবর্তন হচ্ছে দিনে-রাতে, পরিবর্তন হচ্ছে স্থানীয় রাজনীতি আর সামাজিক ব্যবস্থার। এমনই বাস্তবতায় শেখ মুজিব পড়াশোনা করেছেন কলকাতা ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। কলকাতা তখন ভারতীয় রাজনীতির আঁতুড়ঘর। দিল্লী-করাচি কিংবা ঢাকার রাজনীতির বড় অংশই তখন ধর্মীয় বিভাজনকে কেন্দ্র করে আবর্তন করছে। তার মাঝে কলকাতার স্বকীয়তাই হলো বহুমতবাদের মেলবন্ধন। রাজনীতির কর্তা-ব্যক্তিদের মাঝে এখানে উগ্র মৌলবাদের সমর্থক যেমন ছিল তেমনি ছিলেন প্রগতিবাদী, সমাজতন্ত্রবাদী আবার কেউ কেউ ছিলেন পুঁজিবাদী। সোহরাওয়ার্দী সাহেব বিলেতে পড়াশোনা করেছেন দীর্ঘদিন। রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন এই গণতন্ত্রে। তার ছত্র-ছায়ায় বিকশিত হতে থাকে প্রত্যন্ত গ্রামের জীবনে বেড়ে ওঠা শেখ মুজিবের চিন্তাধারা।

শেখ মুজিব তখন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রসংসদের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক। ছাত্র সমাজের মাঝেও রাজনৈতিক বিভাজন ছিল অনেকটাই অবশ্যম্ভাবী। শহরের এক দিকে আগুন জ্বলছে বন্দে মা তরম ধ্বনিতে, অন্যদিকে আগুন জ্বলছে হর হর মহাদেব কিংবা জয় শ্রীরাম কিংবা আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে। তার মাঝে নিজের অদম্য প্রচেষ্টায় মুষ্টিমেয় কিছু ছেলে আগুন নিভাতে ব্যস্ত, হাতেগোনা কয়েকটা ছেলে স্বাধীনতা চায় কিন্তু তা আবার সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে বিচরণ করে নয়। শেখ মুজিব সেই আগুন নিভানোর দলের অগ্রপথিক। সে আগুন জ্বালাতে চায় শোষকের সিংহাসনে, শোষিতের ঘরে নয়। তিন দশক পরেও তাইতো সে বলেছিল,“ বিশ্ব আজ দুই ভাগে

বিভক্ত একদিকে শোষক আর অন্যদিকে শোষিত। আমি সেই বঞ্চিত, শোষিত মানুষের নেতা।

এমনই বাস্তবতায় ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান আর তার এক দিন পরে ভারত নামের নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয় বিশ্ব মানচিত্রে। পাকিস্তানের জন্ম মুজিবের মনকে যতটা দিয়েছিল স্থিরতা তার চেয়ে অনেক বেশি করেছিল বিক্ষিপ্ত। পাকিস্তান জন্মের সাথে সাথে দীর্ঘদিনের ক্লান্ত-শ্রান্ত বিপ্লবীরা স্বপ্নভঙ্গের ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ আর অবসন্ন। তাদের এই ঝিমিয়ে পড়ার সুযোগ বুঝে সুবিধাবাদীরা আর তোষামোদকারীরা বনে বসল রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রক । ঢাকার রাস্তায় হাঁটছেন আর ভাবছেন, চারিদিকে নতুন এক জাগরণ কিন্তু জাগরণ তো আর জাগরন নয় বরং আফিমের নেশায় বুদ হয়ে মরীচিকায় বিচরণ। ঘুমিয়ে থাকা মানুষকে জাগানো যায় কিন্তু যে জানে না সে ঘুমিয়ে আছে তাকে কিভাবে জাগাবে? অন্ধকে পথ দেখানো যায়, কিন্তু যে জানে না সে চোখে দেখে না তাকে কী করে পথের দিশা দেয়া সম্ভব?

হতাশায় ভারাক্রান্ত পথিক আজ হতাশাকেই শক্তিতে পরিণত করার জন্য অদম্য প্রয়াস নিয়ে নতুন করে পথ চলার কর্মপরিকল্পনা শুরু করেছে। ঢাকায় এসে একত্রিত করতে শুরু করলেন প্রগতিশীল ছাত্রদেরকে । আবার নতুন কর্মপরিকল্পনা।

আবার নতুন করে পথ চলা। সমমনাদের একত্রিত করে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি তারিখে প্রতিষ্ঠিত করলেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ। শেখ মুজিব বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু রাতারাতি আমূল পরিবর্তন নয় বরং ধীরে ধীরে মানুষের অন্তর্গত পূর্ণ পরিবর্তনই ছিল তার লক্ষ্য আর আদর্শ। তাই তিনি চেয়েছিলেন নতুন ধারার রাজনীতির প্রতিষ্ঠিত হোক এই দেশে। যে রাজনীতি কথা বলে সকল মানুষের, যে রাজনীতি চিন্তা করে সকল মানুষের অধিকার আর মর্যাদার। কিন্তু কালের যাত্রায় তখন দেশের চালক একজন ভণ্ড ধর্মবাদী আর বুর্জোয়াদের দখলে। তাদেরকে অন্ধের মত বিশ্বাসীরা দেশের প্রতিটি কোণে কোণে তখন সরব। শেখ মুজিব জানতেন এই নেশার ঘোর কাটানো ব্যতীত এদেরকে সঠিক পথে আনা অসম্ভব আর রাজনৈতিক বিপ্লব ব্যতীত কোনো দিন কোনো স্থায়ী সমাধান আনা অসম্ভব ।

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন এই দিনের বিশেষত্ব বর্ণনার পূর্বে ফিরে যেতে চাই প্রায় দুইশত বছর পূর্বে। পলাশীর প্রান্তরে ডুবেছিল বাংলার স্বাধীনতার সূর্য। নেশাগ্রস্তদের মত নির্বাক দাঁড়িয়ে বাঙালি দেখল চারদিকে ব্রিটিশ বেনিয়াদের জয়োল্লাস। বুঝতেই পারল না এর সাথে হারিয়ে গেল একটি জাতির জাতিসত্তা, বুঝতেই পারল না আজ থেকে হারিয়ে গেল তাদের স্বকীয়তা। ২০০ বছর পার হয়ে গেলেও আফিমের নেশা যে আর কাটছে না। বিশ শতকের ঠিক মাঝামাঝি এই ২৩ জুন তারিখে গণতন্ত্র মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার উচ্ছ্বসিত বাসনা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' । কারাবন্দি মুজিব জেলে বসে হলেন দলের যুগ্ম সম্পাদক। শোষক দেখতে পেল এক অশনি সংকেত।শুরু হলো দলের সর্বোচ্চ নেতাদের গ্রেপ্তার আর আটক। জেল জীবনের অনিশ্চয়তা কতটা ভয়ঙ্কর

ছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ নবগঠিত এ দলের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক সাহেব। এই অনিশ্চয়তা বয়ে বেড়াতে না পেরে হয়ে গেলেন মানসিক বিকারগ্রস্ত। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক অভিভাবক তাকে বললেন বাহিরের কিছু কাজ সমাপ্ত করে পুলিশের হাতে ধরা দিতে। বিভিন্ন বেশে ঘুরে ঘুরে বাইরে থাকছেন শেখ মুজিব। পালিয়েছেন কিন্তু হারিয়ে যাননি। ছুটে চলেছেন নিজের অভিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে। এদিকে প্রগতিশীল ছাত্র সমাজ তখন ভাষার দাবিতে আস্তে আস্তে ফুসে উঠেছে। শেখ মুজিবের গ্রহণযোগ্যতা ইতোমধ্যে সেই সকল ছাত্রদের মাঝে অন্য সবার চেয়ে অনেক বেশী। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে তাদের একতাবদ্ধ করে আলোর পথের দিশা দিতে থাকলেন তরুণ শেখ মুজিব।

১৯৫২ সাল জেলে বন্দী একটু তরুণ আমরণ অনশনের ঘোষণা দিলেন। জেলের কর্মকর্তারা কোনক্রমে তাকে বোঝাতে পারলেন না অনশন ভঙ্গ করতে। বাইরের রাজপথ তখন রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই দাবিতে মুখরিত। ভাষার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্র জনতার বুকে রক্তে রঞ্জিত হল ঢাকার পিচঢালা রাজপথ। অন্যদিকে, জেলের চার দেয়ালে বন্দী এক ছেলে অবারিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে বদ্ধপরিকর। বাংলা হরফে শিকল পায়ে পথ চলার এই কাহিনী লেখার অধিকার অর্জন করেছি এমনই নির্মম ইতিহাস পেরিয়ে।

ধীরে ধীরে আসল ১৯৫৪ সাল। সময়ের ব্যবধান সামান্য কিন্তু অনেক দীর্ঘ সে পথ। অনেক দীর্ঘকালের ব্যবধান যেন পৌছে দিয়েছে এই দিনের কাছে। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে জয়লাভ করলো বাঙালি; তার সাথে রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণী। যেখানে কিছুদিন আগেও সকল নিয়ামক আর নিয়ন্ত্রক ছিল উচ্চবিত্ত রাজা, জমিদার আর তাদের সামন্তবর্গ সেখানে সেটা মধ্যবিত্ত বাঙালি সম্প্রদায় হয়েছে আজ গুরুত্ববহ। জন্ম নিতে শুরু করলো জাতীয়তাবাদের। মাত্র ৫৬ দিন রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হয় বাঙালির ছেলেরা কিন্তু এই নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের মাঝে আত্মস্বীকৃতির অদম্য প্রয়াস জন্মলাভ করে। শেখ মুজিব বুঝলেন হারিয়ে যাওয়া পথভ্রষ্ট পথিকেরা আবার আস্তে আস্তে পথের দিশা খুঁজে পেতে শুরু করেছে।

এভাবেই পাওয়া না পাওয়ার দোলাচলে চলে যাচ্ছিল আরো একযুগ। কখনোবা জেলে, কখনোবা গৃহবন্দী থেকেই যাচ্ছিল শেখ মুজিবের দিন, মাস আর বছর। তাতে কী? রাস্তার শেষ ঐ এক জায়গায় আর তাহলো ভাগ্যপীড়িত বাঙালি জাতির স্বাধীনতায়। ১৯৬৬ সালের ২৫ ফেরুয়ারি শেখ মুজিব ঘোষণা দিলেন বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফা। মনের মাঝে এক দফা নিয়ে চলমান মুজিব ছয় দফা কে নিয়েছিলেন এক সাঁকোর মতন। পরাধীনতা আর স্বাধীনতার মাঝের সাকোঁ হলো শেখ মুজিবের ঘোষিত ছয় দফা। আবার বন্দী হলেন শেখ মুজিব। কিন্তু শোষিতদের বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে সে যে বিপ্লবের বীর বাঙ্গালীর হৃদয়ে শেখ মুজিব বপন করেছিলেন সেই বীজ ততদিনে ডালপালা বিস্তার করে মহীরুহের মতো জেঁকে বসেছিল। মুজিব তখন আর কোনো ব্যক্তি বিশেষ নয়, তখন এক চেতনার নাম। ৮মে শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হলেও ৭ জুন তারিখে ৬ দফার দাবিতে জীবন দিল দেশের ছাত্রনেতা, শ্রমিকনেতাসহ নানান শ্রেণী-পেশার মানুষ।

এর মাঝে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে হত্যার পায়তারা শুরু করল শোষকের দল। জনতার ঢলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় শোষকের দেয়াল। জনতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজটিকা গ্রহণ করলেন শেখ মুজিব। হয়ে উঠলেন শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু।

সবার মাঝে থেকে সবাইকে ছাপিয়ে যাবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। শিকল পায়ে পথচলার তার যে ঝনঝনানি তা যেন নিনাদ সৃষ্টি করেছিল দিকে দিকে। আর সেই ঝনঝনানির নাম স্বাধীনতা। একজন মানুষের শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠা আর এক পরাধীন জাতির স্বাধীনতা তাই একসূত্রে গাঁথা।

ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু

আতিক মাহমুদ
সহকারী মহা-হিসাব রক্ষক, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমী, ঢাকা

"আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় তিনি হিমালয়ের মতো।"

– ফিদেল ক্যাস্ত্রো[১]

বাংলাকে তিনি ভালবেসেছিলেন, বাংলার মাটি আর মানুষও তাঁকে ভালোবেসেছিল। জনগণের দাবি আদায়ের সংগ্রামে নিবেদিত প্রাণ, স্বকীয়তার প্রশ্নে আপোষহীন, সম্মোহনী নেতৃত্ব আর অনন্য সাহসিকতার মূর্ত প্রতীক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন হাজার বছরের ঘুমন্ত বাঙালির স্বাধীনতার কাব্য। "এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" রক্তে আগুন ধরা সেই জ্বালাময়ী ভাষণে সাড়ে সাত কোটি মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে।

কেবল একটি ভূখন্ডের সার্বভৌমত্বের জন্য তিনি জীবনের ভোগ বিলাস অবলীলায় ত্যাগ করে কঠিনকে ভালবেসেছেন তা নয়, তিনি চেয়েছিলেন গণমানুষের প্রকৃত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্বাধিকার; সত্যিকার ব্যক্তিসত্তার অর্থময় স্ফূরণ। "এই স্বাধীনতা তখনই আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে, যেদিন বাংলার কৃষক, মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।[২] বঙ্গবন্ধু আরও বলেছিলেন, "সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুখ, শান্তি ও স্বপ্ন এবং আশা আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি।"[৩]

করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "স্যার আপনি দেখবেন ওরা 'পূর্ব বাংলা' নামের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে আপনারা এটাকে বাংলা নামে ডাকেন। 'বাংলা' শব্দটার একটা ইতিহাস আছে, আর এর একটা ঐতিহ্য।" [৪]

রাষ্ট্রভাষা, স্বায়ত্তশাসন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলার সর্বস্তরের মানুষের বিশ্বাস আর ভালবাসা তিনি পেয়েছিলেন; হয়ে উঠেছিলেন তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। জেল-জুলুম, ফাঁসির মঞ্চ, কোনো কিছুই তাঁর অদম্য সাহস আর ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়াতে পারেনি।

বঙ্গবন্ধুকে বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে কাদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন রাজনীতিতে, তাঁর রাজনীতির হাতেখড়ি হয়েছিল কিভাবে, কোন মহান মানুষদের মাধ্যমে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারের। নিজের রাজনৈতিক

গুরু হিসেবে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' তে তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন মহান নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। মহাত্মা গান্ধী, মাও সেতুং, শের-এ-বাংলা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ মনীষী তাঁর মানসপটে স্থায়ী প্রভাব রেখেছিলেন। কিন্তু যে জায়গায় সকলকে ছাপিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অনন্য, তা হল তিনি জনগণের হৃদয়ের চাওয়াকে রাজনৈতিক রূপদান করতে পেরেছিলেন। হাজার বছর ধরে ঘুমিয়ে থাকা বৈদেশিক শক্তির দ্বারা শাসিত বাঙালির হৃদয়ের কান্না তিনি শুনতে পেরেছিলেন কেবল তাই নয়, তিনি তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা, ক্যারিশমাটিক নেতৃত্ব, মানুষের প্রতি ভালবাসা এই তিনটি বিষয়কে একত্র করে সৃষ্টি করেছিলেন এক অভূতপূর্ব দ্যোতনা, যে দ্যোতনা ঘুমন্ত বাঙালিকে জাগিয়ে বলেছিলো "তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা, যমুনা।" না, বাংলার মানুষ নিঃস্বার্থ ত্যাগী এই মানুষটাকে চিনতে ভুল করেনি। তাই যখন 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়' জেলে বন্দি বঙ্গবন্ধু তখন তারা মিছিলে বলতে লাগলো "জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো।"

১৯৩৮ সালে ১৮ বছর বয়সে তিনি প্রথমবারের মতো সান্নিধ্যে আসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর। [৫] সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁর পথ চলার সেই শুরু। তখনকার সময়টা বেশ ভিন্ন এক প্রেক্ষাপট। উপমহাদেশ তখন ব্রিটিশ শাসিত, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের টানাপোড়েন খুব সুস্পষ্ট, সময়টা বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষিতেও তাৎপর্যপূর্ণ। ঔপনিবেশিক ব্যক্তিগুলো তখন ক্রমশ দূর্বল হতে শুরু করেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজছে, পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণ আর ব্রিটিশ শাসনের অধীন থাকতে রাজি নন। বঙ্গবন্ধু তখন জড়িয়ে পড়েন সক্রিয় রাজনীতিতে; মুসলমানদের বাঁচাতে হলে পাকিস্তান আনতে হবে এ গভীর বিশ্বাস নিয়ে 'লাহোর প্রস্তাব' এর স্বপক্ষে জনমত গঠনে ব্রতী হলেন মেট্রিক পরীক্ষা পাশের (১৯৪১) পর।

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনকে পর্যালোচনা করি তবে একজন মহান নেতার অঙ্কুরোদগমকে দেখতে পাই। পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩) এ বাংলার প্রায় ৩০ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যান। ব্রিটিশ সরকার সৃষ্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন এ দুর্ভিক্ষের সময় সোহরাওয়ার্দী ছিলেন সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী। বঙ্গবন্ধু লেখাপড়া ছেড়ে বাংলার দুঃখী মানুষের জন্য ঝাপিয়ে পড়েন, লঙ্গরখানা খুললেন অনেকগুলো, কাজ করে চললেন নিপীড়িত মানুষের মুখে অন্তত একবেলা খাবারের জন্য। বাবা শেখ লুৎফর রহমানের একটি কথা তিনি আজন্ম বুকে লালন করেছেন। "একটা কথা মনে রেখ, 'Sincerity of purpose and honesty of purpose' থাকলে জীবনে পরাজিত হবা না।"[৬]

দেশভাগের আগে গোপালগঞ্জের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুর পিতার কাছে ছেলেকে সামলানোর কথা বলেছেন। কিন্তু নিজের পুত্রের প্রতি অবিচল আস্থা থেকে তিনি বলেছিলেন, "দেশের কাজ করছে, অন্যায় তো করছে না; যদি জেল খাটতে হয়, খাটবে; আমি দুঃখ পাব না। জীবনটা নষ্ট নাও তো হতে পারে, আমি ওর কাজে বাধা দিব না। আমার মনে হয় পাকিস্তান না আনতে পারলে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না।" [৭]

স্বপ্ন যেমন থাকে, তেমন থাকে স্বপ্নভঙ্গও। যে প্রত্যাশা নিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষ মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছিল, ১৯৪৭ সালের আগস্টে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর সেই আশার অপমৃত্যু ঘটে। পূর্ব বাংলার মানুষকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকলক্ষেত্রে দাবিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রে শামিল হয় আমলাতন্ত্র, সামরিক বাহিনী ও পুঁজিবাদী শোষক শ্রেণির জনবিচ্ছিন্ন উর্দুভাষী রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

বঙ্গবন্ধু এই প্রতারণাকে প্রতিহত করতে অনুভব করেন নতুন রাজনৈতিক কাঠামোর আবশ্যকতা। পাকিস্তান জন্মের মাত্র চার মাসের মধ্যেই ১৯৪৮ সালের ০৪ জানুয়ারি তাই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ।' [৮] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে প্রতিষ্ঠা পাওয়া এই ছাত্র সংগঠন ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত যে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছে তা অবিস্মরণীয়।

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আমাদের ওপর ঔপনিবেশিক শাসন চাপিয়ে দেয়। সর্বপ্রথম আঘাত করে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর। রবীন্দ্র সংগীতকে বেতারে গাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা, বাংলাকে আরবী হরফে লেখার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রও চলে; বাংলা ৫৬% মানুষের মুখের ভাষা হওয়ার পরেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা যেন না পায়, তার পেছনে হয় ষড়যন্ত্র। শেখ মুজিবুর রহমান সাংগঠনিক ক্ষমতা আর অকুতোভয় সাহস নিয়ে এগিয়ে এলেন এবারও। এতদিন যে মুসলিম লীগের জন্য আর পাকিস্তানের জন্য লড়াই করেছেন, জনগণের সাথে সম্পর্কহীন সেই সরকারের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ 'বাংলাভাষা দাবি' দিবস ঘোষণা করে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ।' বঙ্গবন্ধু ১১ মার্চ ভাষার জন্য সেই আন্দোলনে বন্দী হন ও কারাবরণ করেন। ৫৫ বছরের জীবনের ১৩ বছরই তিনি কাটিয়েছেন কারাগারে। আর তা সম্ভব করে তুলেছিলো ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠা, অবিচলতা, অপরিসীম সাহস।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতারও পরিচয় পাই তার উক্তিতে, "ছাত্র রাজনীতি আমি আর করব না, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই করব। কারণ বিরোধী দল সৃষ্টি করতে না পারলে এদেশে এক নায়কত্ব চলবে।" [৯]

১৯৪৯ সালের ২৩ শে জুন 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠনের প্রাক্কালে জেলে বন্দী শেখ মুজিবের মতামত নেওয়ার জন্য যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "আর মুসলিম লীগের পিছনে ঘুরে লাভ নাই, এ প্রতিষ্ঠান এখন গণবিচ্ছিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এরা কোটারি করে ফেলেছে। একে আর জনগণের প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। এদের কোনো কর্মপন্থাও নাই।" [১০] নিরাপত্তা বন্দি শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক সেই ২৩ জুন তারিখে সদ্য প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক যে রাজনৈতিক দলের যাত্রাপথের সূচনা করেন, সেই আওয়ামী মুসলিম লীগে সময়ের প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে শেখ মুজিব ক্রমশ হয়ে উঠলেন সাধারণ মানুষের আস্থার অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বে।

আর এভাবেই গণতান্ত্রিক দাবী আদায়ের সংগ্রামে তৈরি হল মুসলিম লীগকে চ্যালেঞ্জ করার মত একটি কার্যকরি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম; যে দলটি ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে, ১৯৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, আইয়ুব খানের সামরিক শাসন, ১৯৬৬ এর ছয় দফা, ১৯৬৮ এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর প্রাদেশিক ও জাতীয় নির্বাচন, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছে সামনে থেকে।

বঙ্গবন্ধুর বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে সচেতনতা, স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের যে টানাপোড়েন, সমকালীন বিশ্ব ও বাংলাদেশের জন্য প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে চিন্তা চেতনা আমরা প্রত্যক্ষ করি "আমার দেখা নয়াচীন" গ্রন্থে। "আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসেবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে, ততদিন দুনিয়ার মানুষের ওপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না।"

২১ দফার ভিত্তিতে যে নির্বাচনী ইশতেহার এর মাধ্যমে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে পূর্ব বাংলার বিরোধী দলগুলোর জোট গঠন করে 'যুক্তফ্রন্ট', তার নিরঙ্কুশ বিজয় সুস্পষ্টভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে জানিয়ে দেয় এদেশের মানুষ ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করে, স্বায়ত্তশাসন ও ভাষার প্রশ্নে এদেশের মানুষ ছাড় দিতে রাজি না। এ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু তার প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়াহিদুজ্জামান সাহেবকে দশ হাজার ভোটে পরাজিত করেছিলেন। তিনশর মধ্যে মুসলিম লীগ পেয়েছিল মাত্র নয়টি আসন।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ও সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুকে কিছুদিন পরেই গ্রেফতার করা হয় এবং একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করা হয়।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশিষ্ট ছাত্র নেতৃবৃন্দ (সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমেদ) দ্বারা ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে গোপন সংগঠন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' প্রতিষ্ঠা (১৯৬২) করেন যা পরবর্তীতে 'নিউক্লিয়াস' নামে পরিচিতি লাভ করে।[১১]

নিউক্লিয়াসের কাজ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে যাবতীয় নীতি কৌশল প্রণয়ন করা এবং স্বাধিকার আন্দোলনকে সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে নিয়ে যাওয়া। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তৈরি, ০২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পতাকা উত্তোলন, ০৩ মার্চ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ, জাতীয় সংগীত নির্বাচন, জয় বাংলা বাহিনী গঠন সবই ছিল স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অংশ যা বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনে বাস্তবায়িত হয়।

আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র (Basic Democracy) নামক এক হাস্যকর গণতন্ত্র চালু করেন জোর করে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য। তিনি প্রায় দশ বছর ক্ষমতাকে কুক্ষীগত

করে রাখেন। এ সময় তার আক্রোশের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। জননিরাপত্তা আইনে বঙ্গবন্ধু বহুবার কারাগারে যান আইয়ুব খানের সময়। রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে অনেক মিথ্যা মামলা দায়ের হয়।

১৯৬৬ সালে লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক 'ছয় দফা দাবি' পেশ করেন। বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ছয় দফায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বন্টন, সত্যিকার ফেডারেশন হিসেবে রাষ্ট্র কাঠামোর গঠন, জনগণের ভোটাধিকার, মুদ্রা ব্যবস্থা, কর আরোপের ক্ষমতা, বৈদেশিক বাণিজ্য ও নিরাপত্তার প্রশ্নে প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠনের দাবি তোলেন যা ছিল মূলত বাঙালির প্রাণের দাবি।

১৯৬৬ সালের ১ মার্চ বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য সারা বাংলায় গণসংযোগ সফর শুরু করেন। এ সময় সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বারবার গ্রেফতার হন। ৭ জুন বঙ্গবন্ধু ও আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে সারাদেশে ধর্মঘট পালিত হয়।

১৯৬৮ সালের ০৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে। বঙ্গবন্ধুকে এ সময় ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা হয়। অভিযুক্ত আসামিদের মুক্তির দাবিতে সারাদেশে শুরু হয় বিক্ষোভ। ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আসামিদের বিচারকার্য শুরু হয়।

এ সময় ছাত্র জনতার অভূতপূর্ব সমর্থনে বাংলার রাজপথ মুখরিত হয়। ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি গঠিত হল 'কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।' আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে শুরু হল দুর্বার আন্দোলন। ছাত্রনেতা আসাদ, সার্জেন্ট জহুরুল হক, শহীদ বুদ্ধিজীবী শামসুজ্জোহার রক্ত বৃথা যায়নি। প্রবল চাপের মুখে ২২ ফেরুয়ারি মামলার আসামিদের মুক্তিদানে বাধ্য হয় সামরিক সরকার। রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ২৩ ফেরুয়ারি এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় সেখানে প্রায় দশ লক্ষ ছাত্র-জনতার সামনে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় তিনি পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'।[১২] ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ।

ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা আর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর সাথে নিস্ফল আলোচনা ও গড়িমসি দেখে অবশেষে এলো ৭ মার্চের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। "ঘরে ঘরে দূর্গ

গড়ে তোলা। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।”

মূলত ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বঙ্গবন্ধুই পরিচালনা করেছেন। ১৬ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া মুজিব-ভুট্টো আলোচনা হয়। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হানাদার বাহিনী। বঙ্গবন্ধু ২৫ শে মার্চ রাত ১২ টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। “This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh Wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.” [13]

দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ শেষে ৩০ লক্ষ শহীদ আর দুই লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হল। বিশ্বের বুকে বাঙালি পেল তার পতাকা, মানচিত্র। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভাবেই হয়ে উঠলেন ইতিহাসে মহানায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। ‘আমার পরিচয়’ কবিতায় সৈয়দ শামসুল হক যথার্থই লিখেছেন-

আমি তো এসেছি তিতুমীর আর হাজী শরিয়ত থেকে
আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলি ও অগ্নিবীণার থেকে
এসেছি বাঙালি ক্ষুদিরাম আর সূর্যসেনের থেকে
এসেছি বাঙালি জয়নুল আর অবন ঠাকুর থেকে।
এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে
এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে।
আমি যে এসেছি জয় বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে
আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে।

তথ্যসূত্র

১. mujib100.gov.bd (বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্মরণীয় মনীষীদের উক্তিসমূহ)

২. বঙ্গবন্ধুর কিছু স্মরণীয় উক্তি ঃ ekushey-tv.com/special-personality/news/89569

৩. প্রাগুক্ত

৪. বঙ্গবন্ধু অনলাইন আর্কাইভ (www.bangabandhuonline.org)

৫. Documents archive: Bangabandhu.com.bd

৬. রহমান, শেখ মুজিবুর। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। পৃ.২১।

৭. রহমান, শেখ মুজিবুর। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। পৃ.২১।

৮. bsl.org.bd (বাংলাদেশ ছাত্রলীগের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট)

৯. রহমান, শেখ মুজিবুর। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। পৃ.১২০।

১০. রহমান, শেখ মুজিবুর। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। পৃ.১২০।

১১. 'সিরাজুল আলম খান এবং স্বাধীনতার নিউক্লিয়াস' রচনা ঃ মহিউদ্দিন আহমদ (প্রথম আলো) প্রকাশ– ৪ জুন, ২০১৯)

১২. চৌধুরী, সানজাদা (২০১৮)। *বাংলাদেশের নাম কীভাবে 'বাংলাদেশ' হল?*, বিবিসি বাংলা, ঢাকা, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৮।

১৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (৬ষ্ঠ তফসিল)

ধর্মনিরপেক্ষতার বাংলাদেশঃ বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা এবং আমাদের করণীয়

মোঃ নূর-ই-শাহান রাজ
সহকারী সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের আদলেব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'বিভাজন ও শাসননীতি' গ্রহণের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ বপন করা হয়েছিল, তা রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতা, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ধর্মকে ক্ষমতা পাকা করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার, দারিদ্র্য প্রভাতি নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আজ মহীরুহের আকার ধারণ করেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী এ ভূখন্ডে শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে বাস করে আসা বাঙালি সমাজে, প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ ইন্ধনে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবাষ্প প্রবেশ করানো হয়েছিল, ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের ফলে তা প্রকট আকার ধারণ করে বিস্ফোরিত হয়। সাম্প্রদায়িকতা বদলে দিয়েছে বাঙালি সমাজের চরিত্র, বদলে দিয়েছে বাঙালির মনস্তত্ত্ব ও সংস্কৃতি।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাট দশকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তারই ফলস্বরূপ এ-ভূখন্ডের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের চেতনা বিকশিত হয়েছিল। এ চেতনার ভিত্তিতেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সকল ধর্মের মানুষ ধর্মীয় বিবেচনার বাইরে এসে একত্র হয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে বিজয়ী হয়ে একটি স্বাধীন দেশের মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অন্যতম ধারা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল- ধর্মনিরপেক্ষতা। দুঃখজনক হলেও সত্য, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এমন এক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের পশ্চাদপদতা প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে, যে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের জন্য হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ও মুসলিমরা একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন।

ভারতবর্ষের দাঙ্গার অভিজ্ঞতা ছিল বঙ্গবন্ধুর, ধর্মের নামে হানাহানির ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। ধর্মের দোহাই দিয়ে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তরুণ শেখ মুজিব প্রত্যক্ষ করেছেন পাকিস্তানিদের ভন্ডামি, সামরিক একনায়কদের খামখেয়ালিপনা, শোষণের শিকার জনতার মুখে স্থায়ী দুঃখের ছাপ। পাকিস্তানি শাসনামলে ধর্মকে সামনে রেখেই পাকিস্তানিরা বাঙালিকে শাসন ও শোষণ করেছে। এ জন্য সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করলেও বঙ্গবন্ধু ধর্মান্ধতাঁকে ঘৃণা করতেন। সকল ধর্মকে মেনে নিয়ে উদার, সংকীর্ণতামুক্ত চিন্তাধারায় অভ্যস্ত হয়েছিলেন তিনি। ধর্মের অপব্যবহার রোধে রাজনীতি থেকে একে আলাদা করে রাখার ব্যাপারে সবসময় কথা বলতেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পাঠ করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। 'বাংলাদেশ আওয়ামী মুসলিম লীগ' শব্দগুচ্ছে 'মুসলিম' শব্দটি অন্তর্ভুক্ত হোক তা বঙ্গবন্ধু চাননি, এটা পরিষ্কার তীর এই মন্তব্য: "..পাকিস্তান হয়ে গেছে, সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দরকার নাই। একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক

প্রতিষ্ঠান হবে যার একটা সুষ্ঠু মেনিফেস্টো থাকবে" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী পৃ. ১২১) ১৯৫৩ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের দ্বিতীয় কাউন্সিলে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পরেই বঙ্গবন্ধু দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালের ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত তৃতীয় কাউন্সিলে দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়, বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয়বারের মত সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে তাঁর উত্থানের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ হাইকমিশন এবং লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সের সাউথ এশিয়া সেন্টার আয়োজিত এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় নোবেলজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বলেছেন, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার অন্যতম স্পষ্ট সমর্থক, যেখান থেকে বিশ্ব শিখতে পারে। বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশের সকল দেশ বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ও দশর্ন থেকে দিক নির্দেশনা এবং অনুপ্রেরণা নিতে পারে/...১৯৭০ সালের নিবার্চনের আগে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী ভাষণে ভোটার সামনে ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে 'সমতার' ধারণা তুলে ধরতে দ্বিধা করেননি বঙ্গবন্ধু। সমতাবাদী এই নীতি নিয়ে আওয়ামী লীগের সেক্যুলার অবস্থান ভোটে জিতে আসতেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।"

১৯৭০-এর নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে শাসনতন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য অংশে ইসলাম ও সংখ্যালঘু সম্পর্কে বলা হয়- "(খ) সংখ্যালঘুরা আইনের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সমান অধিকার ভোগ করবে। নিজেদের ধর্ম পালন ও প্রচার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা এবং নিজ নিজ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যাপারে সংখ্যালঘুদের অধিকার শাসনতান্ত্রিকভাবে রক্ষা করা হবে। স্বীয় ধর্ম ছাড়া অন্য যেকোনো ধর্ম প্রচারের জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তিকে কর দিতে বাধ্য করা হবে না। নিজ ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হলে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম সম্পর্কীয় কোনো নির্দেশ গ্রহণ অথবা কোনো ধর্মীয় উপাসনা বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে জোর করা হবে না।" ধর্মীয় সহিষ্ণুতার এই আদর্শ বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, শোষণহীন, সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলা। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষ মানুষের সমাবেশে বলেছিলেন, "কতবড় কাপুরুষ যে নিরপরাধ লোককে এভাবে হত্যা করে সামরিক বাহিনীর লোকেরা, যখন তারা বলে কি আমরা পাকিস্তানের মুসলমান সামরিক বাহিনী। ঘৃণা জানানো উচিত। দুনিয়ার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার পরে বাংলাদেশই ২য় মুসলিম দেশ, ভারত ও পাকিস্তান ৩য়... আমরা মুসলমান! মুসলমান মা বোনদের রেপ করে? আমরা মুসলমান।... আমার রাষ্ট্রে হবে সমাজতন্ত্র ব্যবস্থা। এই বাংলাদেশে হবে গণতন্ত্র, এই বাংলাদেশে হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।"

১৯৭২ সালের ৯ মে রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আর সম্প্রদায়িকতা যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

কিন্তু ইসলামের নামে আর বাংলাদেশের মানুষকে লুট করে খেতে দেয়া হবে না। পশ্চিমারা ২৩ বছর ইসলামিক ট্যাবলেট দেখিয়ে আমাদেরকে লুটেছে। আপনারা জানেন? খবর রাখেন? এই বাংলা থেকে ২৩ বছরে ৩ কোটি টাকা পশ্চিমারা আমার কৃষকের কাছ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে।"

১৯৭২ সালের ২৬ জুন মাইজদি কোর্টের জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমরা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করি। তার অর্থ ধর্মবিরোধী নয়। এক ধর্ম অন্য ধর্মের ওপর অত্যাচার করবে না। ধর্মের নামে জুয়াচুরি, পকেটমার লুটতরাজ, ব্যবসা আর পশ্চিম পাকিস্তানের পয়সা খাইয়া রাজনীতি করা চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি চলবে না। ধর্মের নামে লুট করা চলবে না। তবে আমি মুসলমান, আমি মুসলমান হিসেবে আমার ধর্মকর্ম পালন করবো। হিন্দু হিন্দুধর্ম পালন করবে। কেউ ধর্মকর্মে বাধা দিবার পারবে না। ঠিক? মানেন? আমার ধর্ম আমার কাছে। তোমার ধর্ম তোমার কাছে। আমার কুরআনের আয়াতে আছে তোমার ধর্ম তোমার কাছে। আমার ধর্ম আমার কাছে, এইটাই হলো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।"

১৯৭২ সালের ৩ জুলাই কুষ্টিয়ার জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "কিন্তু ঐ ধর্মের নামে রাজাকার, ধর্মের নামে আলবদর, ধর্মের নামে আলশামস্ আর ধর্মের নামে ব্যবসা করতে বাংলাদেশের জনসাধারণ দেবে না, আমিও দিতে পারবো না। কারণ, এই ধর্মের নামে পশ্চিমারা আমার মা-বোনকে হত্যা করেছে। আমার দেশকে লুট করেছে। আমার সংসার খতম করেছে, আমার মানুষকে গৃহহারা করেছে। সেজন্য এ রাষ্ট্র চলবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যেমন চলে।"

১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর খসড়া সংবিধান প্রসঙ্গে গণপরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেন, "আর হবে ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে; মুসলমান তার ধর্ম পালন করবে; খ্রীস্টান, বৌদ্ধ- যে যার ধর্ম পালন করবে। কেউ কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, বাংলার মানুষ ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ চায় না। রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধর্মকে বাংলার বুকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। যদি কেউ ব্যবহার করে, তাহলে বাংলার মানুষ যে তাঁকে প্রত্যাঘাত করবে, এ আমি বিশ্বাস করি।" (বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পৃ. ৩২)

ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নানা সমালোচনা ও বক্তব্যের প্রেক্ষিতে গণপরিষদসহ বিভিন্ন ভাষণে বঙ্গবন্ধু এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাখ্যা তুলে ধরেছে। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে সংবিধান-বিলের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন- ""জনাব স্পিকার সাহেব, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবও না। ২৫ বৎসর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেইমানি, ধর্মের নামে খুন, ধর্মের নামে ব্যভিচার-এই বাংলাদেশের মাটিতে চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে

রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি।" (বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পৃ. ৪৬)

ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসার এক অনুষ্ঠানে ধর্মব্যবসায়ী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর দ্বিমুখী নীতির স্বরূপ উন্মোচন করে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমাদের দেশে পাকিস্তান আমলে ইসলামবিরোধী বহু কাজ হয়েছে। রেসের নামে জুয়াখেলা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত ছিল, আপনারা আলেম সমাজ কোনোদিন এর প্রতিবাদ করেননি। ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের সাহায্যে প্রকাশ্যে জুয়াখেলা চলত, এগুলো বন্ধ করার কোনো আন্দোলন আপনারা করেননি; কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবার কথা বারবার বলেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় জুয়া ও মদকে যে হারাম ঘোষণা করতে হয়, সেটা আপনারা জানতেন; কিন্তু আপনারা এগুলোর বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। আমি ক্ষমতায় এসে প্রথমেই ঘোড়দৌড় বন্ধ করে দিয়েছি, পুলিশকে তৎপর হতে বলেছি শহরের আনাচে-কানাচে থেকে জুয়াড়িদের আড্ডা ভেঙ্গে দিতে। আমি ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলি, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্ম বিরোধিতা নয়। আমি মুসলমান, আমি ইসলামকে ভালোবাসি। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন, দেখবেন, এ দেশে ইসলামবিরোধী কর্মকান্ড কখনোই হবে না।"

১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন- "রাজনীতিতে যারা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে, যারা সাম্প্রদায়িক-তারা হীন, তাদের অন্তর ছোট। যে মানুষকে ভালোবাসে সে কোন দিন সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। আপনারা যাঁরা এখানে মুসলমান আছেন তাঁরা জানেন যে, খোদা যিনি আছেন তিনি রাব্বুল আল-আমীন-রাব্বুল মুসলেমিন নন। হিন্দু হোক, খ্রিস্টান হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক-সমস্ত মানুষ তাঁর কাছে সমান.়।. । যারা এই বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা করতে চায় তাদের সম্পর্কে সাবধান হয়ে যেও। আওয়ামী লীগের কর্মীরা, তোমরা কোনোদিন সাম্প্রদায়িকতাঁকে পছন্দ করো নাই। তোমরা জীবনভর তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছ। তোমাদের জীবন থাকতে হবে-যেন বাংলার মাটিতে আর কেউ সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করতে না পারে।"

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বিধানে বঙ্গবন্ধু মূলত ইসলামের সঙ্গে অন্য সব ধর্মের সহাবস্থান নিশ্চিত করেছিলেন। অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গড়ার জন্য ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থে ধর্মের অপব্যবহার রোধ করে প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে ছিল তার নীতি-আদর্শ। বাঙালি সংস্কৃতির চিরায়ত রূপের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়াস পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে ইসলামী মৌলবাদ বাংলাদেশে এত শক্ত এবং মোটা শিকড় গেড়ে বসেছিল যে, মধ্যপন্থী দলগুলোকে আপস করে কমবেশি ধর্মের গীত গাইতে হয়। পরবর্তীতে অবৈধ সামরিক শাসনামলে এবং কতিপয় নীতিহীন রাজনৈতিক দলের কাঁধে সওয়ার হয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় চেপে বসা মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি, ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীসমূহ এবং মানবতা বিরোধী অপরাধে জড়িত

রাজাকার-আলবদরদেরকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের মাধ্যমে দেশকে পাকিস্তানী ধারায় ফিরিয়ে নিতে ও বাংলাদেশকে একটি ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে ধর্মকে নগ্নভাবে ব্যবহার করা শুরু হয়। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতাঁকে সমাজ-রাষ্ট্র-সরকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমন সুকৌশলে প্রবেশ করানো হয় যে, সুযোগ পেলেই তা আজ আত্মক্ষয়ী, বিধ্বংসী রূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

সাম্প্রতিক ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক, সুবিধাবাদী গোষ্ঠী ধর্মকে ব্যবহার করে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে তোলার জন্য ও বহিঃবিশ্বের কাছে অনিরাপদ, পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তৎপর হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় সংগঠনের লেবাসে, প্রযুক্তির অপব্যবহার ও সাধারণ মানুষের সরলতা এবং ধর্মীয় আবেগকে পুঁজি করে হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এসকল গোষ্ঠী সদা তৎপর। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এসকল ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর সন্ত্রাস দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত করার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রের যে নীলনকশা প্রণয়ন করেছিল, প্রকৃত ধর্মপ্রাণ মানুষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সতর্ক প্রয়াসে তা সম্পূর্ণ সফল না হলেও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, এরা কতটা ভয়ংকর ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ধর্ম-কে ব্যবহার করে অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার হীন প্রচেষ্টা এবং দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার পেছনে ক্রিয়ার এ সকল অশুভ শক্তির বিষদাঁত উপড়ে ফেলার এখনি মোক্ষম সময়। এ প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ১৯ নভেম্বর কলকাতার দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর একটি বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো- "স্বাধীন বাংলাদেশে সেক্যুলার বাঙালি জাতির অস্তিত্বের রক্ষাকারী হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। আমি এই ধর্মনিরপেক্ষতার চারা বাংলাদেশের মাটিতে পুঁতে গেলাম। যদি কেউ এ চারা উৎপাটন করে, তাহলে বাঙালি জাতির স্বাধীন অস্তিত্বই সে বিপন্ন করবে।"

সকল ধর্মের সহাবস্থান এবং বদ্ধ চিন্তার মুক্তিতেই ধর্মনিরপেক্ষতার পূর্ণতা নিহিত। বাঙালির হাজার বছরের সম্প্রীতির বন্ধনকে ধর্মের অপব্যবহারের মাধ্যমে কেউ যেনো বিভক্ত করতে না পারে, সকল ধর্মের লোক মিলে যেনো একটি সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গঠন করতে পারে, সেটিই ছিল বঙ্গবন্ধুর দর্শন। তাই, প্রজাতন্ত্রের নবীনতম কর্মচারী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হবে বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি-আদর্শকে ধারণ করা; ব্যক্তি, সমাজ ও কর্মজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে একটি উন্নত, আধুনিক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। মনে রাখতে হবে, ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে উন্নীত করার স্বপ্নযাত্রায় আমাদেরকেই মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজন ধর্ম-বর্ণ, জাত-পাত নির্বিশেষে সকলের প্রাণবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, আর তার জন্য নিশ্চিত করতে হবে অসাম্প্রদায়িক, সম্প্রীতিপূর্ণ, সংকীর্ণতামুক্ত পরিবেশ। মেধা-মনন, সৃষ্টিশীলতা, সততা, নিরপেক্ষতায় প্রতিনিয়ত নিজেদের ছাড়িয়ে যেতে হবে, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে নিজেদের, তবেই আমরা সফল হব একটি অসাম্প্রদায়িক, সমৃদ্ধিশালী, আধুনিক স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে। মুজিব জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে এই হোক আমাদের দৃপ্ত অঙ্গীকার।

পিতার আশ্রয়

এ. আর. এম জাহিদ হাসান
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর

দেশ স্বাধীন হয়েছে বেশি সময় হয়নি, সত্তরের শেষের দিকে শরতের এক বিকেল। রোদ পড়ে গেলেও তাপের ঝাঁঝ কিছুটা এখনো আছে। উষ্ণ অপরাহ্নের কালো চাদর গায়ে পাঠশালায় বসে ছাত্রছাত্রীদের অপেক্ষায় শাকের। গরম ঠাণ্ডা সব সময়ই গায়ে কালো চাদর জড়িয়ে রাখে শাকের।একাত্তরের যুদ্ধে নিজের ডান হাত হারানো শাকের ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী মুখ আর টগবগে ছাত্রনেতা। দেশ স্বাধীন করে নেতার আর্দশে দেশ গড়ার প্রত্যয় ঝলমলিয়ে উঠতো তার চোখের তারা। কিন্তু হঠাৎ অজানা ঝড়ে টালমাটাল সারা বাংলা এসব ভাবতে ভাবতে ছাত্রছাত্রীদের পায়ের শব্দে সম্বিত ফিরে পায় শাকের।

: আসসালামু আলাইকুম স্যার, স্যার। সমস্বরে বলে ওঠে শাকেরের ১০ ছাত্রছাত্রী।
: কিরে এত দেরী করলি ক্যান তোরা। হাঁক দিয়ে ওঠে শাকের।
স্যারের গলার আওয়াজে চুপচাপ জুতা খুলে ব্ল্যাকর্বোডের সামনের চাটাইতে বসে পড়ে ওরা। স্যারের গলা শুনলে ভেজা বিড়াল হয়ে যায় মাখন। এমনিতে পাড়া দাপিয়ে বেড়ালও শাকের স্যারকে জমের মত ভয় পায় । সারাগ্রামে মাখনের মতো দ্বিতীয় কোন ছাত্র নেই। এজন্য শাকের তার ভালোবাসার সবটুকু নিঙ্গরে দেয় তাকে।
: মাখন, আজ তোদের কি পড়াবো বলছিলাম বলতো? আবার শাকেরের বাজখাই কণ্ঠ।
: স্যার, বর্গমূল, ঘণমূল আর টেন্স শিখাবেন কইছিলেন।

শাকেরের মন খুশি হয় যে তার ছাত্র-ছাত্রীরা খুব মনোযোগী। মুক্তিযুদ্ধে হাত হারানো শাকের দেশ স্বাধীনের পরে একটা কারখানায় একাউন্টসে কাজ করতো। কিন্তু তার লিডার নিহত হবার পর কোন এক অলৌকিক কারণে সেখান থেকে ছাটাই হয় শাকের। তারপর থেকে নিজ গ্রাম পুতিয়াতে থাকে শাকের। পূর্বপুরুষের বাস্তুভিটা আর মুক্তিযুদ্ধে নিহত পরিবারের সবার স্মৃতি আকঁড়ে স্বল্প কিছু সহায় সম্বল অবলম্বন করে বেঁচে আছে। বিকালের সময়টা গ্রামের গরীব বাচ্চাদের পড়িয়ে সময় পার করে আর তার শিক্ষায় আলোকিত হয় পরবর্তী প্রজন্ম।

: আজ তোদের অংক করতে দেব, যে পারবি সে আজ সেলিমের দোকানের মালাই খেতে পারবি। শাকেরের ঘোষণা আর ঠোঁট বাঁকিয়ে দুষ্ট হাসি। শিক্ষার্থীদের মেধায় শান দিতে উচ্চতর শ্রেণীর এক জটিল অংক বোর্ডে লিখলো সে।

অংক দেখে মনে হলো সবাই হ্যালির ধূমকেতু দেখছে, কয়েকজন আবার নিজেদের ভিতর খুনসুটিও করছে। মাখন মাথা নিচু করে কি যেন করছে।

: এই, এই তুই মাথা নিচু করে ঘুমাচ্ছিস বলে শাকের তেড়ে যেতেই মাখন বললো মাস্টারমশাই দেখেন তো ঠিক আছে কিনা, বলে খাতা বাড়িয়ে দেয় মাখন।
নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না শাকের। অবিকল তার মতো দক্ষতায় সমাধান করে ফেলেছে মাখন! মাখনকে এক ঝটকায় ঘাড়ে উঠিয়ে নেয় শাকের। খুশিতে পারলে এখনই দৌড় দেয় সে। বলে- চল এখনই তোকে সেলিমের দোকানের মালাই খাওয়াবো, তাও ডাবল!

মাখন যখন মালাই মুখে দিয়েছে তখন তার ভাঙ্গাঘরের বারান্দায় পা দিয়েছে বাকের মোল্লা। এলাকার বিখ্যাত রাজাকার, একাত্তরের যার কাজ ছিল যুবতী মেয়েদেরকে পাক হানাদেরদের ক্যাম্পে দিয়ে আসা। মদন ময়রার স্ত্রী মালতী আর তাদের বিয়ের বছরই বাকের মোল্লার ভাষায় গোলযোগ হয়েছিল। মদন এর বাড়ি থেকে তার নববধূ মালতীকে উঠিয়ে নিয়ে পাক পিশাচদের হাতে উঠিয়ে দিয়েছিল বাকের মোল্লার পালোয়ান বাহিনী। বাড়ি ফিরে বউকে না পেয়ে দৌঁড়ে হানাদার আস্তানায় গিয়েছিল মদন। তারপর দিন পাশের ডোবায় পাওয়া যায় মদনের চোখ উপড়ানো লাশ । তারও সপ্তাহখানেক পরে মালতীকে অর্ধমৃত অবস্থায় বাড়ীর সামনে ফেলে যায় বাকের মোল্লা। ক্ষতবিক্ষত মালতীর শরীর সম্ভোগে কার্পণ্য করেনি কাদের মোল্লা। তার প্রিয় হাবিলদার শাফকাতের পরে নিজের লাম্পট্য জাহির করেছিলো মালতীকে। মালতীর কি মনে আছে কিছু নাকি এখনো ঝাপসা চোখে জ্ঞানকূন্য হবার উপক্রম হয় তার?

: মালতী আছোনি বাড়িতে? ঘরের চৌকাঠে পানের পিক ফেলে লুঙ্গির নিম্নাংশ দিয়ে ঠোঁট মুচতে মুছতে বলে ডাক দেয় বাকের মোল্লা।

সরদার বাড়িতে সারাদিন গৃহস্থালীর কাজ সেরে গোসল করে ঘরে ঢোকা মালতী বোঝে বমাল্লার ব্যাটা কেন এসেছে। জবাব না দিয়ে ঘরের ভিতর জবথব মালতী। লুঙ্গির শেষপ্রান্ত হাতে নিয়ে ধড়মড় করে দরজা ঠেলার আগেই মালতী বেড়িয়ে এসে চোখ বড় করে তাকায়। লাল কালো দাঁতের ভৌতিক হাসি দিয়ে মোল্লা বলে- এত কই তোমারে সরদার বাড়ির কাম কাইজ বাদ দিয়া আমার এইখানে উইঠা আসো, তোমার পোলাডারে সৌদিতে পাঠামু আর তুমি আমার বাড়ির কাম কাইজ কইরা সেই ঋণ শোধ করবা। চোখ টিপ দিয়ে কথা থামায় মোল্লা।

মালতীর ফর্সা মুখে যেন আগুন ঝলসে ওঠে। গর্জন দিয়ে বলে -কি কামে আসছেন কন? তোমার পোয়াতি বৌদি পুরান কিছু শাড়ি পাঠাইছে। বাচ্চার জন্য কিছু কাঁথা লাগবো। বানায়ে দিতে পারলে মেলা ট্যাকা দিমু। আর এই নতুন শাড়িটা তোমার লাইগা গঞ্জ থেইক্যা আনলাম।

মোল্লার হাতের লাল শাড়ি দেখে মাথায় বিদ্যুৎ খেলে যায় মালতীর। সর্বশক্তি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে মোল্লাকে বলে
: যা এইখ্যান থেইক্যা, যা কইলাম। চরম অপদস্ত মোল্লার সামনের লাল কালো দাঁত দুটিকে আরো ঝোলা দেখায়। যাওয়ার সময় চোখ রাঙ্গিয়ে বলে-

: কামড়া ভালো করলিনা মালতী।

পুতিয়া গ্রামের একমাত্র হাইস্কুলের মাঠে অনেক সময় ধরে দাঁড়িয়ে আছে মালতী। বেশ কয়েকবার হেডমাস্টার রিয়াসাতকে খুঁজছে তারা। একসময় লোকজন কমে আসলে রিয়াসাতের রুমের সামনে মালতী আর ছেলে মাখন এসে দাঁড়ায়। শশব্যস্ত রিয়াসাত মানুষ ভালো হলেও খুব ভীতু প্রকৃতির। সামনে চোখ যেতেই প্রশ্ন করে মালতীকে-
: কিছু বলবেন?
: মাস্টারমশাই, এ আমার ছেলে মাখন। ওর মাথা খুবই ভালো। ছোড ইস্কুলের পড়া এই মাসে শেষ করছে। আপনার ইস্কুলে ওরে ভর্তি করবার চাই।
: বেশতো! ভর্তির ফরম আর কাগজপত্র জমা দিন। বাকিটা আমি দেখছি। লিয়াকত, উনাকে সব বুঝিয়ে দাও- বললেন রিয়াসাত।

মালতী আর মাখন চলে গেলে নিচু গলায় লিয়াকত কিছু একটা বলে রিয়াসাতকে। হেডমাস্টারের কপালে মৃদু ঘাম জমতে থাকে।
: তাহলে তো সমস্যা হয়ে গেলো- রিয়াসাত।

লাল সুতায় ফুল আঁকা রোমালে মুখ মুছতে থাকে সে। তার শহুরে বউ বড় শখ করে তার জন্য রোমাল সেলাই করেছে বলে সহসা সেটা ব্যবহার করে না রিয়াসাত।

: ঝামেলায় জড়ায়েন না স্যার- চায়ের কাপ রিয়াসাতের সামনে রাখতে যেয়ে বলে পিওন লিয়াকত।

ইমাম সাহেবের বাড়ির উঠানে আজ এক বৈঠক ডেকেছে বাকের মোল্লা। এলাকার গণ্যমান্য লোকজন, কিছু নিঃস্ব মুক্তিযোদ্ধা আর মালতীকে ঘিরে চলছে আলোচনা।

: তুমার পোলারে হাইস্কুলে দিয়া কি ব্যারিস্টার বানাইবা?- ঝেঁকে কথা বলে বাকের মোল্লা। তার কথায় মাথা নাড়ায় কিছু উপস্থিত ব্যক্তি। সবার অভিব্যক্তি দেখে কিছুটা হলেও দিশেহারা মালতী।
: এ সময় কালো চাদর গায়ে শাকের দৃশ্যপটে আর্বিভূত হয়।
: কি হইছে মোল্লা? কিসের মিটিং করতেছো?- শাকেরের বাজখাই কণ্ঠে নরম মুড়ির মতো মিইয়ে যায় কয়েকজন।
: তুমার এইখানে কি কাম? সামনের দুই ঝোলা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপতে চাপতে শুধায় মোল্লা।
: আমার বাপের জমিতে মসজিদ উঠায়ে দিছি, আর এলাকার আলোচনায় আমি থাকুম না। আর শুনলাম, তুমি নাকি মাখনরে হাইস্কুলে ভর্তি হতে দিতেছো না। অ্যা..কি সমস্যা তোমার?
: সমস্যার কথা কইবো হেডমাস্টার সাব। - এককোণা থেকে রিয়াসাতকে টেনে এনে দৃঢ়তা দেখানোর চেষ্টা করে মোল্লা।

: না মানে, হাইস্কুলে পড়ালেখা শেষে বোর্ডের পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের সময় মাখনের বাবার নাম কি লেখা হবে এই নিয়ে অস্পষ্টতা থাকায় আমি বলছিলাম যে এই কথাগুলি বলতে যেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে রিয়াসাত।
: বাবার নাম কি হইবো মানে? আপনি কি কইবার চান খোলাসা করেন। মালতী রেগে ওঠে।
: তোমার পোলায় তো বেজন্মা, তার বাপের নামের ঘরে কি লিখবো? হাবিলদার সাবের নাম? - ঝোলা দাঁত বের করে হাসতে থাকে মোল্লা।

মালতীর গলা ধরে আসে। চিৎকার করতে চেয়েও বাকরুদ্ধ হয়ে যায় সে। লোকজনের একটা ছোট গুঞ্জন ওঠে। মোল্লা এ সময় দাঁড়িয়ে বলে-
: অবশ্য আমার নাম ও দিতে পারো, আমার কইলাম আপত্তি নাই।
: ওরে শয়তান বলে গর্জে ওঠে শাকের কালো চাদর থেকে একহাত বের করে জুতা নিয়ে পিটাতে থাকে মোল্লাকে। তীব্র হট্টগোল থেকে থেকে আরো তীব্র হয়ে ওঠে। নিঃস্ব মুক্তিযোদ্ধারাও ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

পুতিয়া হাইস্কুলে আজ বড় অফিসার আসবেন ঢাকা থেকে। বড় অফিসারের চেয়ে তার বড় পরিচয় তিনি একাত্তরের রণাঙ্গনে বীর বিক্রমে লড়াই করা এক যোদ্ধা। তিঁনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিভাগে স্নাতক করেছিলেন শাকের ও সেখান থেকে পড়াশোনা করা। পরিদর্শনের এক পর্যায়ে কালো চাদর গায়ে ভীড় ঠেলে শাকের অফিসারের সামনে চলে আসে। খুব সংক্ষেপে নিজ পরিচয় আর মাখনের হাইস্কুলের ভর্তির জটিলতা নিয়ে সব ঘটনা খুলে বলে।
: মিস্টার রিয়াসাত ...হাঁক ছাড়ে বড় অফিসার মো: আবুল কালাম।
: আপনি নাকি একজন বীরাঙ্গনার সন্তানকে স্কুলে ভর্তি নিতে চান নি?
: আমতা আমতা করছেন কেন, বলুন-শাকের।
: জাস্ট সে ইয়েস অর নো- মো: আবুল কালাম।
রিয়াসাতকে তিঁনি বলেন-
: আপনি জানেন দেশের প্রতিটি বীরাঙ্গনাকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিতে বলেছেন আমাদের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। আর সেই কথা ভুলে আপনি আছেন এলাকার চুনোপুঁটির রাজনীতি নিয়ে। যান এখনই মাখনকে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করুন। আর আজ থেকেই ও ক্লাস করবে, আন্ডারস্ট্যাণ্ড?
: জ্বি স্যার, জ্বি স্যার! বলতে বলতে ছিটকে বেরিয়ে যায় রিয়াসাত। মো: আবুল কালামকে রেজিমেন্টাল স্যালুট দেয় শাকের। তবে বড়কর্তা বলেন আমাকে নয়, আমাদের স্যালুট দেওয়া উচিত সেই মহামানবকে যার জন্ম না হলে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেতাম না। যিনি ছায়া হয়ে আশ্রয় দিয়েছেন সমগ্র বাঙ্গালিকে,তাঁর আশ্রয় না পেলে আমরা শোষিত হতেই থাকতাম। এ বড় মমতার আশ্রয়, বুঝলা, এ হলো পিতার আশ্রয়।

কৃষি ও কৃষকের বঙ্গবন্ধু

সুনন্দা সরকার প্রমা
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম

"এই স্বাধীনতা তখনই আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে যেদিন বাংলাদেশের কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য চিরদিন আপনাদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি। আজও আমি আপনাদের সহযোদ্ধা হিসেবে আপনাদের পাশে আছি। দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।"

ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল-সাতকোটি মানুষ, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ, ভঙ্গুর অর্থনীতি, বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বন্ধ কলকারখানা, অবহেলিত কৃষি ও কৃষক প্রভৃতি চ্যালেঞ্জসমূহ যুদ্ধপরবর্তী দেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর অন্যতম অন্তরায় ছিল। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জও ছিল দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য নীতি নির্ধারণ করা ও প্রায় দুইশত (২০০) বছর ধরে অবহেলিত কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন এবং শিল্প ও বাণিজ্যিকে পুনরুদ্ধার করা। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের গণমানুষের জীবনমান উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন। অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করিছিলেন কৃষি ও কৃষকের সামগ্রিক উন্নতি ব্যতীত বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্বে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেরুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁড়িয়ে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দানের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে মেধাবী ব্যক্তিদের অবদান রাখার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেয়ার সুযোগ করে দেন।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন নিয়ে বঙ্গবন্ধু ডাক দিয়েছিলেন সবুজ বিপ্লবের। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে সমুজ্জ্বল স্থান দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাংলাকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি বাংলার কৃষি ও কৃষককে এগিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। বিশ্বায়ন ও নগরায়নের এই যুগে করোনা পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থায় কৃষির গুরুত্ব বিশ্ববাসীর সম্মুখে নতুনভাবে চিত্রিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করার জন্য শুরুতেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ডাক দেন সবুজ বিপ্লবের। তার প্রণীত এই পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতে পারলে সবুজায়িত হবে সারা বাংলা, সুখে থাকবে বাংলার মানুষ। কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারলে দেশ উন্নত ও স্বনির্ভর হবে। কৃষি ও কৃষকের পাশে থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। কৃষির উন্নয়ন করে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়া এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট অর্থনীতি সুদৃঢ় করে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখাই কৃষি সংশ্লিষ্ট সকলের

অঙ্গীকার। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, "নতুন করে গড়ে উঠবে এই বাংলা। বাংলার মানুষ হাসবে। বাংলার মানুষ খেলবে। বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বসবাস কররে। বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে। এই আমার জীবনের সাধনা, এই আমার জীবনের কাম্য।"

"দুনিয়া ভর চেষ্টা করেও আমি চাউল কিনতে পারছিনা। চাউল পাওয়া যায় না। যদি চাউল খেতে হয়, আপনাদের চাউল পয়দা করে খেতে হবে।"– বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুর এই উক্তি যেকোন দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এমনকি বর্তমানে করোনাকালীন আরও উপলব্ধি করছে বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্ব। যেকোন দুর্যোগ ও আপদকালীন মোকাবিলায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কোন বিকল্প নেই। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং নিরাপদ খাদ্য একটি দেশের দুর্যোগ মোকাবিলার অন্যতম বড় মাধ্যম। বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টি বাংলাদেশকে বর্তমানে খাদ্যে স্বনির্ভর করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বঙ্গবন্ধুর গৃহীত কৃষি নীতির পথ ধরেই বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেল পরিণত হয়েছে। কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষি বহুমুখীকরণ, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ কৃষিকে এগিয়ে নেওয়ার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

পাকিস্তান শাসনামলে পাকিস্তানি শাসকদের শোষণের কারণে পূর্ববাংলায় গড়পড়তা ১৫ লাখ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি বিরাজমান ছিল। যুদ্ধের সময় মানুষ পুরোপুরি কৃষি উৎপাদন করতে না পারায় যুদ্ধপরবর্তী খাদ্য ঘাটতি ৩০ লাখ টনে পরিণত হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষক যেন ঘুরে দাঁড়াতে পারে–সেজন্য বঙ্গবন্ধু কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে ছিল কৃষকের মধ্যে ১৩ মাসে ১০ কোটি টাকার অকাভী ঋণ বণ্টন, ৮৩ হাজার টন সার সংগ্রহ এবং ৫০ হাজার টন ধান বীজ বণ্টন, ৩ হাজার মন গমবীজ বণ্টন, ১৭০০মন আলু বীজ বণ্টন, ৪৫৪ টন পাটবীজ বন্টন; সেচের জন্য ২৯০০ গভীর নলকূপ স্থাপন, ৩০০০ অগভীর নলকূপ স্থাপন, ৪০ হাজার শক্তিচালিত লো-লিফট পাম্প সরবরাহ, ৮০ লাখ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, বিএডিসিকে ২১টি ট্রাক্টর সরবরাহ, নামমাত্র মূল্যে ২১টি পাওয়ার টিলার সরবরাহ, নামমাত্রমূল্যে হালচাষের জন্য এক লাখ বলদ সরবরাহ; ভর্তুকিমূল্যে ৫০ হাজার দুগ্ধবতী গাভী সরবরাহ, টানা তিন মাস খাদ্যশস্যসহ ৩০ কোটি টাকার রিলিফ বণ্টন। বঙ্গবন্ধু তার শাসনামলে প্রথম বাজেটে কৃষি ভর্তুকির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা উন্নয়ন বাজেটের মধ্যে ১০১ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন কৃষি উন্নয়নের জন্য। সার, কীটনাশক ও সেচ যন্ত্র সরবরাহে ভর্তুকির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, প্রাইম সাপোর্ট হিসেবে ধান, পাট, আখ প্রভৃতি ফসলের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ এবং গ্রামভিত্তিক সবুজ বিপ্লব কর্মসূচি গ্রহণ করেন। শুধু গাছপালা ও ফুল ফসলের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর কৃষিবান্ধব চিন্তা সীমাবদ্ধ ছিল না, সামগ্রিক কৃষি উন্নয়ন ছিল বঙ্গবন্ধুর কৃষিভাবনার মূলসুর।

"আমাদের সমাজের চাষীরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে।"

– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য বঙ্গবন্ধু পরিবার প্রতি ১০০ বিঘা জমি নির্ধারণ করে দেন। উন্নত জাতের বীজ, সার, সেচযন্ত্র ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, সারে ভর্তুকির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ১৯৭২ সালে ইউরিয়া, টিএসপি ও পটাশ সারের মূল্য প্রতিমণ যথাক্রমে ২০ টাকা, ১০ টাকা ও ১৫ টাকা নির্ধারণ করে দেন। পাকিস্তান আমলে রজু করা ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের রক্ষা করেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেন। দরিদ্র ও ভূমিহীন, গৃহহীন কৃষকদের রক্ষায় গৃহ ও রেশনপ্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইজারাদারি প্রথা বিলুপ্ত করে, ভূমি প্রশাসন ও জমি সংস্কার মন্ত্রণালয় স্থাপন করেন এবং সেলামি ছাড়া জমি বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার দেড় বছরের মাথায় অতি দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি কৃষিসহ অন্যান্য খাতে নানাবিধ সুপারিশ দেয়া হয়। কৃষকদের কৃষিকর্মে ফিরিয়ে আনা, শোষণ কমিয়ে আনার জন্য ভূমি সংস্কারের উপর জোর দেয়া হয়। ক্ষুদ্র চাষি ও ভূমিহীন কৃষক-মজুরদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষিকাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রস্তাবিত রূপরেখায় ২৯৯ একর থেকে ৫০০ একর পর্যন্ত ভূমি নিয়ে একেকটি গ্রাম সমবায় সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন। প্রতি সমিতিতে একটি ব্যবস্থাপনা পর্ষদ ও প্রতিটি পর্ষদের অধীনে চারটি উপপর্ষদ গঠনের ব্যবস্থা প্রস্তাব করেন এই প্রস্তাবে ফসল কাটার পর উৎপাদিত ফসলের ৩৩ শতাংশ কৃষকের লাভ এবং ৬৭ শতাংশ সমিতির অংশ বলে বিবেচনা করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। সমিতির অংশের ৭০ শতাংশ চাষাবাদ খরচ, উপকরণ সরবরাহ ও আনুষঙ্গিক খরচ মিটানোর জন্য; ৭ শতাংশ সমিতির ব্যবস্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানিক খরচ ১০ শতাংশ সমিতির মূলধন খরচ, ৫ শতাংশ সমিতির কল্যাণ তহবিল এবং ১ শতাংশ কর ও খাজনা বাবদ সরকারকে পরিশোধের জন্য। মূলধন তহবিলের ৫০ শতাংশ গ্রামে স্থায়ী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অর্থায়ন ২৫ শতাংশ সমিতির সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসেবে এবং বাকী ২৫ শতাংশ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। "আমার বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। আমরা নতুন ল্যান্ডসিস্টেমে আসতে চাচ্ছি, আমরা কো-অপারেটিভে আসতে চাচ্ছি।"– বঙ্গবন্ধু

কৃষিক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ন করার জন্য স্বল্পমেয়াদী জরুরি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের পর বঙ্গবন্ধু মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং একটি স্থিতিশীল অর্থনীতি ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হন। দীর্ঘমেয়াদী কর্মকৌশল প্রণয়নের কাজও বঙ্গবন্ধু শুরু করেন। দীর্ঘমেয়াদী কর্মকৌশল প্রণয়নের কাজও বঙ্গবন্ধু শুরু করেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ঘোষণায় বলেন, "আঘাত করতে চাই ঘুনেধরা সমাজ ব্যবস্থাকে। নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমরা। গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-

অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। পাঁচ বছরের প্ল্যানে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামের প্রত্যেকটিতে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। এই কো-অপারেটিভে জমির মালিকের জমি থাকবে। বেকার অথচ কর্মক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তিকে কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। পয়সা যাবে তাদের হাতে। টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের হাতে। ওয়ার্কস প্রোগ্রাম হবে তাদের আওতাধীন। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল থেকে টাউটদের বিদায় দেওয়া হবে। তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না।" এদেশের কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বঙ্গবন্ধু আজীবন স্বপ্ন দেখেছেন। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য প্রয়োজন কৃষি বিপ্লব।

"বেশি শস্য উৎপাদনের জন্য আমাদের সবার সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।" –বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন মানুষের উপর জোর করে কোন কিছু চাপিয়ে দেয়া যাবে না। তিনি করে দেখানোর ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। এতে কৃষকরা নিজে নিজে শিখে নিজের আঙিনায় বাস্তবায়ন করতে উৎসাহিত হবে। এক গ্রামে ২০ জন কৃষককে একসাথে হাতে কলমে ক্ষেত-খামারে কাজ শিখালে অন্য কৃষকরা দেখে উৎসাহিত হবে এবং দেখে দেখে নিজের জমিতে বাস্তবায়ন করলে উৎপাদন বেড়ে যাবে। এই পদ্ধতিতে সারা বাংলার কৃষকগণ উদ্বুদ্ধ হবেন, সম্পৃক্ত হবে মূলধারার উন্নয়নে। আমাদের কৃষকরা দেখে কাজ করতে অভ্যস্ত, তাই তাদেরকে বাস্তবিকভাবে দেখে কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদদের বলেন, "আপনারা যারা কৃষিশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন, আপনাদের গ্রামে গিয়ে কৃষকদের সাথে মিশে যেতে হবে, মনোযোগ দিতে হবে তাদের চাহিদা ও কর্মের ওপর, তবেই তারা সাহসী হবে, আগ্রহী হবে উন্নতি করবে। ফলবে সোনার ফসল ক্ষেত ভরে, আপনারা এখন শহরমুখী হওয়ার কথা ভুলে যান। গ্রাম উন্নত হলে, দেশ উন্নত হবে, তখন আপনারা আপনা-আপনি উন্নত হয়ে যাবেন। গ্রামভিত্তিক বাংলার উন্নতি মানে দেশের উন্নতি, আর আপনাদের উন্নতি তখন সময়ের ব্যাপার। শহরের ভদ্রলোকদের দিকে তাকিয়ে আপনাদের চিন্তা বা আপসোস করার কোন কারণ নেই। কেননা গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়নের দিকে আপনাদের এবং আমাদের সবার ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কৃষক বাঁচাতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে, তা না হলে বাংলাদেশকে বাঁচাতে পারব না। বঙ্গবন্ধু জানতেন এদেশের জমিতে বিজ্ঞান-ভিত্তিক চাষাবাদ করতে পারলে যখন অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে। তাই কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণার উপর জোর দিয়েছিলেন। উন্নত জাত উদ্ভাবন করলে ফলন বহুগুণ বৃদ্ধি পাথে এবং সকল মানুষের খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

"আমি তোদের পদমর্যাদা দিলাম, তোরা আমর মান রাখিস।"–বঙ্গবন্ধু

কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির পদমর্যাদা দান কৃষিক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর আরেকটি সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত যা বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে। অন্যান্য টেকনিক্যাল গ্রাজুয়েটদের সরকারি চাকুরিতে দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদায় যোগদান করতে

হতো। এই বৈষম্য কর্মক্ষেত্রে এক জটিল ও বহুমাত্রিক টানাপোড়েন সৃষ্টি করেছিল। কৃষিশিক্ষা গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণসহ কৃষির সর্বক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছিল। পাকিস্তান সরকারের উদাসীনতা বৈষম্য নিরসনে কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করা এবং সর্বোপরি কৃষিকে গুরুত্ব না দেওয়া কৃষিক্ষেত্রে এক নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, কৃষিক্ষেত্রে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে হলে মেধাবী শিক্ষার্থীদের কৃষিশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করতে হবে। সকল দিক বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেরুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবর্ধ্বনা অনুষ্ঠানে সরকারি চাকুরিতে অন্যান্য টেকনিক্যাল গ্রাজুয়েটদের মত কৃষিবিদদেরও প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদানের ঘোষণা দেন। তিনি ব্যবহারিক শিক্ষার উপর জোর দিতে বলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ধরে ধরে মোটাতাজা গরু জবাই করে খেয়ে ফেলেছিল। সেজন্য তখন চাষের গরুর ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। তিনি বক্তৃতায় গরুর মাংস কম খেয়ে চাষের গরুর ঘাটতি পূরণের আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু আরও বলেন–

"শতকরা ৯০ জন কৃষক গ্রামে বাস করে। গ্রামের দিকে যেতে হবে। আমরা ইকোনমি যদি গণমুখী না করতে পারি এবং গ্রামের দিকে যদি না যাওয়া যায়, সমজাতন্ত্র কায়েম হবে না, কৃষি বিপ্লব হবে না। দেশের মধ্যে বিকৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, মানুষ মানুষকে খাবে। কারন খাবারের অভাব হলে মানুষের মাথা ঠিক থাকে না। সে জন্য খাওয়ার দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। সেদিকে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আমাদের সকলকে কাজে এগোতে হবে।"

"বঙ্গবন্ধু অবদান, কৃষিবিদ ক্লাস ওয়ান" এই উপলব্ধি অন্তরে ধারন করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে কৃষিক্ষেত্রে সকল কৃষিবিদ একত্রে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কৃষির উন্নয়ন অপরিহার্য। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্যতম সাফল্য। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ, কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের অন্যতম চাবিকাঠি। কৃষিক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ঠ সকলে বর্তমানে এসব ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু গৃহীত উদ্যোগ গুলোর যুগোপযোগী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ অনিবার্য। কৃষি গবেষণার ওপর বঙ্গবন্ধু গুরুত্ব আরোপ করেন যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য কৃষি গবেষনা প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। উন্নত জাত, প্রতিকূলতা সহনশীল জাত উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ, উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ, সার, সেচ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং প্রায় আঠারো কোটি মানুষের খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করেছে। বঙ্গবন্ধু কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে তার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলকে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কৃষিক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবাই একত্রে কাজ করে যাচ্ছেন যা বাংলাদেশকে বিশ্বে রোল মডেলে পরিণত করেছে।

তথ্যসূত্র

কৃষিতে বঙ্গবন্ধুর অবদান (২০১২)। কৃষি তথ্য সার্ভিস (এএসআই) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

রাজ্জাক, মো. আ. (২০২১)। *বঙ্গবন্ধুর কৃষি উন্নয়ন ভাবনা: বণিকবার্তা।*

ভূঁইয়া, মো. আ. র. (২০২০)। *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের কৃষি*, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

দেয়ালের ওপার থেকে

রিফাত আনজুম পিয়া
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হবিগঞ্জ

জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট এসে তীরের মত বিঁধছে গায়ে। পাতলা কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে কাঁপছেন বঙ্গবন্ধু। মিয়ানওয়ালির জেলখানায় উষ্ণ লেপ আশা করা বৃথা। দুনিয়ায় দোজখের শাস্তি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই বোধহয় আগুনের হলকার মত লু হাওয়া বওয়া লায়ালপুরে প্রায় আট মাস রাখার পর মিয়ানওয়ালিতে এনে হাঁড়কাপানো ঠাণ্ডায় কষ্ট দেওয়া হচ্ছে।

এটা নাকি পর্বতঘেরা শহর। গাড়ির কাঁচে কাদার প্রলেপ দিয়ে তাঁকে আনা হয়েছে এখানে। যেন অন্ধের মত আঁধারঘেরা ধাঁধাময় থাকে সবকিছু। কয়েদির বেশে স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজনকে রাখা হয়েছে তাঁর কাছাকাছি। গোপন কোন তথ্যাদি মেলে! হায় রে নজরদারি! বঙ্গবন্ধুর অবশ্য বোঝার কিছু বাকি নেই।

ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে হাজার মাইল দূরের গোপালগঞ্জের এক সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে তাঁর। মাঘ মাস তখন। কুয়াশাচ্ছন্ন চারপাশ, তার ওপর কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। স্কুলমাঠে ফুটবল খেলা সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। রাস্তায় এক বুড়ো ফকির ঠাণ্ডায় কাঁপছিল। ছেঁড়া পাতলা পাঞ্জাবিতে এই শীত মানে! বুড়োর করুণ মুখ, কঙ্কালসার দেহ, বাঁকাচোরা হাড়। বুকটা হু হু করে উঠেছিল তাঁর। গায়ের চাদরটা খুলে লোকটার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন হতবাক বৃদ্ধ কত দোয়া করেছিল তাঁর জন্য। বৃদ্ধের ছলছল চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠেছিল।

কবেকার সেই বুড়োর জ্বলজ্বলে চোখ মোমবাতির উষ্ণতার মত ওম দেয় এখন। বিস্মিত হন বঙ্গবন্ধু। ঠাণ্ডা হাওয়া কোথায় যেন হাওয়া! আরামদায়ক উষ্ণতা ঘিরে ধরেছে তাঁকে! আর যাই হোক, অন্তত লায়ালপুরের চেয়ে ভাল আছেন এখানে। সেটা নাকি পাকিস্তানের উষ্ণতম স্থান। সেখানে বন্দীদের শায়েস্তা করার জন্য নির্যাতনের প্রয়োজন পড়ে না, প্রকৃতিই তার রুদ্র মুর্তিতে ঘায়েল করে ফেলে। উফ, কি যে দুর্বিষহ ছিল একেকটা দিন! নিঃসঙ্গ সেল, গরমে তাওয়ার মত তেতে ওঠা ঘরে একটা পাখা পর্যন্ত ছিল না শুরুতে। পাহারাদার এসে নিঃশব্দে খাবার রেখে উধাও হয়ে যেত। পাকিস্তানি খাবার-দাবার সহ্য হত না তাঁর। একেকটা দিনকে একেকটা মাসের মত লম্বা মনে হত। মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে আসত, মনে হত পাগল হয়ে যাবেন! বই নেই, খাতা নেই, খবরের কাগজ নেই, কথা বলার মানুষ নেই। একটা চিঠি পর্যন্ত আসে না। এভাবে বাঁচা যায়? দেশে কি ঘটছে, তার কিছুটা আঁচ করতে পারলেও নিশ্চিতভাবে জানার সুযোগ ছিল না। তীব্র গরমে ক্লান্ত অবসন্ন-অসুস্থ করে, নিঃসঙ্গতায়-অনিশ্চয়তায় বিষণ্ণতা রোগে ঠেলে দিয়ে তাঁকে শেষ করে দেওয়ার পাঁয়তারা করছে ইয়াহিয়া খান। কিংবা তাঁকে উন্মাদ অপ্রকৃতস্থ ঘোষণা দিয়ে পাগলাগারদে পাঠাতে চাইছে! ঘাতকরা যখনই এসব ভাবতেন, ততবারই

ভেতরে এক ঐশ্বরিক শক্তি অনুভব করতেন। ভেতরে যতই তোলপাড় ঘটুক, বাহিরে একদম নির্বিকার, নিস্পৃহ, প্রশান্ত থাকতে হবে। বন্দী জীবন তো তাঁর জন্য নতুন কিছু না। বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী। A man can be destroyed but not defeated।

হ্যাঁ, তাঁকে শেষ করে দেওয়ারই তো ষড়যন্ত্র চলছে। মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দী তিনি। বিচারের প্রহসন চলল কিছুদিন। বেসামরিক মানুষের জন্য কোর্ট মার্শাল! পাক সামরিক সরকার তাঁর বিরুদ্ধে বারোটা অভিযোগ দায়ের করেছিল। এর মধ্যে ছ'টির সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সরকার ন্যায়বিচারের ভান করার জন্য আবার তাঁর পক্ষে আইনজীবীও নিয়োগ করেছিল। বঙ্গবন্ধু সাফ বলেছিলেন তাঁর উকিলের দরকার নেই। এই বিচারের রায় কি হবে, তা তো তাঁর জানাই ছিল। একজন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর গোপন বিচার বসানোর এখতিয়ার এদের নেই।

মিয়ানওয়ালির এই কনডেম সেলে বসে বঙ্গবন্ধু টের পেয়েছেন, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকলে মৃত্যুভয় ঘেঁষতে পারে না। মৃত্যু তো একবারই আসে, ওপরওয়ালা যেদিন লিখে রেখেছেন সেদিনই হবে। তবে তাঁর মন বলছে, এখানে এই শত্রুভূমিতে তাঁর মৃত্যু লেখা নেই। বাংলাদেশ আর তাঁর নিয়তি একসূত্রে গাঁথা। স্বাধীন বাংলাদেশ তিনি দেখে যাবেনই।

এখানে নিশ্ছিদ্র পাহারা। স্পষ্টভাবে কিছু জানার সুযোগ নেই। তবু টুকরো টাকরা কিছু কথা বাতাসে ভাসে। তারও চেয়ে বেশি তিনি দেখতে পান অন্তঃচক্ষুতে। দেশে নিশ্চয়ই যুদ্ধ চলছে। সাধারণ মানুষ প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে মরণনেশায় মেতেছে। পাকিস্তানিদের তারা দেশছাড়া করবেই। ইশ! হাত নিশপিশ করে বঙ্গবন্ধুর। রক্ত ছলকে ওঠে! এসময় ঐ দেশে থেকে নেতৃত্ব দিতে পারতেন! কিন্তু ২৫ মার্চ তিনি আত্মগোপনে গেলে পাকিস্তানি বাহিনীর রোষ বহুগুণে বাড়ত। একটি দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর পালিয়ে যাওয়া শোভা পায় না। তাঁর অবর্তমানে তাজউদ্দীন আহমদ নেতৃত্বের ভার নিয়েছে? অশুভ কিছু যে ঘটবে তার আভাস মিলছিল মার্চের শুরু থেকেই। ২৫ মার্চ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান, মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামাল হোসেন, গাজী গোলাম মোস্তফা সবাইকেই দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ-এই চার যুবনেতা গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার ভার নেবে, এমন নির্দেশনা আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পাশে থাকবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন এটুকুই ভরসা। আহ্, এই অনিশ্চয়তা- অস্থিরতা! যদি এক ঘুমে পার করা যেত এই মন্থর দিনগুলো। যদি, ঘুম ভেঙে দেখতেন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে! এই কারাগারের ঘুলঘুলিতে একটা অচিন পাখি প্রায়ই এসে বসে। ওকে দেখলেই মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। জানালায় খাবার রেখে দেন তিনি ওর জন্য। আহা, যদি ও কথা বলতে পারত! রূপকথার পাখিদের মত বার্তাবাহক হত যদি! যদি দেশের খবর বয়ে আনত ঠোঁটে করে আর নিয়ে যেত তাঁর পরান পোড়ানোর খবর।

তাঁকে যদি মেরে ফেলে তো ফেলুক, কিন্তু দেশে থাকা রেনু, হাসু, রেহানা, রাসেল এদের গায়ে যেন কোন আঁচড় না পড়ে! ধানমন্ডিতে বন্দী জীবন তাদের। দুই কন্যার জন্য প্রায়ই

দুশ্চিন্তা হয়। বড় মেয়েটি সন্তানসম্ভাবা ছিল। নাতির মুখটা দেখতে পেলেন না এখনো। ছোট্ট রাসেলের কথা মনে পড়ে। ছেলেটার কপালে বাপের আদর নেই। এই অল্প বয়সেই যুদ্ধের আতঙ্ক আর ভয়াবহতার মুখোমুখি হল সোনামানিকটা। ওকে বুকের ভেতর আগলে রাখতে ইচ্ছা করে খুব। রেনু অবশ্য একাই বাপ-মায়ের দায়িত্ব পালন করছে। বাঙালি মেয়েরা স্বামী-সন্তান নিয়ে যে নিরূপদ্রব সুখের সংসার চায়, তেমনটা কখনো পায়নি সে। সংসার তো নয়, যেন উত্তাল সমুদ্র। তাও স্বামীর গর্বে গরবিনী সে। একা হাতে সন্তানদের মানুষ করেছে। কামাল আর জামাল নিশ্চয়ই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

বাবা-মা কেমন আছেন? তাঁরা কি টুঙ্গিপাড়ার বাড়িতেই? তাঁদের হেফাজতে রেখ খোদাথথ দীর্ঘশ্বাস বেরোয় বঙ্গবন্ধুর গলা দিয়ে। সেবার যখন বন্যার সময় ডিঙ্গি নৌকা উলটে পানিতে পড়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি নয় বছরের বালক, তখন জ্বরে কাহিল দিনরাত ঘুমিয়ে কাটানো খোকা চোখ মেললেই দেখতে পেত মায়ের মুখ। মা মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন, "খোকা রে, কেমন লাগছে বাবা আমার?" বাবা সেবার গোপালগঞ্জ থেকে ফিরে তাঁকে শহরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জ্বরের ঘোরেই খোকা টের পাচ্ছিল, তাঁকে গ্রামে নিজের কাছে রাখার জন্য মায়ের কি অনুনয়-বিনয়। আর বাবা ডানপিটে ছেলেকে বড় মানুষ বানাবেন বলে শহরের নিয়ম-শৃঙ্খলায় বাঁধতে চান। শহর অবশ্য শেখ মুজিবুর রহমানকে বাঁধতে পারেনি কখনোই, বরং দুনিয়াটাকে আরও প্রশস্ত করেছে। তবে বাবা-মা কখনোই তাঁকে বাধা দেননি কিছুতে। তাঁরা যেন জানতেন, ছেলে শুধু তাঁদের একার নয়। এই পৃথিবীর দাবি আছে তাঁর ওপর। ছা-পোষা জীবনের গণ্ডিতে তাঁকে কিছুতেই বাঁধা যাবে না।

বঙ্গবন্ধু ভাবেন, ইয়াহিয়া খানের সাধ্য আছে এই কারাগারের গণ্ডিতে তাঁকে বেঁধে রাখার! তাই হয়ত তড়িঘড়ি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে। একান্ন বছর বয়স তাঁর। আব্বার বয়স এখন নব্বই। তুলনা করলে মৃত্যুর জন্য বয়সটা তাঁর কমই। কিন্তু একান্ন বছরের জীবনকে অত ছোট মনে হয় না। ঢাকা-কলকাতা-দিল্লি-লাহোরে কত ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী এই দুই চোখ! কত বড় বড় নেতার সান্নিধ্যে কেটেছে তাবৎ জীবন। কত উত্থান-পতন-ট্রাজেডি দেখেছেন এক জীবনে। চষে বেড়িয়েছেন দেশের আনাচ-কানাচ। কত মানুষের ভালবাসা পেয়েছেন জীবনে! বড় রোমাঞ্চকর আর উত্তেজনাপূর্ণ জীবন তাঁর। দু'বছর আগে, ১৯৬৯ এ ছাত্র-জনতা ভালোবেসে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেছে। তারাই আন্দোলন করে তাঁকে জেল থেকে মুক্ত করেছিল। সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল, "স্বার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে, স্বার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে।"

এ বছরটা উত্তালতম। এই সেদিন...এই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে মানুষের ঢল নেমেছিল। তিনি কথা বলা শুরু করলেন যখন, তখন চরাচরে যেন তাঁর গলার আওয়াজ ছাড়া আর কিছু নেই। যেন পাখিরাও ডাকাডাকি করতে ভুলে গেছে। যেন এত মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও গায়েব হয়ে গেছে। তাঁর প্রতি তাদের যে অগাধ আস্থা আর ভালবাসা শুধু তাই জ্বলজ্বল করছে চোখে। ঠিক সেই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর মনে হয়েছিল, এক ঐশ্বরিক শক্তি ভর করেছে তাঁর ওপর। অনগর্ল বেরিয়ে আসছিল সঠিকতম শব্দ। তিনি যা বলতে চান,

ঠিক তাই বলতে পারছেন। দেশের মানুষ যা শুনতে চায়, তা-ই শুনছে। মনে হচ্ছিল, সাড়ে সাত কোটি মানুষের শক্তিতে বলীয়ান তিনি। রাজনৈতিক মত-পথ-নীতি-আদর্শ নির্বিশেষে দেশের মানুষ তাঁর হাতে দেশ স্বাধীনের ভার তুলে দিয়েছে। তাঁর মত ভাগ্যবান আর কে আছে? একেকটা শতাব্দীতে কয়জন মানুষের এমন সৌভাগ্য হয়? স্বাধীন দেশে একবার পা রাখতে পারলেই তিনি দায়মুক্ত। দেশের মানুষের কাছে তিনি যে ওয়াদা করেছেন, তা পালন করে তবে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে চান।
রাত গভীর হয়েছে। ঘুমে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে বঙ্গবন্ধুর। চোখ বুঁজতে না বুঁজতেই তিনি ভেসে চলে যান স্বাধীন বাংলাদেশে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে ছুটির মেজাজে বারান্দায় বসে আছেন তিনি। তাঁকে ঘিরে বাড়ির সবাই। বড় মেয়ের প্রথম সন্তানকে কোলে নিয়ে আছেন তিনি। ছোট্ট রাসেল খানিকটা অভিমান করেছে তার আব্বার কোল আরেকজন দখল করেছে বলে। ঈদের আনন্দ সবার মনে। আশপাশের সব বাড়ির ছাদে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। প্রতিটা ছাদে মানুষের মিলনমেলা। সবার হাসিমুখ-আনন্দের ঝিলিক ম্লান করে দিচ্ছে সূর্যের আলোকে! জীবন বড় সুন্দর! বাবার মনোযোগ কাড়তে হঠাৎ "জয় বাংলা, জয় বাংলা" স্লোগান দিতে শুরু করল রাসেল।

ঘুম ভেঙে গেল বঙ্গবন্ধুর। ঘুলঘুলিতে সেই অচিন পাখি কিচিরমিচির করছে। জয় বাংলা! পাখিটা কি জয় বাংলা বলল! অস্পষ্ট শুনতে পেলেন যেন। কে জানে, হয়ত জয়ের আগাম দৈববাণী পেয়েছে পাখিটা! সুন্দর একটা স্বপ্ন আর পাখির গলায় জয় বাংলা! মন বলছে, শুভ কিছু ঘটবে শিগ্‌গিরই! বঙ্গবন্ধু বিড়বিড় করে যান, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা... ।

পিতা তুমি, বন্ধু তুমি

এস এম খায়রুল বাশার
সহকারী কর কমিশনার, কর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল-বগুড়া

জন্ম তব বঙ্গদেশে,
জন্মেছিলে বীরের বেশে।
গগণ মাঝে সূর্য যেমন,
প্রখরতা তোমার তেমন।
বলিষ্ঠ কণ্ঠ যেন বিশ্বসভায় বাজে
বঙ্গদেশের বঙ্গভাষায় কথামালা সাজে।
পরাধীনতার শিকল ভাঙার স্বপ্ন ছিল বড়,
সেই স্বপ্ন সত্যি করে সোনার বাংলা গড়।
মুক্তি এনে গেয়েছিলে স্বাধীনতার গান
বিশ্বপটে লাল-সবুজের বিজয় আবহমান!
রক্তে ভেজা ইতিহাসে অশ্রুর নেই শেষ,
চড়া মূল্য দিয়ে এনে দিলে বাংলাদেশ।
তোমার অভাব হবে না পূরণ; নেতা তুমি মহান
জাতির জনক তোমায় মানি, তুমি অম্লান।
শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি; তোমায় জানাই সম্মান,
পিতা তুমি, বন্ধু তুমি; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মুজিবঃ চির উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম

মোঃ সানাউল মোর্শেদ
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুর

কোটি বছর ধরে পলির স্নেহে গড়ে ওঠা
এই সবুজ শ্যামল জনপদ
বাঙালি জাতির ঘাম শ্রম প্রেমে
হয়ে উঠেছিল সুখী সমৃদ্ধ নিরাপদ।

তারপর হঠাৎ বেনিয়ারা এলো-
দীর্ঘ দু'শত বছর ধরে রক্ত চুষে খেলো।
সুদীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের পর
ব্রিটিশ বিতাড়িত এই ভূখণ্ডের ওপর,
তেইশ চলেছে শোষণ নিপীড়ন
পাকিস্তানি বর্বর হানাদারদের।

ঘুগে যুগে এসেছিল কত মহান নেতা
কিন্তু এনে দিতে পারেনি তারা স্বাধীনতা,
অবশেষে বাংলার বুকে এলেন এক মহানায়ক
যার বীরত্ব আর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি হয়েছিল এক।

দীর্ঘ শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বাঙালি
তাঁকে ঘিরে বুনতে থাকলো স্বাধীনতার বপ্ন
এক তর্জনীর নির্দেশ আর বজ্রকণ্ঠের গর্জনে
সমগ্র জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রণাঙ্গনে।

তারপর দীর্ঘ নয় মাসে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম
পৃথিবীর বুকে লিখলো স্বাধীন বাংলার নাম।
নিঃসঙ্গ কষ্টের বন্দী জীবন শেষে
জাতির পিতা ফিরলেন মহাবীরের বেশে।

নিলেন শপথ সোনার বাংলা গড়ার
কিন্তু পেলেন না সময় তিনি বেশি আর-
পঁচাত্তরের আগস্ট মাসে
বাংলার জমি হলো ভারী পিতার পবিত্র লাশে!

লেখা হবে শত গদ্য পদ্য লেখা হবে শত স্মৃতি
বাংলা থেকে হবে না কভু মুজিব নামের ইতি।

বাংলাদেশ যদি হয় ইতিহাসের চিঠি
শেখ মুজিব তার খাম,
সময় পরাজিত হলেও খোদিত রবে
মুজিব; চির উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম।

Oh Killer, what have you done

Md. Iftekharul Islam Shamim
Assistant Commissioner, Office of Deputy Commissioner, Naogaon

The bullet is fired
You think, that bullet can let him down?
How many bullets have you got?
Release them all
You come to do the heinous killing
You think, bullet can pierce that 71-inch flesh?
No bullet can make a hole
A protagonist, a creator, a fearless leader
And you think, you can make him dead
Oh killer, what have you done?

You try to break down the Himalayas
But the Himalayas is still there, not a single rock is lost;
You try to wipe out the ocean
But the ocean is still there, not a single drop is lost;
He has a heart like the Himalayas
His paradigm is deep as the ocean
And you think, you can kill him with one bullet?
Oh killer, what have you done?

You carry the bullets and the tanks
You think, that can stop his thunderous voice?
Don't you hear that historical speech?
That ignites the spark in every living soul
Goosebumps; being readz to fight
Don't you cry?
And you think, you make us forget that voice?
You can never be vindicated; your temptation will cause bloodshed
But remember, an immortal can never be mortalized
Oh fool, can't you hear?
Every soul is crying
Oh killer, can't you see?
You bring the darkest night

I curse you and curse you
Curse you till I die
You will be cursed; you will be hated
No country, no identity; being a living dead
You repent for the countless nights
While your eyes rest, a voice will come
Oh killer, what have you done?

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: Architect of Economic Development of Bangladesh

Mohammad Mozaherul Hoque
Assistant Commissioner, Office of Deputy Commissioner, Bagerhat

"We want to transform this land of destruction and death into Shonar Bangla (Golden Bengal), where the mothers in future will have smile on their faces and the children will play merrily. We will build a society free of exploitation. Make the task of nation-building a mass movement. Wherever you work-be that in agricultural field or factories-you can contribute to nation-building through your work. Let us unite and make a concerted effort to rebuild our golden Bengal so that it can become a land of smiles."

--Address to the Nation by Bangabandhu, on first independence anniversary of Bangladesh[1]

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman who loved the people of Bangladesh and strived for the freedom of them, especially for their economic freedom, played the role of an unparalleled leader turning people toward an armed struggle to liberate from the economic and political emancipation of the mass people from exploitation and oppression and to make supreme sacrifice to create a new state. His directives and words were unanimously accepted as law by every person of Bangladesh immediately before and after the war of liberation in 1971. He transformed himself from an ordinary worker of a political party to a unanimous leader of millions of people possessing outstanding organizational ability. Soon after the independence through a bloody war sacrificing 3 million lives of the country, Bangabandhu started working to build a war devastated country in line with people's needs and priorities. The article will discuss on different aspects of the philosophy of economic and development thoughts and practices of inclusive development of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Shonar Bangla (Golden Bangla): Retrieving the Past Glory of Bengal

Before the independence of Bangladesh, Bangabandhu used the term of Shonar Bangla (Golden Bengal) for several times in writings and speeches as well. He believed that Bengal was a region of treasure of riches in past before the coming of invaders. This region was familiar to outsiders for its geographic benefits, fertile land for agricultural production and river connectivity across the region made the region cheap and eaSz to transport

[1] Rahman, Dr. Atiur, *Bangabandhu's Economic Thought and Sustainable Development of Bangladesh,* The Daily Sun, (the article found at following link- https://www.daily-sun.com/post/380387/Bangabandhu%E2%80%99s-Economic-Thought-and-Sustainable-Development-of-Bangladesh retrieved dated on 24-10-2021)

in trade and passengers. Bangabnadhu was highly aware of the past glory of the region and wanted to regain the lost glory of Bengal establishing an independent country.

Bangabandhu, therefore, was a pragmatic politician about to upgrade the livelihoods and living conditions of the people. He was committed to make the dream of Shonar Bangla in reality putting a smile on the faces of the poor and unhapPz people.

Election manifesto in 1970 election: The election manifesto of Awami League in the historic election in 1970 was prepared on the ground of six points of the party and the eleven points of student council. The manifesto clearly illustrated to follow the socialist economic order on the purpose of removing economic injustice, promoting economic growth and distributing the fruits of such growth among all sections of the people and the different regions of the country. The manifesto proposed several ways to achieve the objectives as the following:

"…nationalization and the extension of the public sector by the development of cooperative enterprises and by the evolution of new institutional arrangements such as worker participation in the equity and management of industrial enterprises."

The manifesto also proposed agrarian reformation and suggested to introduce massive programme for multipurpose cooperatives.[2]

Socialism as a mean to establish Shonar Bangla: In his published books namely – The Unfinished Memoirs and The Prison Diaries-Bangabandhu expressed that he got involved in the politics for two reasons, firstly to liberate the peasants and workers from exploitation and secondly, to eliminate inequality between the rich and the poor. However, Bangabandhu realized that socialism was an effective instrument to achieve his objectives and set goals. He was also intended to accept any sort of path which could improve the socio-economic conditions of the people[3]. In The Unfinished Memoirs, he rightly stated that:

"I myself am no communist, but I believe in socialism and not in capitalism. I believe capital is a tool of the oppressor. As long as capitalism is the mainspring of the economic order people all over the world will continue to be oppressed." [4]

---

[2] *How Bangabandhu appealed to people before the 1970 election*, The Dhaka Tribune (the article found at following link- https://www.dhakatribune.com/opinion/special/2020/03/22/how-bangabandhu-appealed-to-people-before-the-1970-election retrieved dated on 23-10-2021)

[3] Sobhan, Rehman, *Untranquil Recollections The Years of Fulfillment*, Sage Publication, India, 2016, PP- 250-260

[4] Jahan, Dr. Rounaq, *The political philosophy of Bangabandhu*, Centre for Policy Dialogue, (the article found on following link- https://cpd.org.bd/the-political-philosophy-of-bangabandhu-dr-rounaq-jahan/ retrieved on 22-10-2021)

Influenced by China Model on Socialism: Bangabandhu visited China in 1952 to attend a peace summit on the invitation of Chinese government. Comparing the scenario of socio-economic progression of China, Bangabandhu wrote his feeling on the aspects of Pakistan and China in the following way:

"The big difference between us and them was that people in China knew and were made to feel that the country and its resources were their own. On the other hand, our people had begun to comprehend that the resources of the nation were being enjoyed by a coterie while they themselves were getting no share of them."

--Amar Dekha Noya Chin (The New China as I saw), Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

Getting embraced by the policy of Chinese government, he mentioned in his previous book as followed-

"The communist government had confiscated the land owned by landlords and had distributed it among all farmers. Thus, landless peasants had become landowners. China now belonged to peasants and workers and the class that used to dominate and explit had had their day… Everywhere we could see new schools and colleges coming up. The government has taken charge of education."

New Guiding Principles: In 1972, the constitution of Bangladesh adopted 'Democracy, Socialism, Bengali Nationalism, and Secularism' as four guiding principles of Bangladesh. Bangabandhu carefully identified his thoughts on the principles of Democracy and Socialism along with fundamental human rights and freedom of expression and thoughts and secularism to proceed of embarking upon its development story[5]. The economic philosophy was followed by Bangabandhu after the independence was on the basis of reality of peoples' needs and expenditures. At that time, Bangabandhu faced two types of problems to lead the economy. Firstly, there was a shortage of a 'managerial class' to operate the state affairs. Secondly, there was the absence of a capitalist class (then 22 families in Pakistan controlled the economy stayed in Pakistan after the independence) that could work with the state[6]. On the basis of the sense of realism, he followed the context of mixed economy of three tier ownership that mentioned at the article 13 of the constitution.

---

[5] *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh*, Ministry of Law, Justice and Parliament Affairs, 2016, p-04

[6] *Op cite*, Rahman, Dr. Atiur.

Mujib's Economic Vision Translating into Policy in Independent Bangladesh

Freedom fighters fought on the call of Bangabandhu to liberate the country from Pakistan occupation army to bring the dream of economic equity for every people in independent country. Bangabandhu faced many challenges from economic to political and societal to cultural assuming the office of Prime Minister coming at independent Bangladesh on 10 January 1972. He took initiative to meet the challenges of experienced personnel to operate state affairs and to fill the policy-making vacuum.

Establishing Financial Institutions: Bangabandhu set up immediately a National Planning Commission to provide with the policy direction for economic development in a newly liberated country and the central bank named as Bangladesh Bank within two days of his return to Bangladesh. He created a platform of several economists of the country as members of the Planning Commission instructed them to make policy on socialist economic ideology[7].

Economic Policy Stated in the Constitution: In later of 1972, the Constitution of Bangladesh was adopted by the members of constituent assembly. The Constitution clearly stated four guiding principles (articles 8-12) of the state along with some other fundamental principles of state policy (articles 13-25). Significantly, the articles 13-19 clearly reflected the ideology of socialist economic policy to promote exploitation-free socio-economic Szstem and equality in the distribution of resources[8].

Policy Formulation to Transform Mujib's Economic Vision: Planning Commission formulated policies to execute the economic vision and directives of Bangabandhu in five areas[9]-

- ***Agrarian Reformation:*** Bangabandhu formed Land Reform Committee in mid-1972 to prepare a policy for agrarian reform and moderation. He introduced the policy of compulsory multipurpose cooperatives along with political reformation named as BAKSAL. He suggested for the collective cultivation of land and for distributing the agro production on the basis of Tebagha principle among landowners, farmers and state.

- ***Industrial Economy:*** The Pakistani commercial bourgeoisie as owners, managers and technical experts who dominated industrial economy in East Pakistan departed the region following the

---

7 *Ibid,* Rahman, Dr. Atiur

8 *Op cite,* The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, pp-4-6

9 Islam, Sayed Manzoorul, *Bangabandhu's Dream of Shonar Bangla anchored in 1972-1975*, The Financial Express, (the article found at the following link- https://thefinancialexpress.com.bd/mujib100/bangabandhus-dream-of-sonar-bangla-anchored-in-1972-1975-1584425800 retrieved on 20-10-2021)

independence of Bangladesh. So, a vacuum was created in private sector in Bangladesh especially in manufacturing, international trade, domestic commerce, financial Szstem and transportation Szstem. In this situation, Bangabandhu decided to nationalize these enterprises got idle without production recruiting administrators. On the other hand, he appointed professionals as CEOs and directors instead of bureaucratic officials at the nationalized industrial and financial enterprises so that they can operate the enterprises with autonomy making them as competitive commercial enterprises.

- ***First Five-Year Planning:*** Bangabandhu initiated a longer-term vision for the economy named as Five-Year Planning (FYP) for the country to fulfill his commitment of building an exploitation-free and self-reliant economy on socialistic lines whereby poverty and hunger would be eliminated. The FYP was drafted getting inspired by the Constitution. The plan was designed to replicate the scenario of economic thoughts of Bangabandhu within the limitations of time and resources. The FYP was a great achievement of Bangabadhu during his tenure.

- ***Relationship with World Financial Institutions:*** Bangabandhu was firm on his belief of not taking any aid from World Financial Agencies as World Bank and IMF with any sort of conditionality and not becoming aid dependent country at the cost of donors imposing policy preferences. He guided the Planning Commission to deal with independence in maintaining any economic relations with World Financial Agencies.

- ***Balanced Indo-Bangladesh Economic Relations:*** Bangabandhu highly prioritized to keep a balanced and equitable type of relations with India in different issues of bilateral affairs. From economic perspectives, it was significantly seen that a trade policy accepted to both countries facilitated to enhance and diversify Bangladesh's export capacity to India.

Concluding Remarks

Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman dreamt of building Bangladesh as Shonar Bangla (Golden Bengal) without any sort of political, economic, political and cultural discrimination and exploitation and led the country toward an inclusive economy initiating newly formulated agricultural and industrial policies. He transformed his socialist economic policy following the independence of Bangladesh formulating policies of nationalization of industries and reformation of agricultural mode. The challenges generated after liberation war in the aspects of economy were clearly identified in the 'New Industrial Investment Policy,

1974' and 'First Five-Year Plan'. The present significant economic growth of Bangladesh is based on the legacy of economic policy and strategy introduced by Bangabandhu who followed the context of mixed economy for achieving the best interest of the country that's why the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is remembered as the architect of the independence and economic development of Bangladesh.

Bibliography

1. Rahman, Sheikh Mujibur, *The Unfinished Memoirs*, Dhaka, UPL, 2012.
2. Rahman, Sheikh Mujibur, *The New China as I Saw*, Dhaka, Bangla Academy, 2020.
3. Sobhan, Rehman, *Untranquil Recollections The Years of Fulfillment*, Sage Publication, India, 2016
4. Sobhan, Rehman, *Bangladesher Obhyudoye Ekjon Protokkodorshir Vassho*, Dhaka, Vorer Kagoj Prokashoni, 1994

বাচিক শিল্পের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ

ডক্টর মোহাম্মদ রেজাউল করিম
উপপরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

ক্রোধ আর দ্রোহে প্রজ্জ্বলিত শব্দ বিন্যাসের সাথে মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধের স্বরধ্বনির উচ্চারণ যে কত শক্তিশালী এবং স্থায়ীরূপ গ্রহণ করতে পারে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তার একটি অকাট্য প্রমাণ। কবিতার মানদন্ডে এটি একটি মহাকাব্যিক গ্রন্থনা, উপস্থাপনা শৈলীতে কালোত্তীর্ণ; জনপ্রিয়তায় খ্যাতির শীর্ষে; প্রভাবক হিসেবে শক্তিশালী পরিবর্তনশীল একমাত্র অনুঘটক। গভীর ভাবাবেগ, তীক্ষ্ণ অনুভূতি, সুনিপুণ কণ্ঠের ছোঁয়ায় এই ভাষণ হয়ে উঠে এক ঐন্দ্রজালিক উপস্থাপনা। প্রতিটি শব্দই যেন প্রয়োজনীয়, অবশ্যসম্ভাবী এবং অর্থবোধক। বাঙালি জাতির সংগ্রামী ইতিহাসের সার্থক মুখবন্ধ।

বঙ্গবন্ধু একজন পরিমিতি বোধের কবি। কবিতার মাধ্যমে সকল কথা তিনি মাত্র উনিশ মিনিটের মধ্যে শেষ করেছেন। সময়ের বিচারে খুব বড় বক্তৃতা না হলেও এর ব্যপকতা অপরিসীম; যার প্রতিধ্বনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মানুষের হৃদয় থেকে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকে। আবৃত্তিকারের একটা জায়গা থাকে কবিতার কোন লাইনে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে যা আসল কবিকেও ছাড়িয়ে যায়। তাঁর ভাষণের শেষ দু'লাইন বঙ্গবন্ধুর সিগনেচার। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

আবৃত্তিকারের ধরণ ভিন্নতার কারণে যে কোন আবৃত্তি নতুন মাত্রা ধারণ করে। শব্দের প্রতি দরদ রেখে নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রক্ষেপণ ঘটানো; স্বাচ্ছন্দ আর শ্রোতার গ্রহণ করার মাত্রার উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট কিছু শব্দমালার পর ক্ষণিক থামা, স্বরতন্ত্রের উঠানামা আবৃত্তিতে দ্যোতনা তৈরি করে যার জন্য শ্রোতা হারিয়ে যায় শব্দের ভিতর, বাক্যের মধ্যে, আবৃত্তিকারের সাথে। প্রতীক্ষারত আগ্রহী শ্রোতৃমন্ডলী গভীর উত্তেজনায় আবেগ তাড়িত হয়। তিনি যখন দরাজ গলায় উচ্চারণ করেন, 'ভাইয়েরা আমার...' সে এক সুনিপুণ কারুকাজ। পুরো পৃথিবী থমকে দাঁড়ায় কিছু সময়ের জন্য। এই হালকা বিরতির কারুকাজ কোন আবৃত্তিকারের জন্য আর কখনই তৈরি হবে না। তিনি স্বভাবজাতভাবে যখন আবৃত্তি চালিয়ে যান, শ্রোতা উদ্বেলিত হয়, উচ্ছ্বসিত হয়, আমোদিত হয়, আন্দোলিত হয়। এই পরিবর্তন শ্রোতার মনোজগতে আমূল পরিবর্তন আনে; তাঁকে ধাবিত করে অর্জনের লক্ষ্যে; সৃষ্টিশীলতার মোহে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে যায়। এতটাই আন্দোলিত হয় সে কবিতাই তার ধ্যান-জ্ঞানে রূপদান করে। সাহস সঞ্চারিত করে এতটাই প্রভাবিত হয় যে, নিজের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে মর্মবাণী অনুযায়ী লক্ষ্য অর্জনে নিজেকে বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করে না।

শিল্পের বিচারে বাচিক শিল্পী হিসেবে বঙ্গবন্ধু সময়জয়ী; সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন স্বমহিমায়। সমসমায়িক রাজনীতির ধারার বাইরে সকল কবির জন্য কবিতার রসদ অকাতরে বিলিয়ে গেছেন। সমসাময়িক কালের উত্তরণ ঘটিয়ে আধুনিক এবং উত্তরাধুনিকতার জন্ম দিয়েছেন এবং উত্তরাধুনিক কবিদেরকে অবলীলায় অতিক্রম করে যোজন যোজন দূরত্বে পেছনে রেখে সঙ্গে করে নিয়ে উপনীত হয়েছেন বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কাছে। সীমা-পরিসীমার বিচারে শুধুমাত্র দেশীয় দলিলের বাইরে এটি একটি বিশ্ব প্রামাণিক দলিল। ষোল কোটি মানুষের বাইরে এটি লক্ষ কোটি মানুষের সম্পদ। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত মানুষের অনুপ্রেরণার একটি সুদীর্ঘ স্রোতস্বিনী; স্বাধীনতা প্রতাশী তৃষ্ণার্ত জাতির তৃষ্ণা নিবারণের এক স্বচ্ছ সরোবর। ৭ই মার্চের ভাষণ যেকোন বিচারে শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা, শ্রেষ্ঠ আবৃত্তি। তাঁর নিজস্ব শৈল্পিক ধরণ আছে যা তাঁর নেতৃত্বের চেয়েও বেশি কিছু, যা তাঁকে অনন্যতা দান করেছে। দৃপ্তপদে মঞ্চে উঠে দু'হাত পিঠের দুপাশে দিয়ে ডানে বামে একটু ঘুরে উপস্থিত শ্রোতাদের নিজের করে নিলেন; সেই সাথে তৈরী হলো তাঁর অবস্থানের এক শক্ত ভীত। সে ভিত্তি শুধু একটি দেশের পরিপূরক নয়, হাজার বছরে সৃষ্ট একটি দেশ সে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে রইলো অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য। যে ভিত্তি তাঁর শিল্পী সত্ত্বার স্থায়িত্বের ভিত্তি; যে ভিত্তি নিজস্বতার জায়গা, যে ভিত্তি হিমালয়সম এক মহানায়কের প্রতিকৃতি। যে জায়গাটা তিনি শুধু নিজের করে নিয়েছেন তা নয়, সমগ্র পারিপার্শিক অবস্থাকে একটি দেশ জাতির জন্য চলমান শিল্পে রূপান্তর করেছেন।

কবিতার ভাষা সাধারণের ভাষা হলে তার ব্যাপকতা হয় গভীর। মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে, দৈনন্দিন কার্যক্রমকে প্রভাবিত ও ব্যক্তি জীবনকে আন্দোলিত করে। সাবলীল বাংলা শব্দের সঠিক উচ্চারণের পাশাপাশি দু'একটি আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার ভাষার সর্বজনীন রূপ এবং সারাদেশের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য তুলে ধরেছেন। একঘেয়েমির পরিবর্তে নতুন দ্যোতনা তৈরি করেছে। "দাবায়ে রাখতে পারবা না"। শুদ্ধ বাংলায় উচ্চারিত হলে তার ব্যাপকতা ও গুরুত্ব কখনই এর মত হতো না। আবার সমসাময়িক শব্দচয়ন বিষয়কে যেমন স্পষ্ট করে, শ্রোতাকে দারুণভাবে আকৃষ্টও করে। যার ফলে তিনি সবার পরিচিত ইংরেজি শব্দও ব্যবহার করেন; যেমন 'এসেম্বলি কল করেছে', ' সামরিক আইন মার্শাল 'ল উইথড্র করতে হবে'। সময়কে উপস্থাপনের জন্য; সময়কে ধারণ করার জন্য; একটি সময়কে অন্য সময়ের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য এর চেয়ে ভালো সংযোজন আর কিছু হতে পারে না।

কবি কবিতায় সন্নিবেশিত শব্দমালার মাধ্যমে সময়কে ছাড়িয়ে যাবার জন্য সচেষ্ট থাকেন; আর আবৃত্তিকার তাঁর ঢং, ধরণ ও উপস্থাপনা কৌশলের মহিমায় বর্তমানের সময়কে ভেদ করে ক্রমাগত উত্তরণের পথে নিজেকে ধাবিত করেন। তিনি সময়কে ছাড়িয়ে যান। তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ তাই সময়ের বেড়াজালে আবৃত্ত যে কোন সীমারেখার গন্ডি পেরিয়ে পৌঁছে গেছে ভিন্নভাষাভাষী মানুষের কাছে যার আবেদন সময় আর একটি ভাষার মানুষের কাছে সীমাবদ্ধ থাকেনি। রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা, জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন, আশরাফ সিদ্দিকীর তালেব মাস্টার, সৈয়দ শামসুল হকের আমার পরিচয়, শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি', হেলাল হাফিজের 'কষ্টের ফেরিওয়ালা' কিংবা সুকান্ত

ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র'র মত কালজয়ী-অন্যবদ্য কবিতা কবিদের যেমন মহান ও অমরত্ব দান করেছে; তেমনি বঙ্গবন্ধুর এই একটি মাত্র ভাষণই তাঁকে যুগ থেকে যুগান্তরে টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট।

কবিতার ছন্দ মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে; সাধারণ মানুষ তাই ছন্দবদ্ধ কয়েক পংক্তির কবিতা সাগ্রহে গ্রহণ করেন। বর্ণনার আঙ্গিকে উপস্থাপিত গদ্যের সে প্রভাব তাই কবিতার মত একটি বিষয়কে যেমন দারুণভাবে আকৃষ্ট করতে পারে না তেমিন সাধারণত শক্তিশালী আবেদন তৈরি করতে পারেনা। সাহিত্য সমালোচকগণ যথার্থই বলেছেন যে, গদ্যছন্দের রাজত্বে আপাত দৃষ্টিতে যে স্বাধীনতা থাকে তার মর্যাদা রক্ষা করা কঠিন বা সর্বজনীন করে তোলা কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। কিন্তু ৭ মার্চের ভাষণ গদ্যছন্দে রচিত হলেও এর কাব্যিক ঢং, বৈচিত্র্য শুধু গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেনি; কাব্য জগতে এনে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা।

আবৃত্তির জন্য কবিতা নির্বাচন একটি দুরূহ বিষয়। আর নির্বাচনের ক্ষেত্রে বোধ ও মানদন্ডের প্রয়াসে আবৃত্তিকারকে ঈর্ষণীয় তুমুল জনপ্রিয়তা দিতে পারে। ৭ মার্চের ভাষণ আবৃত্তিকারের জনপ্রিয়তার তুলনা করার মত সাধারণ শব্দগুচ্ছ বাংলা সাহিত্যে বিরল। শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে গ্রন্থিত কবিতার উচ্চারণ বরাবরই শোষিতের হৃদয়, মনন এবং মস্তিস্ককে একইসাথে আকৃষ্ট করে এবং যুগপৎ শক্তিশালী ও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ এমনই এক উচ্চারণ। বোদ্ধা থেকে শুরু করে নিরক্ষর সাধারণ মানুষকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছে ভাষণের কোন কোন পংক্তিমালা বার বার অনুরণিত হওয়ার বিষয়; কোন কোন শব্দ কোন কোন কবির বিখ্যাত কবিতার শিরোনাম; কিংবা গবেষকের গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। আবৃত্তিকার ভালোভাবেই জানতেন তার শ্রোতা কারা; তারা কোন বিষয়টি শোনার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে থাকেন। গবেষকরা বলেন বঙ্গবন্ধু এক্সট্রা-অর্ডিনারি সেনসরি পাওয়ারের অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি সাধারণ মানুষের মনের চাওয়া-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপদান করার জন্যে সহজ, সরল ভাষায় বলে গেছেন যা আবৃত্তির মাধ্যমে একটি সেতু বন্ধন তৈরি হয়েছে।

আবৃত্তি সবসময়ই সাবলীল হয় যখন কবিতাটি আবৃত্তিকারের আয়ত্ত্বে থাকে, পুরোপুরি মুখস্থ থাকে। সেক্ষেত্রে আবেগের মাত্রা, অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ অনেক বেশী বাস্তব ও সৃজনশীল হয়ে ওঠে। ৭ মার্চের ভাষণ একটি উপস্থিত বক্তৃতা যার কোনকিছুই লিখিত নয়। আবৃত্তিকার তাঁর দর্শকদের দৃষ্টির আড়াল করেননি; আত্মিক যোগাযোগের মাত্রাকে বিচ্ছিন্ন হতে দেননি। এমন আবহ তিনি তৈরি করেছিলেন যেন প্রতিটি উপস্থিত দর্শক এবং অগণিত অনুপস্থিত দর্শকের কাছে, দর্শকের সামনে তিনি সৃষ্টিশীলতা উপস্থাপন করছেন। আবৃত্তিকারের কৃতিত্ব সেখানেই যখন তার আবৃত্তি তাঁকে ছাড়িয়ে যায়, ছড়িয়ে পড়ে দর্শকের মুখে মুখে। সংখ্যাতত্ত্বের সীমিত পরিসর থেকে অগণিত হৃদয়ের তন্ত্রীতে, শিরা উপশিরা ধমনীতে; বংশ পরম্পরায়।

কবিতা নির্বাচন, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, আগ্রহী শ্রোতা, আবৃত্তির বিষয়াবলী এসবই একটি মানোত্তীর্ণ আবৃত্তির জন্য অপরিহার্য। সেদিনের সেই রেসকোর্স ময়দান একজন কবির

কবিতার আসর হয়ে জমে উঠেছিল। একক কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান। একটি প্রহরের একটি ছোট সময়ের সংযোজন সকলকে আন্দোলিত করেছিল। আবৃত্তির জন্য নির্বাচিত এক সময়ের মুখ্য হয়ে ওঠা বিষয়বস্তু একজন বাচিক শিল্পীর কাছে গৌণ হয়ে যায়। পরিবেশ, পরিবেশের প্রতিটি অংশই তাঁর কাছে ম্লান হয়ে যায়। একটি বিশাল মাঠ একজন ব্যক্তির কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়; একটি বিশাল আকাশ একজন আবৃত্তিকারের বিশালত্বকে ধারণ করতে পারেনি; উনিশ মিনিটের শব্দমালা হাজার হাজার শব্দসম্ভার তৈরি করে; প্রায় উনিশ মিনিট সময়ের কাছে একটি দেশ কেঁপে উঠে। যে দেশটির নাম পুরো উনিশ মিনিটের বক্তৃতাতে তিনি একবারের জন্যও উচ্চারণ করেননি ।

উপস্থাপনা কৌশল ও বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা, মুভমেন্ট, প্রক্ষেপ, শারীরিক ভাষা, আবৃত্তিকারের পরিধেয় আবৃত্তির পরিবেশকে শৈল্পিক করে তোলে। আবৃত্তির গ্রহণযোগ্যতার মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। একজন আবৃত্তিকার সচেতনভাবে এসব বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করে তাঁর আবৃত্তিকে সবার কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। বঙ্গবন্ধুর কাছে এসব বৈশিষ্টের ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। তাঁর চলন নতুন মাত্রা যোগ করে। তার পরিধেয় বস্ত্র অনুকরণের পর্যায়ে পড়ে; তাঁর উচ্চারণ ও বলার কৌশল অন্যদের জন্য অনুসরণের ক্ষেত্র হিসেবে তৈরি হয়েছে। আবৃত্তির কৌশল এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ই বরং বঙ্গবন্ধুকে ধারণ করে ধন্য হয়েছে মনে হয়। যার ফলে অগণিত দর্শকশ্রোতার অধীর আগ্রহের প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষার অবসানে, আবৃত্তি শোনার আগ্রহে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত ভেসে আসে শ্লোগান; প্রতীক্ষারত দর্শকশ্রোতার আবেগ-মিশ্রিত স্বগতোক্তি। সবাই শুনবেন সেই মহাবাণী, যার জন্য প্রস্তুত তবে সেই কবিতা শোনা হয়নি। যে কবিতা শোনা হল তা **১৯৭১** সনের ৭ মার্চের বিকেলে শেষ হলেও রেশ রয়ে গেল বহুকালের জন্য; অস্তমিত সূর্যটা গভীর মুগ্ধতায় তাকিয়ে রইল সেই মহাপুরুষের পানে।

* প্রবন্ধটি বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকার ২০১৯ সংখ্যার জন্য নির্বাচিত লেখা থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে একটি বিশেষ প্রকাশনা

“ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর
নামের ওপর পতাকার
মতো দুলতে থাকে
স্বাধীনতা।”

-শামসুর রাহমান